যুগান্তর

শিবনাথ শাস্ত্রী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত গ্রন্থালোচনাসহ

ভূমিকা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

জিজ্ঞাসা

কলকাতা ৯ ॥ কলকাতা ২৯

JUGANTAR *a novel*
by Sivanath Sastri

প্রথম প্রকাশ ১৩০১

প্রথম সংস্করণ
পৌষ ১৩৭১

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা ॥ ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা ২৯
১ ও ৩৩ কলেজ রো। কলকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা ৯

ভূমিকা

বাংলাদেশের ইতিহাসে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। সামাজিক এবং ধর্মনৈতিক আন্দোলনের অগ্রনায়করূপে, শিক্ষাব্রতীর অক্লান্ত ভূমিকায় তেজস্বিতা এবং চরিত্রবলের মহিমায় তিনি বাঙালির নবজাগরণ পর্যায়ে যুগস্রষ্টার সমুজ্জ্বল গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এই পিতৃঋণ আমরা কোনোদিন পরিশোধ করতে পারব না।

কর্ম- এবং ধর্মযোগী শিবনাথ বাংলা সাহিত্যকেও চিরকৃতজ্ঞ করে রেখেছেন। তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং 'আত্মচরিত' মাত্র সমকালীন ইতিহাস রূপেই যে অমূল্য তা নয়, সাহিত্য হিসাবেও বই দুটির সাফল্য অসাধারণ। বিজ্ঞাননিষ্ঠ ঐতিহাসিক চেতনার সঙ্গে সরল-সকৌতুক ভাষার অবাধ বহমানতা মিশ্রিত হয়ে বই দুখানি তথ্যগৌরবে যেমন অতুলনীয়, সাহিত্যগৌরবেও তেমনি অসামান্য। এই গ্রন্থ দুটি রচনা করেই শিবনাথ বাঙালির কাছে চিরস্মৃত হয়ে থাকতে পারতেন।

'সোমপ্রকাশ' ও 'এডুকেশন গেজেট'-এ তরুণ শিবনাথের যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হত, 'নির্বাসিতের বিলাপ' রচনা করে বাংলার সাহিত্যপাঠকের দৃষ্টি যেভাবে তিনি আকর্ষণ করেছিলেন, তাতে কাব্যচর্চায় তদ্‌গত থাকলে হয়তো এ-পথেও তিনি সাফল্যলাভ করতে পারতেন। কিন্তু শিবনাথ সেদিন যুগসন্ধির ঝঞ্ঝাযাত্রী, ব্যক্তিহৃদয়ের নিভৃত কলরোল শোনবার মতো অবকাশ তাঁর ছিল না। তবু ফাঁকে-ফাঁকে কখনো-কখনো দুটি-চারটি কবিতা লিখেছেন। শৈশবের খেলার সাথি সেই ফুটফুটে মেয়েটিকে বিবাহিতজীবনে সন্তানভারজর্জরিতা জীর্ণা মূর্তিতে দেখে বেদনায় অন্তর ভরে উঠেছে, লিখেছেন—'তুমি কি আমার সেই খেলার সঙ্গিনী?' 'পুষ্পমালা' 'পুষ্পাঞ্জলি' 'ছায়াময়ী পরিণয়' অথবা 'হিমাদ্রি-কুসুমে'র মতো বইগুলিতে কবি-শিবনাথের সেই অস্ফুট প্রতিভার স্বাক্ষর রয়ে গেছে।

সচেতনভাবে কথাসাহিত্যিক হয়ে ওঠবার অবসরও স্বভাবতই শিবনাথের জীবনে ছিল না। তবু 'বিধবার ছেলে' 'মেজ বৌ' 'যুগান্তর' বা 'নয়নতারা'র মতো উপন্যাসও তিনি লিখেছেন। এদের মধ্যে 'মেরী কার্পেন্টারের গ্রন্থাবলী'র অন্তর্গত 'মেজ বৌ'ই সর্বাধিক প্রচারিত ও আদৃত হয়েছিল। 'বঙ্গ-কুল-যুবতীদিগের জন্য মুদ্রিত ও প্রচারিত' এই উপন্যাসের সমাদরের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়, শিক্ষা-বিভাগ এবং নারীহিতৈষী প্রতিষ্ঠানগুলিই ছিল বইখানির পৃষ্ঠপোষক—অতীতে 'ভার্নাকিউলার লিটারেচার কমিটি'র প্রকাশিত 'সুশীলার উপাখ্যান'ও এইভাবেই বহুলপ্রচার লাভ করেছিল। কিন্তু সাহিত্য রূপে 'মেজ বৌ' অতি নগণ্য। কাহিনীর সর্বগুণবতী নায়িকা প্রমদাকে লেখক শেষপর্যন্ত যে নিদারুণ দুঃখ ও ব্যর্থতার মধ্যে পৌঁছে দিয়েছেন, তাকে ভাগ্যের নিরর্থক নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

'যুগান্তর'ই শিবনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই বইখানিতে তাঁর কথাসাহিত্যিক প্রতিভার একটি বিস্ময়কর উদ্ভাস ঘটেছে। 'যুগান্তর' পাঠ করে ১৩০১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব সমালোচনাটি লিখেছেন (রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্যে' সংকলিত; বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) তা অতি স্বল্প-ভাষণে উপন্যাসটির সাফল্য-অসাফল্যের স্বরূপ পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরে। সন্দেহ নেই, নশিপুর-গ্রামবাসী বিশ্বনাথ তর্কভূষণের চরিত্র এবং তাঁর পরিবার এই উপন্যাসে আশ্চর্য সজীব ও উজ্জ্বল হয়ে আমাদের সম্মুখে পরিস্ফুট হয়েছে :

'এমন পর্যবেক্ষণ, এমন চরিত্রসৃজন, এমন সুরস হাস্য, এমন সরল সহৃদয়তা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। লেখক বিশ্বনাথ তর্কভূষণকে আমাদের নিকট পরমাত্মীয়ের ন্যায় পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। কেবল তর্কভূষণকে কেন, লেখক বঙ্গসাহিত্যে নশিপুর নামক আস্ত একটি গ্রাম বসাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রামের ক্রিয়াকর্ম, আমোদ-প্রমোদ-কৌতুক-উপদ্রব, সুজন-দুর্জন সমস্তই পাঠকের চিরসম্পত্তি হইয়া গিয়াছে।'

কিন্তু উপন্যাস যখন নশিপুরের গ্রামসীমা পার হয়ে কলকাতার তরঙ্গমন্দ্রিত জীবনে অনুপ্রবেশ করল, ব্রজরাজ ঘোষের বাড়িতে 'আত্মোন্নতিবিধায়িনী' বা 'নবরত্নসভা' যখন নবীনচন্দ্রের নেতৃত্বে যুগান্তরের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল, তখন রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছে। তিনি বলেছেন : 'আমাদের পরমদুর্ভাগ্য-বশত উপন্যাসটি অকস্মাৎ যুগান্তরে লোকান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথায় গেল তর্কভূষণ, নশিপুর, হাঁসের দল— কোথা হইতে উপস্থিত নবীনচন্দ্র, হাতি-বাগান নবরত্নসভা। গ্রন্থকারও নূতন বেশ ধারণ করিলেন। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, হইলেন ঐতিহাসিক; ছিলেন ভাবুক, হইলেন নীতিপ্রচারক। আমরা রসসম্ভোগের সত্যযুগ হইতে তর্কবিতর্কের যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম।' অতএব এই দুটি অংশের 'পরস্পরের মধ্যে কোনো অবশ্য যোগ নাই' এবং পরিশেষে খেদোক্তি উচ্চারণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'লেখক দুইখানি বহির পাতা পরস্পর উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া একসঙ্গে বাঁধাইয়া দপ্তরীর অন্ন মারিয়াছেন এবং পাঠক-দিগের রসভঙ্গ করিয়াছেন। এ আক্ষেপ আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না।'

এই সমালোচনা সুন্দর ও সরল—কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। সে-কথায় আমরা পরে আসব।

২

'যুগান্তর' নামকরণের মধ্যেই লেখকের একটি বিস্তীর্ণ পরিকল্পনা সংকেতিত হয়েছে। উপন্যাসের সমাপ্তিকাল ইংরেজি ১৮৫৯ সাল। এই বৎসরেই হিমালয়-শিখর থেকে 'ঋষিত্ব লাভ করিয়া' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বঙ্গদেশে অগ্নিময় আবির্ভাব এবং খ্যাতনামা কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিলন। সন্দেহ নেই, এ যুগান্তরই বটে। সেই বিপ্লবলগ্নে উপনীত হয়েই শিবনাথ তাঁর উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে নশিপুর গ্রামের বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা ভুবনেশ্বরীর আসন্ন বিবাহোৎসবকে দিয়ে যে উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটেছিল এবং সেই প্রসঙ্গে তর্কভূষণ-পরিবার ও নশিপুর গ্রামের যে একটি সর্বাত্মক জীবনচিত্র ফুটে উঠেছিল, কাহিনী সেখানেই কেন্দ্রবন্ধ হয়ে থাকেনি। তর্কভূষণের অনুতপ্ত সন্তান হরচন্দ্র ও বিধবা ভগিনী বিজয়া যখন কলকাতায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রের বাড়িতে এসেছেন— তখন থেকেই গল্পটি প্রধানত

'নবরত্নসভা' এবং নবীনচন্দ্রকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ এদিক থেকে উপন্যাসটি দ্বিধাবিভক্ত। তার অর্ধাংশ নশিপুর, অর্ধাংশ কলকাতায়। নশিপুরে অংশের নায়ক বিশ্বনাথ তর্কভূষণ, কলকাতা অংশের নায়ক নবীনচন্দ্র বসু।

কিন্তু উপন্যাসের নাম 'যুগান্তর' এবং নতুন কালের সংঘাতে একাধারে পল্লী ও নগরজীবন আলোড়িত হয়ে উঠেছে, সেইটিকে পরিস্ফুট করে তোলাই বোধ হয় শিবনাথের অভিপ্রায় ছিল। এইজন্যই সংঘবদ্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনার চাইতেও ব্যাপ্তির দিকেই লেখকের লক্ষ্য ছিল বেশি। যদিও তর্কভূষণ-পরিবার উপন্যাসে অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে, কিন্তু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে অন্তত আরো কয়েকটি পরিবার এই কাহিনীতে প্রয়োজনীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এগুলি হল যথাক্রমে (ক) হলধর বসু অর্থাৎ নবীনচন্দ্রের পরিবার; (খ) শিবচন্দ্র বিদ্যারত্নের পরিবার; (গ) ব্রজরাজ ঘোষের পরিবার; (ঘ) নন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ বিজয়ার পরিবার এবং (ঙ) উলাগ্রামে ভুবনেশ্বরীর শ্বশুরালয় রামরতন মুখোপাধ্যায়ের পরিবার। এ ছাড়া কৃষ্ণকামিনীর মাতুলালয় শ্যামচাঁদ মিত্রের বাড়ি এবং নবীনচন্দ্রের ফরিদপুরবাসও কাহিনীর আরো দুটি শাখা প্রসারিত করে রেখেছে।

স্বভাবতই এমন বহুমুখী বিস্তার এবং এত বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ 'যুগান্তর'কে যতখানি পরিব্যাপ্ত করেছে, ততখানি গভীর করতে পারে নি। তর্কভূষণ অথবা নবীনচন্দ্রের একক উপাখ্যান কাহিনীকে অনেক বেশি অন্তর্মুখী করে তুলতে পারত, নানা মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতে রসসম্ভোগের অনেকখানি আনুকূল্যও ঘটাতে পারত। কিন্তু বহির্জগতের অক্লান্ত কর্মবীর, যুগনায়ক শিবনাথের পক্ষে সেই আত্মমুখিতা সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথের অনুযোগ সত্ত্বেও 'যুগান্তরে' শিবনাথ কালবিবর্তনের একটি ইতিহাসই মুখ্যভাবে রচনা করতে চেয়েছিলেন, উপন্যাসকে তার আধার রূপেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। আদর্শবাদী শিবনাথ নিছক রসচর্চাকেই তাঁর সাহিত্যসাধনার লক্ষ্যীভূত করতে পারেন নি, তাই তর্কবিতর্ক প্রচার-আলোচনা অপরিহার্যভাবেই উপন্যাসের মধ্যে এসে পড়েছে। এই দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ সম্পূর্ণ স্বীকার্য নয় এবং মাত্র বিশ্বনাথ তর্কভূষণের পরিবারই যদি কাহিনীর মূল উপজীব্য হত, তাহলে 'যুগান্তর' নামকরণের কোনো সার্থকতাই থাকত না।

এই 'যুগান্তর' কি তর্কভূষণ-পরিবারকে অবলম্বন করেও দেখানো সম্ভব ছিল না? বিজয়া নশিপুরে বাস ক'রে, গিরিশ-গোবিন্দ-হরচন্দ্রের সহায়তায় কাহিনীকে কি যুগসংঘর্ষের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারতেন না? মনে হয়, সে সুযোগ ছিল। কিন্তু শিবনাথ তা গ্রহণ করেন নি। তাঁর পরিকল্পনা বিশাল, অতএব কাহিনীকে তিনি বিস্তৃততর পটভূমিকায় প্রসারিত করে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক যা দিয়েছেন তাই আমাদের গ্রহণীয়, যা দেন নি তার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাভ নেই।

৩

'যুগান্তরে'র কাহিনী-অংশ নানা কারণেই ঔপন্যাসিকভাবে সম্পূর্ণ দানা বেঁধে ওঠে নি, একে বহু বিবরণ ও ঘটনার সমাহার বলে চিহ্নিত করলেও অত্যুক্তি হয় না। হয়তো কেন্দ্রপরিবর্তনই তার প্রধান কারণ। কিন্তু আধুনিক কালে কোনো দেশ, জাতি, গোষ্ঠী বা সমাজকে আশ্রয় করে যে সর্বাত্মক উপন্যাস রচনার পদ্ধতি

প্রচলিত হয়েছে—যেখানে কাহিনী ঐকলক্ষ্য নয়, বরং ঐকতানধর্মী—'যুগান্তরে' তার সূচনা অনুভব করা যায়। সামগ্রিক উপন্যাস রচনার এই প্রথম প্রয়াসের জন্যে একটা প্রবল বেগবান কালের বিচিত্র প্রাণস্পন্দনকে বিধৃত করবার জন্যে এই যে এপিকধর্মী প্রয়াস—আমার মনে হয়, এইখানেই শিবনাথের কৃতিত্বের অসাধারণতা এবং এই কারণেই 'যুগান্তর' বাংলাসাহিত্যে এক অপরিসীম মর্যাদার অধিকারী। মাত্র তর্কভূষণ-পরিবারকে আশ্রয় করলে উপন্যাসটি হয়তো অনেক বেশি ঘনাপিনদ্ধ হত, কিন্তু এই মহিমা তার পক্ষে লাভ করা সম্ভব হত না। 'যুগান্তরে'র প্রধান ঐশ্বর্যই চরিত্রসৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন, তর্কভূষণের টোল, 'হাঁসের দল', চিমু ঘোষ, জহরলাল, গ্রামের জমিদার, পদস্খলিতা বিধবা মেয়েটি অথবা তর্কভূষণ-পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিবৃন্দ—এরা আশ্চর্য বাস্তবসৃষ্টি, রক্তমাংসে সজীব। এদের প্রাত্যহিক দিনযাত্রা, হাসি-কান্না-কৌতুক, স্নেহ-মমতা-অভিমান অপরূপ শিল্পসৌন্দর্যে সমুদ্ভাসিত হয়েছে। এদিক থেকে কলকাতার মানুষগুলি অনেকখানি পরিমাণেই অসম্পূর্ণ, এই অংশের নায়ক-নায়িকা নবীন ও কৃষ্ণকামিনী আমাদের তেমনভাবে আকর্ষণ করতে পারেন না। তবু কলকাতা শহরেরও কতগুলি টুকরো-টুকরো চরিত্র—যেমন নবীনের জ্যাঠামশাই হলধর, অগ্রজ সুরেশ, বিজয়ার দেবর ইংরেজিনবিশ ডেপুটি হরিকিশোর, নবীনের ভ্রাতৃবধূ, কৃষ্ণকামিনীর মাতুল শ্যামচাঁদ অথবা মাসি হতভাগিনী মাতঙ্গিনীর মধ্য দিয়ে পাপের যে-পরিণাম দেখানো হয়েছে, তা যতই ভয়ংকর হোক—মাতঙ্গিনীর জন্যে লেখক অকৃপণ করুণাসঞ্চারে সার্থক হয়েছেন। চরিত্র-রচনার কৃতিত্বেই 'যুগান্তর' অপূর্ব চিত্তাকর্ষক।

কিন্তু নশিপুরের গ্রামবাসীগণই হোক আর কলকাতার নাগরিকবৃন্দই হোক—চরিত্রসৃষ্টিতে 'তর-তম' যা-ই ঘটুক—'যুগান্তরে'র পাত্রপাত্রীরা কেউই সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। ডিকেন্স কিংবা এমিল জোলার উপন্যাসের মতো এরা প্রত্যেকেই বাস্তব থেকে উৎসারিত হয়েছে—এরা লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। বস্তুত ব্যক্তিজীবনে শিবনাথও একাধারে নশিপুরনিবাসী এবং কলকাতার মানুষ। তর্কভূষণ পরিবার, চিমু ঘোষ কিংবা রামহরি মিত্র যেমন তাঁর অতিপরিচিত, তেমনি নবীনচন্দ্র-ব্রজরাজ-সুরেন্দ্র-পণ্ডু-কৃষ্ণকামিনীও তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মজন।

নশিপুর অংশের নায়ক বিশ্বনাথ তর্কভূষণ যেন শিবনাথের পিতৃদেব হরানন্দ ভট্টাচার্যেরই প্রতিরূপ। 'আত্মচরিতে' শিবনাথ হরানন্দের যে উজ্জ্বল নির্ভীক ব্যক্তিত্বটি তুলে ধরেছেন, 'যুগান্তরে'র বিশ্বনাথের মধ্যে তারই উদ্ভাস দেখা যায়। হরানন্দ বিদ্যাসাগরের প্রিয়পাত্র ছিলেন : 'কেবল প্রিয়পাত্র নহে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতির অনেক গুণ তাঁহাতে ছিল। শুধু গুণ কেন, তাঁহার প্রকৃতির অনেক দোষও আমার পিতার প্রকৃতিতে ছিল। সেই তেজস্বিতা, সেই উৎকট ব্যক্তিত্ব, সেই অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ, সেই আত্মমর্যাদাজ্ঞান, সেই পরদুঃখকাতরতা, সকলি আমার পিতাতে ছিল; আবার সেই স্বমতপ্রিয়তা, সেই ফলাফলের প্রতি দৃষ্টির অভাব, সেই আত্মপরীক্ষা ও আত্মসংশোধনের প্রয়াসাভাব তাহাও ছিল। কিন্তু... ইহা নিশ্চিত কথা যে, শৈশব হইতে ঐ তেজস্বী অধর্মবিদ্বেষী ও সত্যানুরাগী মানুষের শাসনাধীন না থাকিলে আমার চরিত্র গঠিত হইত না' ('আত্মচরিত' গ্রন্থের পরিশিষ্ট)। তর্কভূষণের চরিত্রবিশ্লেষণ করলেও এই কথাগুলিরই পুনরুক্তি করতে হয়।

লেখকের নিজ বাল্যজীবন, তাঁর পরিবার ও গ্রামীণ পরিবেশ— এগুলি 'যুগান্তরে'র প্রথমাংশের বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনায় লেখককে প্রভূত সহায়তা দিয়েছে। গ্রামের জমিদারের সঙ্গে বিশ্বনাথের বিরোধ— শিবনাথের পিতার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। 'আত্মচরিতে'র 'গানের দলে'র সঙ্গে 'হাঁসের দলে'র যৎকিঞ্চিৎ ভাবসংযোগ থাকতে পারে। গ্রামজীবনের আনন্দ-উৎসব, পূজাপার্বণ, সামাজিক রীতিনীতি—এগুলির জন্যে লেখককে কোনো পরোক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয় নি; যে পারিবারিক চরিত্রগুলি বাস্তবে তাঁর চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদেরই কয়েকটিকে তিনি উপন্যাসের প্রয়োজনে নির্বাচিত ও পরিমার্জিত করে নিয়েছেন, তারা সত্যসম্ভব বলেই 'জীবন্তবৎ প্রত্যক্ষ' হয়ে উঠতে পেরেছে। তর্কভূষণ-কন্যা ভুবনেশ্বরীর বাল্যবিবাহ এবং শ্বশুরগৃহে তার নিষ্ঠুর নির্যাতনের উৎসও 'আত্মচরিতে'র চতুর্থ অধ্যায়ে 'বালিকা বধূর বেদনা' নামক অনুচ্ছেদটির মধ্যেই পাওয়া যাবে।

'যুগান্তর' উপন্যাসের কলকাতা-অংশও এইরকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বারবার চিহ্নিত হয়েছে : 'আমি কেদারনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, এই পাঁচজন বন্ধু একত্র হইয়া ধর্মসাধনের জন্য একটি ক্ষুদ্র দল করিলাম। আমরা পাঁচজনে একত্র বসিতাম, প্রাণ খুলিয়া ধর্মবিষয়ে কথাবার্তা কহিতাম, নানা স্থানে মিলিত হইয়া উপাসনা করিতাম। মধ্যে মধ্যে ধর্মোপদেশের জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট যাইতাম। তিনি আমাদের নাম রাখিলেন "পঞ্চপ্রদীপ" ('আত্মচরিত', দশম পরিচ্ছেদ)। সন্দেহ নেই, এই 'পঞ্চ-প্রদীপ'ই 'নবরত্নে'র উৎস। কেদারনাথ, নগেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র অথবা কালীনাথের প্রভাব নবীনচন্দ্র-সুরেন্দ্র-ব্রজরাজ-পঞ্চু ইত্যাদির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় নি একথা বলা যায় না। 'যুগান্তর' উপন্যাসে নবীনচন্দ্র এবং বিধবা কৃষ্ণকামিনীর বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; এই ঘটনারই বাস্তব-রূপ পাওয়া যাবে 'আত্মচরিতে'র পঞ্চম পরিচ্ছেদে বর্ণিত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধবা মহালক্ষ্মীর বিবাহ-বৃত্তান্তে (মহালক্ষ্মীর সঙ্গে কৃষ্ণকামিনীর নামগত সাদৃশ্যও লক্ষণীয়)। মহা-লক্ষ্মীর সঙ্গে লেখকের যে সুগভীর মমতার ও হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল, তারই সজাগ প্রেরণায় এই নারীটি যেন একই সঙ্গে 'যুগান্তরে'র কৃষ্ণকামিনী এবং বিজয়ার মধ্যে প্রতিফলিতা হয়েছেন।

অতএব নশিপুরের চরিত্রগুলিই বাস্তব এবং জীবনসন্নদ্ধ, কলকাতার চরিত্রসমূহ 'সজীব নহে'—এই অভিযোগও সম্পূর্ণ গ্রহণ করা যায় না। একথা অনস্বীকার্য যে 'সাহিত্যের চিত্রপটে স্থিতি অপেক্ষা গতি আঁকা শক্ত।' তাই নশিপুরের স্থির-শান্ত প্রতিষ্ঠিত জীবনপট যতখানি বর্ণোজ্জ্বল ও সাহিত্য-সফল হতে পেরেছে, কলকাতার বিবর্তিত তরঙ্গিত প্রাণধারাকে ততখানি সাহিত্য-সার্থক করে তোলা শিবনাথের পক্ষে সম্ভব হয় নি—বিশেষ করে তিনিও সেই স্রোতের যাত্রী—ঔপন্যাসিক বিচ্ছিন্নতাও তাঁর পক্ষে আয়ত্ত করা সুকঠিন। কিন্তু গৃহের প্রশান্তি এবং নবযুগের খরস্রোত—দুইয়ের শিল্পায়ন সমপর্যায়ী নয়; নশিপুরে আত্মস্থ হওয়ার অবকাশ আছে--কলকাতায় আবর্তিত ও প্রবাহিত হতে হয়েছে। দিঘির জলকে যে মগ্নসৌন্দর্যে চিত্রিত করা চলে—যে গভীরতার ব্যঞ্জনা তার মধ্যে সঞ্চার করা যায়, প্রবল প্রাণপ্রবাহকে সেভাবে বিধৃত করা যায় না; বারে-বারে তার তটভূমির পরিবর্তন ঘটে, নব-নব পাত্রপাত্রীর আবির্ভাব হয়— তাদের সম্পূর্ণ

পর্যবেক্ষণ করবার আগেই চলস্রোতে তারা অপসৃত হয়ে যায়। অতএব স্থিতি ও গতি— এই দুটিকে একসঙ্গে মিলিয়েই 'যুগান্তর' পড়া উচিত, 'দুইখানি বহির পাতা উল্টাপাল্টা করিয়া বাঁধানো'— এই নালিশ খুব সংগত বলে মনে হয় না।

বিশ্বনাথ তর্কভূষণ এবং নবীনচন্দ্র বসু— অতীত এবং ভবিষ্যতের স্থিতি এবং গতির রূপক। শিবনাথ নব্যযুগের অন্যতম সারথি হয়েও অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাহীন নন; অস্তগামী কালের মধ্যে যে শক্তি, মহিমা, নিষ্ঠা ও তেজস্বিতা আছে তাকেও যেমন তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনি যে-কাল ঐতিহাসিক নিয়মে অনিবার্য প্রবলতায় আসন্ন হয়ে এসেছে, তাকেও সংবর্ধনা জানাতে কুণ্ঠিত হন নি। বিশ্বনাথ এবং নবীনচন্দ্র, নশিপুর এবং কলকাতা এরা 'কন্‌ট্রাস্ট' রূপে উপস্থিত হয়ে যুগপরিবর্তনের একটি পরিপূর্ণ ইতিহাস রচনা করতে পেরেছে। এই কারণেই উপন্যাসের নাম 'যুগান্তর'।

৪

ঔপন্যাসিক শিবনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত নন, নবোদিত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিও তাঁর কাছে প্রত্যাশা করা নিরর্থক। তাঁর সাহিত্যিক-সাফল্যের অংশে, অর্থাৎ পল্লীচিত্রণে যাঁর প্রভাব অনুভব করা যায়, তিনি তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 'যুগান্তর' রচনার অন্তত পঁচিশ বছর আগে 'স্বর্ণলতা' প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমের যুগবর্তী হয়েও বিস্ময়করভাবে বঙ্কিম-প্রভাবমুক্ত তারকনাথ 'স্বর্ণলতা'য় পল্লী ও পারিবারিক জীবনের যে সরস ও বাস্তব পরিচয় উপস্থিত করেছেন, বাংলাসাহিত্যে তার তুলনা নেই। 'যুগান্তরে'র নশিপুর গ্রাম 'স্বর্ণলতা'রই স্মারক। 'হাঁসের দলে'র সেই অস্ফুটভাষী এবং লালাক্ষরণকারী অপরূপ 'তাওক' চরিত্রটির কিছু অংশ 'যুগান্তর' থেকে এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করি :

'আপনার নাম কি?
তাওক (তারক)। আমার নাম তাওক।
এই কথা বলিতে এক ঝলক লাল পড়িয়া গেল।···
পুনরায় প্রশ্ন--'আপনার কে আছে?'
তাওক উত্তর দিল, 'আমা গউ আচে।'

এ কথাটারও টীকার প্রয়োজন। নশিপুরের বাড়ীতে তাওক সমস্ত দিন কি করে? তাহার একটি গরু আছে; সমস্ত দিন সেই গরুটি লইয়া থাকে।··· বাস্তবিক গরুটি তাহার যেরূপ প্রিয়, তাহাতে জগতের মধ্যে তাহার আপনার লোক 'গউ আছে' একথা বলা অন্যায় হয় নাই।

পুনরায় প্রশ্ন—'আপনি লেখাপড়া করেছেন?'
তাওক। আমি 'ক' নিক্‌তে পাই। (পুনরায় লাল পতন)।
এই বলিয়া তাওক শূন্যে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা 'ক' লিখিতে আরম্ভ করিল। ইহা দর্শন করিয়া সহরের যুবকগণ করতালি দিয়া অট্টহাস্য করিতে লাগিল।'

এই সরসতা, চরিত্র রচনায় এই ফোটোগ্রাফিক বাস্তবতা, এই সরল এবং স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি তারকনাথেরই উত্তরাধিকার। 'তাওক' চরিত্রের মধ্যে একাধারে নীলকমল আর গডাঢরচন্দ্র উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। 'যুগান্তরে' 'স্বর্ণলতা'র স্বাদ অনেক-খানিই অনুভব করতে পারা যায়।

শিবনাথের ভাষা সরল এবং সুদৃঢ়। কারুকার্য নেই, অলংকরণ নেই, আবেগের ফেনোচ্ছ্বাসও নেই, কিন্তু বহতা নদীর মতোই অনায়াস-সৌন্দর্যে এমনভাবে প্রবাহিত হয়েছে যে এই ভাষার টানেই 'যুগান্তর' পাঠকের মনকে সানন্দে সহযাত্রী করে। শিবনাথের ব্যক্তিচরিত্রের মতোই তার স্টাইলও ঋজু, বলিষ্ঠ এবং উজ্জ্বল। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'যুগান্তরে' এই স্টাইল সর্বোত্তম উৎকর্ষ লাভ করেছে, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে।

শিবনাথের 'আত্মচরিত' তাঁর বহির্জীবনের ইতিবৃত্ত। কিন্তু উপন্যাসের পরোক্ষতায় কখনো-কখনো লেখক ব্যক্তিক অন্তর্জীবনের ইতিহাসও রচনা করে থাকেন। মনে হয়, 'যুগান্তর' তাঁর সেই অন্তর্লোকের আত্মচরিত— এর পাত্র পাত্রী এবং ঘটনা বৈচিত্র্যের নেপথ্যে তাঁর ব্যক্তিক কালান্তরের কাহিনীই বিবৃত হয়েছে। খুব সম্ভব 'আত্মচরিত' এবং 'যুগান্তর' গ্রন্থ দুটি পরস্পরের পরিপূরক। এই কারণেও, 'যুগান্তর' বাংলাসাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় সৃষ্টি।

উপন্যাসখানির আর একটি গৌরবও আমরা ভুলতে পারব না। বাংলাদেশের বিখ্যাত বিপ্লবী দল 'যুগান্তর' এই উপন্যাস থেকেই তাঁদের সংস্থা এবং পত্রিকার নামকরণের প্রেরণা লাভ করেছিলেন। সেই অনুষঙ্গেও 'যুগান্তর' উপন্যাস অবশ্য ঐতিহাসিক মর্যাদার অধিকারী।

বাংলা বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি। ঐ সালের ১০ই বৈশাখ দিবসে এক বিবাহের লগ্ন আছে। সেই লগ্নে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নশিপুর গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীর বিবাহ হইবে। সেই জন্য মহা ধুমধাম সহকারে আয়োজন হইতেছে; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে যতটা ধুমধাম হওয়া সম্ভব, তাহাই হইতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তর্কভূষণ মহাশয় একজন যেমন তেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তিনি দেশের মধ্যে একজন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। বাল্যকালে ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধ কুলচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার পাঠ করিয়া, প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া, নবদ্বীপে পাঠ সাঙ্গ করিবার জন্য গমন করেন; সেখানে সুবিখ্যাত রঘুরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট প্রাচীন ও নব্যস্মৃতি এবং সবিস্তর ন্যায়দর্শন পাঠ করিয়া পাঠ সমাপ্ত করেন। সে কালে শিরোমণি মহাশয়ের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বিশ্বনাথই প্রখর মেধা ও গভীর পাণ্ডিত্যগুণে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন। একবার কোন ক্রিয়া উপলক্ষে শোভাবাজারের রাজবাটীতে এক মহাসভা হয়। ঐ সভাতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড় প্রভৃতি আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের দূরতম দেশ সকল হইতে নিমন্ত্রিত পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইয়াছিলেন। সেই সভাস্থলে মিথিলা দেশ হইতে সমাগত এক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের সর্বপ্রধান শিষ্যের সহিত রঘুরাম শিরোমণি মহাশয়ের সর্বপ্রধান শিষ্য বিশ্বনাথের বিচার উপস্থিত হয়। ঐ বিচারে সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী দর্শক ও বিচারক ছিলেন। বিচারকালে মৈথিল ছাত্র যখন পরাস্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার গুরু সদ্বিচারের রীতি লঙ্ঘনপূর্বক স্বীয় ছাত্রকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সুতরাং তাঁহারই সহিত বিশ্বনাথের বিচার বাধিয়া গেল। বিচারে সর্ববাদিসম্মতিক্রমে বিশ্বনাথই জয়ী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, শাস্ত্রীয় মীমাংসাতে অদ্ভুত নিপুণতা ও ক্ষুরধারসম মেধা দর্শনে চারিদিক হইতে ধন্য ধন্য রব উত্থিত হইল। সেই দিন হইতে তিনি এবং তাঁহার গুরু পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত হইয়া গেলেন। বিশ্বনাথ রাজভবন হইতে প্রচুর পারিতোষিক লাভ করিলেন; এবং সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী সেই সভামধ্যে তাঁহাকে তর্কভূষণ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিলেন। তদবধি তর্কভূষণ মহাশয় স্বীয় বাসগ্রামে নিজ ভবনেই চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার বিদায়-আদায়ও তাঁহার যশের অনুরূপ। গৃহিণী, পাঁচটী পুত্র, পাঁচটী পুত্রবধূ, চারিটী কন্যা, দশ বারটী পৌত্র পৌত্রী, দুইটী বিধবা ভ্রাতৃজায়া, তদ্ভিন্ন দুইটী আশ্রিতা বিধবা, সাত আটটী ছাত্র, তিনটী ভৃত্য, দুইটী দাসী, ছয়টী সবৎসা গাভী, তিন জোড়া হালের গরু, ইহার উপরে অতিথি অভ্যাগত, এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণ তিনি অবলীলাক্রমে চিরদিন চালাইয়া আসিতেছেন। ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে, তাঁহার আয়ের অবস্থা কি প্রকার। আর

একটী কথা না বলিলে লোকে কিছু ভ্রমে পড়িতে পারেন। বিদায় আদায়ের আয় তাঁহার একমাত্র আয় নহে। তাঁহার পিতামহ ৺কালীকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় একজন ভক্ত শাক্ত লোক ছিলেন। তিনি নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্যে নিজ ভবনে এক পাষাণময়ী কালী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। তদুপলক্ষে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাকি তাঁহাকে এক হাজার বিঘা ভূমি কালীর নামে দেবোত্তর রূপে দিয়াছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার মধ্যম পুত্রের সহায়তায় সেই হাজার বিঘা ভূমির উপরে আরও প্রায় সাত আট শত বিঘা বাড়াইয়াছেন। ইহার উপরে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের আয়। সুতরাং যে বলিয়াছি, তর্কভূষণ মহাশয় যেমন তেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহেন, তাহা সত্য। তাঁহার বসত বাটীটী একটী রাজ্য জুড়িয়া আছে। বাড়ীর মধ্যে পাকা একতালা শয়নের ঘর প্রায় দশটী, দুইটী রান্নাঘর, একটী বিধবাদের, অপরটী সাজার, একটী ভাঁড়ার ঘর, একটী বসিয়া আহার করিবার ঘর ও একটী প্রকাণ্ড ধানের গোলা; তাহাতে সম্বৎসরের খোরাকের ধান সঞ্চিত থাকে। বাহির বাড়ীতে একটী চণ্ডীমণ্ডপ; তাহাতে বসিয়া তর্কভূষণ মহাশয় ছাত্রদিগকে পড়াইয়া থাকেন। চণ্ডীমণ্ডপের দুই পার্শ্বে দুইটী পাশ-ঘরা, সম্মুখে বিস্তৃত উঠান, উঠানের পূর্ব ও পশ্চিমে অতিথি অভ্যাগত ও ছাত্রদিগের থাকিবার জন্য চারি পাঁচটী ঘর, উঠানের দক্ষিণে, দরজার উভয় পার্শ্বে, বিস্তীর্ণ চালা; তাহাতে প্রায় দেড়শত কি দুইশত লোক একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতে পারে। বাহির বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ ঘর ও চালাগুলির ইটের গাঁথুনি কিন্তু খড়ের চাল। বাড়ীর সম্মুখে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী ও তাহার চারিদিকে নানাজাতীয় পুজোপযোগী পুষ্পবৃক্ষ; তন্মধ্যে শ্রীফল ও জবাফুলের গাছ বিশেষ ভাবে শোভা পাইতেছে; বাহির বাড়ীর পশ্চিমদিকে গোয়ালবাড়ী; সেখানে গরুর গোয়াল ও ভৃত্যাদিগের থাকিবার ঘর ও দুইটী প্রকাণ্ড খড়ের গাদা; পূর্বদিকে কালীবাড়ী, তথায় কালীর মন্দির ও তৎসংলগ্ন ভূমিখণ্ডে দুইটী পাকা ঘর; ভিতর বাড়ীর পশ্চাতে স্ত্রীলোকদিগের ঘাট সরিবার জন্য একটী পুষ্করিণী ও তাহার চতুষ্পার্শ্বের জমিতে শিমের সময় শিম, বেগুনের সময় বেগুন, কুমড়ার সময় কুমড়া প্রভৃতি রন্ধনশালার উপযোগী তরিতরকারীর বাগান। এতদ্ভিন্ন গ্রামের পার্শ্বে তাঁহার আর একটী বাগান বাড়ী আছে। তাহার একপার্শ্বে প্রায় ২৫।৩০ ঝাড় বাঁশ, অপরদিকে অনেকগুলি আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল প্রভৃতি ফলের গাছ; মধ্যে একটী পুষ্করিণী; তাহাতে অনেক মৎস্য। সুতরাং যে বলিয়াছি, তর্কভূষণ মহাশয় যেমন তেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহেন, তাহা কি সত্য নহে?

এপ্রকার গৃহস্থের গৃহে কন্যার বিবাহের আয়োজন যেরূপ ধুমধাম সহকারে হইতে পারে, তাহাই হইতেছে। বিশেষতঃ ভুবনেশ্বরী তর্কভূষণ মহাশয়ের সর্ব-কনিষ্ঠা কন্যা। আর ত তাঁহাকে কন্যার বিবাহ দিতে হইবে না; সুতরাং অপর কন্যাদিগের বিবাহে যাহা করেন নাই, ভুবনের বিবাহে তাহা করিতেছেন। এবার ফাল্গুন মাস পড়িলেই নূতন খড় দিয়া বাহির বাড়ীর ঘর ও চালাগুলি ছাওয়া হইয়াছে; ভিতর বাড়ীর ঘরগুলি কলি ফিরাইয়া নূতনপ্রায় করা হইয়াছে; বাড়ীর ভিতরে আর একটী অতিরিক্ত ঘর ভাঁড়ার বলিয়া গণ্য করিয়া প্রায় একমাস কাল হইতে নানা দ্রব্যসামগ্রীতে পূর্ণ করা হইতেছে; বাদ্যকর, মালাকার ও গ্রামের চতুষ্পার্শ্বের চাষালোকদিগকে বিতরণ করিবার জন্য অনেক ডোল পূর্ণ করিয়া চিড়ে, মুড়কী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে; বিবাহের একমাস পূর্ব হইতেই

গৃহ আনন্দ-কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে; কন্যা তিনটী বিবাহোপলক্ষে পতিগৃহ হইতে আনীত হইয়াছে; তাহাদের পুত্রকন্যাগুলি অপরাপর শিশুদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাড়ীটি একেবারে মাথায় করিয়া তুলিয়াছে; দাসদাসীগণ ছোবান নূতন কাপড় পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; ভুবনের গায়ে হলুদের দিন হইতে বাহিরে সানাই ও কাড়া নিরন্তর বাজিতেছে; কয়েকদিন হইতে পিতল-কাঁসার জিনিষ সকল ভারে ভারে বাহির করিয়া মাজা হইতেছে ও বর-সজ্জার জিনিষপত্রে ঘর পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। যে দিন ভুবনেশ্বরীর গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হয়, সেদিন তর্কভূষণ মহাশয় গ্রামস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণকে প্রায় আধসের তৈল সমেত এক একখানি বকুনা বিতরণ করিয়াছেন। বিষয়ী লোকে শুনিলে হয় ত আশ্চর্যান্বিত হইবেন; ভাবিবেন, নশিপুরের ন্যায় একখানি ব্রাহ্মণ-প্রধান গণ্ডগ্রামের সমুদয় ব্রাহ্মণকে এক একখানি বকুনা বিতরণ করা ত বড় সহজ কথা নয়। সে বিষয়ে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বিষয়ী লোকের পক্ষে এত বকুনা বিতরণ করা সহজ নয় বটে, কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়ের পক্ষে তত কঠিন নহে। তাঁহার ভবনের বহুদিন অব্যবহৃত সিন্দুকগুলি খুলিয়া দেখিলে বোধ হয় ২৫।৩০ মণ পিতল-কাঁসার বাসন পাওয়া যায়। পিতলের বকুনা ও ঘড়া প্রভৃতি বৎসরের মধ্যে এত জমে যে মধ্যে মধ্যে কাঁসারি ডাকিয়া কতকগুলি করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। অতএব বকুনা বিতরণ তাঁহার পক্ষে বিশেষ ব্যয়সাধ্য নহে। আর ব্যয়সাধ্য হইলেই বা কি? ভুবনেশ্বরীর বিবাহ তিনি মনের সাধ মিটাইয়া দিতেছেন।

আর দুই দিন পরেই ভুবনেশ্বরীর বিবাহ। লোকজনে বাড়ী গম্-গম্ করিতেছে; বেলা অবসানপ্রায়; দিবাকর পশ্চিমাঞ্চলে ঢলিয়া পড়িয়াছে; রবির কিরণজাল ভূতলকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রমেই বৃক্ষাগ্রভাগকে অবলম্বন করিতেছে; চতুষ্পার্শ্বের গ্রামবাসী কৃষিগণ নশিপুরের হাটে সমস্ত দিন বেচা-কেনা করিয়া ক্রমে গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে; কুলবধূগণ সায়াহ্নিক অঙ্গমার্জনান্তে জলকলস-কক্ষে গৃহাভিমুখে যাইতেছেন, গাভীগণ দিবসান্তে উৎসুক-চিত্তে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে; তর্কভূষণ মহাশয়ের ভবনের অদূরে একদল বালক একটী অচিরজাত গোবৎস লইয়া ক্রীড়া করিতেছে; তাহারা দলবদ্ধ হইয়া অট্টহাস্য ও করতালিদান পূর্বক গোবৎসটীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, আর সেটী ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া অশ্বশিশুর ন্যায় ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে; তাহার জননী রজ্জুতে দৃঢ়বদ্ধ থাকিয়া বৎসটীর প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে ও শিশুকুলের প্রতি বিফল আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে; পাড়ার বালিকারা শিশু-ক্রোড়ে এই কৌতুক দর্শন করিতেছে। এ দিকে তর্কভূষণ মহাশয় চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে একখানি পিঁড়ীতে পৃষ্ঠ দিয়া বসিয়া দুইটী ছাত্রকে ন্যায়ের পাঠ বলিয়া দিতেছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০ কি ৬১ বৎসরের ন্যূন হইবে না। কিন্তু তাঁহার দেহের বল ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখিলে এত বয়স বলিয়া বোধ হয় না। যৌবনকালে তিনি যে বলবান্ পুরুষদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, তাহা তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল, সুগঠিত দন্তপাটি, পলিতার্দ্ধ কেশগুচ্ছ, মাংসল পেশী ও কর্ম্মক্ষম বাহুযুগল দেখিলেই বুঝা যায়। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, গৌরকান্তি বলিলেও হয়; নেত্রদ্বয় বিস্তৃত ও প্রতিভার জ্যোতিতে উজ্জ্বল, বিস্তৃত ললাটে গভীর চিন্তার রেখা ও তদুপরি রক্তচন্দনের ফোঁটা; গলদেশে সোনাবাঁধান রুদ্রাক্ষের মালা; বাম হস্তের নিকটে একটী নস্যের শম্বুক; যখনই কোন কূট তর্ক বা ফাঁকি উপস্থিত

সম্বন্ধ, যেখানে ভালবাসিবার কত বস্তু বিদ্যমান, বিবাহিতা হইয়া পরগৃহবাসিনী হইলেও যেখানে আসিবার জন্য তাঁহার হৃদয় কত না, উৎসুক হইত ও আনন্দে নৃত্য করিত, আজ অলঙ্কারবিহীনহস্তে ও বিধবার বেশে সেই ভবনে তিনি সহসা প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। গাড়ীর এক কোণে মুখ লুকাইয়া চক্ষের জল মুছিতেছেন। অবশেষে ভবেশের ব্যগ্রতায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। ইতিমধ্যে কর্তা মহাশয়ও দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। অন্য সময়ে বিজয়া পিতৃসম জ্যেষ্ঠের চরণে ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণতা হইতেন; আজ তাঁহাকে দেখিয়াই দুর্নিবার শোকসাগর উথলিয়া উঠিল; আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। পুনরায় বাহিরের দ্বারের কপাটের কোণে মুখ লুকাইয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। কেবল ইশারায় সন্তান দুটীকে জ্যেষ্ঠের চরণে প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা মাতুলের চরণে প্রণত হইল। অন্য সময় হইলে তর্কভূষণ মহাশয় তাহাদিগকে দুই একটী আশীর্বাদসূচক কথা বলিতেন; কিন্তু আজ তাঁহারও মুখে বাক্য সরিল না, বিজয়াকেও কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বাভাবিক ধৈর্য ও মানসিক বলের দ্বারা শোকাবেগ সংবরণ করিয়া রাখিলেন; বিশাল চক্ষুদ্বয় আরক্তবর্ণ ও অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিল; কিন্তু সে অশ্রু পড়িতে দিলেন না। ইতিমধ্যে অন্তঃপুর হইতে গৃহিণী, কালীতারা প্রভৃতি মহিলাগণ বিজয়ার অভ্যর্থনার জন্য বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। বিজয়াকে দেখিয়াই কর্ত্রী ঠাকুরাণী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন;—"ওরে বিজয়ী কি সাজ সেজে বাপের বাড়ী আস্‌চে রে!" বিজয়া এতক্ষণ শোকের উচ্ছ্বাস অনেক পরিমাণে সংবরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আর পারিলেন না; মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়ার বক্ষস্থলে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া ধীর স্থির প্রবীণ তর্কভূষণ মহাশয়ও আর দাঁড়াইতে পারিতেছেন না; আবেগে সর্বশরীর কাঁপিতেছে, আর চক্ষের জল রোধ করিয়া রাখা ভার; কঠোর প্রতিজ্ঞাতে ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছেন এবং ঐ শোকের দৃশ্য হইতে অপর দিকে মুখ ফিরাইয়াছেন। অবশেষে কিঞ্চিৎ বিরক্তি-সূচক স্বরে বলিলেন;—"আঃ বাহিরে কান্নাকাটি কেন? বাড়ীর ভিতর লইয়া যাও।" ক্রমে শোকের স্রোত বহিয়া অন্তঃপুর মধ্যে গেল। বধূগুলি ভিতর বাটীর দ্বারে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহারাও সেই ক্রন্দনে যোগ দিলেন। কয়েক মিনিট সে অন্তঃপুরে শোকাশ্রু ও আর্তনাদ ভিন্ন আর কিছুই রহিল না।

তর্কভূষণ মহাশয় চন্ডীমন্ডপে উঠিয়া "তারাঃ" বলিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বস্থানে গিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহার আরক্ত নেত্রদ্বয় ও ধীর গম্ভীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কিয়ৎকাল কাহারও কথা কহিতে সাহস হইল না; সকলেই নিস্তব্ধ। এদিকে ভৃত্যদিগকে বিজয়ার জিনিষপত্র অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে আদেশ করিবার পূর্বেই গোবিন্দ নামে তর্কভূষণ মহাশয়ের স্বগ্রামবাসী একটী ছাত্র মোটগুলি বহিয়া ভিতরে লইয়া গেল; এবং বিজয়ার চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি লইল। বিজয়া সেই শোকাশ্রুর মধ্যেও একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবিন্দ, তোমাদের বাড়ীর সব কুশল?" গোবিন্দ বিনয়াবনত মস্তকে উত্তর দিয়া সেই শোক ও বিলাপধ্বনির ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িল।

অদ্যকার এই শোকাশ্রু ও আর্তনাদের মধ্যেও বাড়ীর শিশুদিগের আনন্দের সীমা নাই। ইন্দুভূষণ ও বিন্ধ্যবাসিনীকে পাইয়া তাহারা যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে

পাইয়াছে; চতুর্দিকে আসিয়া বেষ্টন করিয়াছে, এবং সমাগত পাড়ার বালক-বালিকাদিগের প্রতি এমনি অবজ্ঞা-ও-অহঙ্কারসূচক দৃষ্টিপাত করিতেছে, যেন এমন ইন্দু বিন্দু আর কাহাদেরও হয় না। অর্ধ দণ্ডের মধ্যে ইন্দু বিন্দুর হস্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন পড়িল। তাহারা যে সুস্থির ভাবে বসিয়া আহার করিবে, তাহার যো নাই; বালকবালিকাগণ তাহাদিগকে খিড়কীর পুকুর ও বাগান দেখাইবার জন্য লইয়া গেল। এদিকে ক্রমে শোক শান্তমূর্তি ধারণ করিল, ও মহিলাগণের পরস্পর কুশল-প্রশ্ন আরম্ভ হইল; এবং ভুবনেশ্বরীর বিবাহোৎসবের আনন্দ-স্রোত, যাহা বিজয়ার আগমনে ক্ষণকালের জন্য প্রতিহত হইয়াছিল, পুনরায় সবেগে বহিতে লাগিল।

২

তর্কভূষণ মহাশয়ের পুত্রকন্যাদিগের বিশেষ পরিচয় কিছুই দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদের নামের ইতিবৃত্ত-মাত্র সকলে অবগত হইয়াছেন।

সর্বজ্যেষ্ঠের নাম শিবচন্দ্র বিদ্যারত্ন;—তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের ন্যূন হইবে না। ইঁহার বিদ্যাসাধ্য সুপ্রসিদ্ধ পিতার অনুরূপ নহে, এবং প্রতিভাশক্তিও তাদৃশ নহে; কিন্তু ইনিও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে একজন গণনীয় ব্যক্তি। নানা-শাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি এবং যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কর্মেই ইঁহার অভিনিবেশ। ইনি কলিকাতার হাতীবাগানে নিজের এক চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত আছেন। এতদ্ভিন্ন শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে সভাপণ্ডিতের কার্যও করিয়া থাকেন। ইনি হাতীবাগানে যে বাড়ীতে থাকেন, তাহা একটী সুপ্রশস্ত একতালা পাকা বাড়ী। সে বাড়ীটী রাজারা তাঁহারই জন্য নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

মধ্যম পুত্র শ্রীশঙ্কর;—ইনি জ্যেষ্ঠের অপেক্ষা প্রতিভাশালী ও মেধাবী। ইনিও নবদ্বীপে পাঠ সাঙ্গ করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। তবে সে প্রতিষ্ঠা পিতার ন্যায় নহে। ইনি বাসগ্রামেই অবস্থিতি করিয়া অধ্যাপনাকার্যে পিতার সহায়তা করিয়া থাকেন। শ্রীশঙ্করের আর একটা গুণ এই যে, তাঁহার বুদ্ধি উভয় দিকেই খেলে। তিনি শাস্ত্রের মর্মগ্রহণে যেমন সুচতুর, নব্যস্মৃতিতে বিশেষ পারদর্শিতা থাকাতে, বার, তিথি, প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থাদানে যেমন সুনিপুণ, বিষয়-রক্ষাতেও তেমনি সুদক্ষ। তর্কভূষণ মহাশয়ের বৈষয়িক উন্নতির কথা যে পূর্বে বলিয়াছি, তাহার অনেকটা শঙ্করের বুদ্ধির গুণে; সুতরাং শঙ্কর গৃহে থাকিয়া সকল দিক রক্ষা করিয়া থাকেন; তাঁহাকে পিতার দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তৃতীয় পুত্র গৌরীপতি;—ইনি নবদ্বীপে পাঠ সাঙ্গ করিয়া বেদ বেদান্ত পড়িবার জন্য বিগত দুই বৎসর হইতে কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছেন। লোকের ধারণা, ইঁহার মত বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি এই সুবিখ্যাত পণ্ডিতবংশেও জন্মে নাই। ইনি কুলের ভূষণ, বংশের প্রদীপ ও দেশের গৌরব স্বরূপ হইবেন, এইরূপ সকলের আশা।

চতুর্থ পুত্র হরচন্দ্র;—ইনি কিছুদিন স্বীয় পিতার চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ কাব্য প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু অনবধানতাবশতঃ বিশেষ কিছু শিখিতে পারেন নাই। কিছুকাল হইল পাঠ সাঙ্গ করিয়া এক প্রকার নিষ্কর্মা বসিয়া আছেন। হরচন্দ্র কিছু আমোদপ্রিয় লোক। নিষ্কর্মা লোকের যদি আমোদ-প্রিয়তাটাও না থাকে, তবে কাল কাটান দুষ্কর। হরচন্দ্রের একটী ঈশ্বরদত্ত শক্তি আছে; সে জন্য গ্রামস্থ সমুদায় আমোদপ্রিয় লোক তাঁহাকে চায়। তিনি বেশ গাইতে পারেন। বস্তুতঃ বলিতে গেলে এটি তাঁহাদের পরিবারের পৈতৃক সদ্‌গুণ। তর্কভূষণ মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা ৺তারাদাস তর্কবাচস্পতি মহাশয় একজন সুগায়ক ছিলেন। হরচন্দ্র সেই শক্তি বহুল পরিমাণে উত্তরাধিকারিসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেবল তাহা নহে, তিনি গোপনে একজন ওস্তাদের নিকট বেশ বাজাইতেও শিখিয়াছেন। সুতরাং আমোদ-প্রিয় দলে তাঁহার বড়ই আদর।

পঞ্চম পুত্র ভবেশ;—ইহার বিদ্যাশিক্ষা লইয়া পরিবার-পরিজনের সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের কিঞ্চিৎ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রামে কতিপয় ভদ্রলোকের যত্নে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইলে শিবচন্দ্র, শঙ্কর ও পরিবারস্থ মহিলারা সকলেই ভবেশকে সেখানে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ আস্থা নাই। এ বংশের সকলে সংস্কৃত বিদ্যাতে বিশেষ পারদর্শী হয়, ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। বিশেষতঃ ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য যুবকদলের নানা প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার বিবরণ শুনিয়া তাঁহার মনে এক প্রকার ভীতির সঞ্চার হইয়াছে; সুতরাং তিনি প্রথমে ভবেশকে ইংরাজী স্কুলে দিতে কোনক্রমেই সম্মত হন নাই। সে প্রায় ১৩।১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ কাব্যাদি পড়িল। কিন্তু অবশেষে শিবচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে তাহাকে ইংরাজী স্কুলে দেওয়া হইয়াছে। শিবচন্দ্রের যে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ আস্থা আছে, অথবা নব্য শিক্ষিতদিগের উচ্ছৃঙ্খলতাকে যে তিনি ঘৃণা করেন না, তাহা নহে, বরং অনেক বিষয়ে তিনি স্বীয় পিতা অপেক্ষাও অনুদার; কিন্তু শোভাবাজারের রাজবাটীর বাবুরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে ব্রাহ্মণপণ্ডিতি ব্যবসায়ে আর অধিক দিন চলিবে না; অন্ততঃ সংস্কৃত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে ইংরাজী শিক্ষা করা আবশ্যক। বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্রের হিন্দুস্কুলে পড়িবার ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তদনুসারে ইতিপূর্বেই তর্কভূষণ মহাশয়ের কিঞ্চিৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও গিরিশচন্দ্রকে হিন্দুস্কুলে দেওয়া হইয়াছে। পরে শিবচন্দ্র ভবেশকেও ইংরাজী স্কুলে দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন; তদনুসারে ভবেশ ইংরাজী স্কুলে গিয়াছে।

কন্যাগুলির বিশেষ পরিচয় আর কি দিব? এদেশে ভদ্রকুল-কন্যাদের পরিচয় দিবার রীতি নাই। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট যে তাহারা সকলেই বিবাহিতা এবং প্রথম তিনটী সন্তানসন্ততির মুখ দর্শন করিয়াছে।

ভুবনেশ্বরীর বিবাহের পর প্রায় দশ বার দিন অতীত হইয়াছে। আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন। শিবচন্দ্র এখনও বাটীতে আছেন। ভুবনের বিবাহোৎসব শেষ হইলেই তর্কভূষণ মহাশয়ের অন্তরে একটী প্রবল চিন্তা জাগরূক হইয়াছে;—বিজয়ার জন্য কি করা যায়। তর্কভূষণ মহাশয়ের স্নেহের গভীরতা কত, তাহা তাঁহার ধীর গম্ভীর ও

দুরবগাহ আকৃতির উপরে লক্ষ্য করা যায় না। তাঁহার অল্প মনোগত ভাবই বাক্যে বা বাহিরের উচ্ছ্বাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে; কার্যে সে সমুদায়ের প্রকাশ। বিজয়ার বৈধব্যদশা-প্রাপ্তির দিন অবধি তাঁহার হৃদয়ের মর্মস্থানে একটা আঘাত লাগিয়াছে এবং অপরাপর চিন্তার সহিত বিজয়ার চিন্তা বিশেষরূপে হৃদয়ে জাগিতেছে। তিনি ভাবিতেছেন, বিজয়ার আকার প্রকার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আর তাহাকে চক্ষের অন্তরালে পাঠাইতে সাহস হয় না। আর বস্তুতও নববৈধব্য বিজয়ার দেহমনে সুমহৎ পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। তাঁহার সেই উজ্জ্বল গৌর-কান্তি যেন মলিনতা-মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে; সেই চির-প্রসন্ন মুখ কিরূপ গম্ভীর ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, দেখিলে খেদযুক্ত সম্ভ্রমের উদয় হয়; জীবনের প্রতি কি এক প্রকার অনাস্থা, বিষয়-সুখের প্রতি কি এক প্রকার নির্লিপ্ত ভাব, সকলের প্রতি কি এক অপূর্ব সৌজন্য, নিজের সুখ অপরকে দিবার জন্য কি এক প্রকার ব্যগ্রতা সর্বজীবে কি এক অদ্ভুত দয়া, মুখশ্রীতে কি এক প্রকার পবিত্রতার আভা; দেখিলে বোধ হয় শোকাগ্নি মানবীকে পোড়াইয়া দেবী করিয়া তুলিয়াছে। তর্কভূষণ মহাশয় যে মুহূর্তে বিজয়ার বৈধব্যনিমীলিত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে শোকের দারুণ শেল সে প্রাণে অতিশয় বাজিয়াছে। তদবধি আর তাঁহাকে দেবরদিগের নিকটে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা নাই। আর প্রেরণ করিবেনই বা কাহার নিকটে? দুই দেবরই ইংরাজীতে সুশিক্ষিত বটে, কিন্তু উভয়েরই আচরণ বিগর্হিত, এবং আচার-ভ্রষ্ট বলিয়া উভয়েরই প্রতি তর্কভূষণ মহাশয়ের বিশেষ অশ্রদ্ধা। মধ্যম ডেপুটী কালেক্টরী কর্ম পাইয়া নিজের স্ত্রীপুত্র লইয়া মেদিনীপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। কনিষ্ঠ যদিও উপার্জক এবং কলিকাতাবাসী, তথাপি তাঁহার আশ্রয়ে বিজয়াকে রাখা বাঞ্ছনীয় নহে। এই সকল চিন্তাতে তর্কভূষণ মহাশয়ের মন কয়েকদিন হইতে বিশেষরূপে আন্দোলিত হইতেছে। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছেন যে বিজয়াকে নাশিপুরেই রাখিবেন এবং তাঁহার বিনোদনের জন্য আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসেই একজন উৎকৃষ্ট কথক আনাইয়া বাড়ীতে কথকতার আয়োজন করিবেন। কিন্তু তাঁহার মনের এ পরামর্শ কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই; মনে মনে সমুদায় বন্দোবস্ত করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আর একটী কাজ করিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্বে তিনি এক একখানি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত আনাইয়া, হরচন্দ্রের হাতে দিয়া, মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে পড়িয়া শুনাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই ছিল, পুরাণ শ্রবণ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের অবসরকালটা ভালরূপে কাটিয়া যাইবে এবং ধর্মে মতি বাড়িবে। তদনুসারে হরচন্দ্র মধ্যে মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত পড়িয়া অন্তঃপুরবাসিনী রমণীদিগকে শুনাইয়া থাকেন। কিন্তু কয়েকদিন হইল, কর্তা গৃহিণীর মুখে শুনিয়াছেন যে. বিজয়া স্বীয় পতির নিকট বেশ লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছেন। শুনিয়া দুইদিন কি ভাবিলেন; তৎপরে বিজয়াকে ডাকিয়া উক্ত গ্রন্থদ্বয় পড়িয়া মহিলাদিগকে মধ্যে মধ্যে শুনাইবার ভার দিলেন। মনের অভিপ্রায় বোধ হয় এই রহিল, বিজয়া যখন পড়িতে শিখিয়াছে, তখন এভার তাহাকে দিলে সর্বাংশেই কল্যাণ।

একদিন রাত্রিকালীন আহারের সময় উপস্থিত। তর্কভূষণ মহাশয় বাহির বাটী হইতে অন্তঃপুরে আসিলেন। আসিয়াই সর্বাগ্রে বিধবাদিগের নিকটে গেলেন

এবং তাঁহাদিগের সায়াহ্নিক জলযোগের কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার তত্ত্বাবধান করিলেন। অবশেষে পুত্রগণসমভিব্যাহারে আহার করিতে বসিলেন। গোবিন্দ ও অপর কয়েকজন ছাত্রও বাহিরের রোয়াকে আহার করিতে বসিল। পুত্রগণের সহিত তাহাদিগকে লইয়া আহারে বসিতে তর্কভূষণ মহাশয়ের আপত্তি নাই, কারণ তাহারা বাটীর ছেলেরই মত। কিন্তু তাহা হইলে সে বেচারাদের আর আহার হয় না। তর্কভূষণ মহাশয় এম্নি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, যে, ভয়ে তাহাদের আর মুখে হাত উঠে না। এই জন্য গোবিন্দ গৃহিণী ঠাকুরাণীর দ্বারা বলাইয়া বাহিরে খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। আজ বাহিরে বিজয়া তাহাদের আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, এবং এক একবার আসিয়া জানালার পার্শ্বে গৃহিণীর নিকটে দাঁড়াইয়া ভিতরের আহারকারীদিগকে দেখিতেছেন। পুত্রগণেরও পিতার সঙ্গে আহার করা এক ঘোর বিড়ম্বনা। একে তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রকৃতি অতি গম্ভীর, তাহাতে মেজাজ্‌টা কিছু রুক্ষ। একটু কথার অসাবধানতা, বা কাজের ত্রুটী হইলেই তাঁহার তিরস্কার সহ্য করিতে হয়। সেই ভয়ে ছেলেরাও অনেক সময় স্বতন্ত্র ঘরে আহার করিয়া থাকে। আজ কিন্তু সকলে একত্র বসিয়াছেন। নীরবে আহার চলিয়াছে; শিশুরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; কেবল বিজয়ার কন্যা বিন্ধ্যবাসিনী ও শিবচন্দ্রের একটী কন্যা সুখদা দুইজনে জানালার উপরে বসিয়া আহার দেখিতেছে; জানালার অপর পার্শ্বে গৃহিণী ঠাকুরাণী দণ্ডায়মানা আছেন; তিনি দুইদিকের আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছেন; দুইটি বধূ অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া পরিবেশন করিতেছেন।

মধ্যে কর্তা একবার বিরক্তিস্বরে ভবেশকে বলিলেন, "তোর খাবার সময় শুষ্ শুষ্ শব্দটা এখনও গেল না! সর্বদাই ঝোল টানিস্ কেন?" সে বেচারার আহারের সময় কি এক প্রকার শব্দ হয়। অনেকবার তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেও সর্বদা সাবধান থাকিবার চেষ্টা করে; বিশেষতঃ পিতার সঙ্গে বসিলে ত কথাই নাই; কিন্তু কি তার দুর্ভাগ্য, যেই একটু অন্যমনস্ক হয়, অমনি কোথা হইতে "শুষ্ শুষ্" শব্দটা আসে। আজও দুই একবার সেইরূপ হইয়াছে। গৃহিণীর কোলের ছেলে। তিনি ছাড়িবেন কেন? বলিলেন, "ঐ জন্যেই ত ওরা তোমার সঙ্গে বসে না।" কর্তা উত্তর করিলেন না; আবার নীরবে আহার চলিল। অবশেষে কর্ত্রী ঠাকুরাণী নীরবতা ভঙ্গ করিলেন। তিনটী বিড়াল ভোজনকারীদিগের পাতের নিকট উপস্থিত: তাহার মধ্যে একটা কিছু অধিক অস্থির। সে লাঙ্গুল তুলিয়া ম্যাও ম্যাও করিয়া পরিবেশনকারিণী বধূদিগের সঙ্গে ছুটোছুটি করিতেছে। অপর দুইটী নিতান্ত উদাসীন ভাবে পাতেব অদূরে অর্ধমুদ্রিত নয়নে বসিয়া আছে। তাহাদেরও দৃষ্টি ভোজনকারীদিগের হস্তের সহিত ঊর্ধ্বে ও অধোতে গতায়াত করিতেছে। গৃহিণী অস্থির বিড়ালটীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন;—"মর্ রে! লক্ষ্মীছাড়া বেরালটার ছুটোছুটি দেখ! দূর, দূর, দূর হ! বিন্দু, একগাছা বাড়ি নিয়ে মেরে তাড়িয়ে দে ত!"

তর্কভূষণ মহাশয় এতক্ষণ মার্জারদিগের প্রতি মনোযোগ করেন নাই। গৃহিণীর কথাতে তাঁহার দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি জানিতেন, বাড়ীতে দুইটী বিড়াল আছে। আবার তৃতীয়টী কোথা হইতে আসিল? বলিলেন, "আমাদের ত দুটো বেয়াল ছিল, ওটা আবার কোথা হতে এল?"

গৃহিণী। ঐ হতভাগা দুটো কোত্থেকে ডেকে এনেছে! ছুটোছুটি দেখ না!

তর্কভূ। পেটে ভাত না থাক্‌লে সকলকেই ছুটোছুটি কর্‌তে হয়। এই দেখ ওর ছুটোছুটির ওষুধ আমি দিচ্ছি।

এই বলিয়া মাছ ভাত মাখিয়া পাতের নিকট একরাশি অন্ন দিলেন।

গৃহিণী। ঐ জন্যই ত ওগুলো বাড়ী ছেড়ে নড়ে না; খেয়ে খেয়ে খোদার খাশী হয়ে উঠ্‌ছে!

তর্কভূ। তোমার বাড়ীতে এলে তুমি খেতে দেবে না; আর একজনদের বাড়ীতে গেলে তারা খেতে দেবে না; তবে ওরা বাঁচবে কি করে? ওরা কি বাজার থেকে কিনে এনে রেঁধে খাবে?

এই কথা শুনিয়া পুত্রদিগের বড়ই হাসি পাইল; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া হাসিতে পারিল না।

গৃহিণী। (বিজয়াকে লক্ষ্য করিয়া) শুন্‌লি ভাই, কথা শুন্‌লি? এমন মানুষ কখন দেখেছিস্‌? কলে ইঁদুরটী পড়্‌লে মার্‌তে দেবেন না; কোন জানোয়ারকে একটু কষ্ট দিতে দেবেন না; বেরালগুলোর আদর দ্যাখ না—যেন ঠাকুরপুত্তুর।

বিজয়া। বৌদিদি, থাক্‌, থাক্‌, তোমার বেরাল থেমেছে!

তর্কভূ। (বিজয়ার কণ্ঠস্বর শুনিয়া) এই যে বিজয়া! দেখ বিজয়া, আমি ক'দিন হতে তোমার বিষয় ভাব্‌ছি। তোমার অভিপ্রায় কি? তুমি কি দেবরদের নিকট ফিরে যাবার ইচ্ছা কর?

বিজয়া। তোমরাই ত বলে থাক, এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকের পতিকুলে দেবরের আশ্রয়ে থাকাই কর্তব্য।

তর্কভূ। তা ত জানি; কিন্তু তোমার দেবরেরা যে মানুষের মত নয়!

বিজয়া। তা মিথ্যে নয়; কিন্তু সেটা কেমন দেখায়? লোকে বল্‌বে যেই এম্‌নি দশা হলো, অমনি যাদের সঙ্গে এতদিন কাটালে, তাদের সকলকে ফেলে গিয়ে বাপের বাড়ী উঠ্‌লো!

তর্কভূ। তা ত লোকে বল্‌বে; কিন্তু তা দেখ্‌লে হবে না। দেখ্‌তে হবে, তোমাকে দেখে কে? তোমার আকার প্রকার যেরূপ দেখ্‌ছি, তাতে তোমাকে দেখ্‌বার লোক চাই।

গৃহিণী। আহা! তা বৈকি? এ শরীরটাতে কি কিছু আছে? একেবারে পাত হ'য়ে গিয়েছে। আর ওকে বল্‌লেও ত শুন্‌বে না, বলি বিধবা কি আর কেউ হয় নি? যে গেছে, তার জন্যে শরীরটে পাত ক'রে কি হবে? এক বেলা এক মুঠো খাওয়া, তাও ভাল ক'রে খাবে না, যেখানে সেখানে পড়ে থাক্‌বে, শরীরটার উপরে একেবারে দৃষ্টি নেই; শরীরের আর অপরাধ কি?

বিজয়া। কেবল তাও নয়। ছেলেটা ইংরাজী স্কুলে পড়্‌ছে। ওর কাকা একটু পড়াশুনা দেখ্‌তে পারে। তাদের ছেলে তারা মানুষ কর্‌লেই ত ভাল।

শঙ্কর। কেন, ভবেশ ত এখানকার ইংরাজী স্কুলে পড়ে; আর এ স্কুলও ভাল; ইহার উন্নতি বিষয়ে বাবুদের বেশ মনোযোগ আছে; এখানেই ইন্দুকে দেওয়া যাবে; ভবেশের সঙ্গে যাবে আস্‌বে।

বিজয়া আর দুইটী কথা আপাততঃ গোপন রাখিলেন। প্রথম, তাঁহার পরলোকগত পতি নন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মৃত্যু-শয্যাতে স্বীয় সহোদর-দিগের হস্তে তাঁহাকে ও পুত্রকন্যাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। সেই মৃত্যু-শয্যার

আদেশ তাঁহার মনে অনুল্লঙ্ঘনীয় হইয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয় কথা, তাঁহার কন্যা বিন্ধ্যবাসিনীকে লেখাপড়া শিখাইবার ইচ্ছা। সে এখন কলিকাতার বেথুন সাহেবের নব-প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ে পড়ে। তাঁহার পতি মহাশয় একজন সুশিক্ষিত, উদারভাবাপন্ন ও বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। মহাত্মা বেথুনের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা ছিল। বেথুন তাঁহাকে অতিশয় প্রীতি করিতেন। বেথুনের বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে তিনি একজন উৎসাহ-দাতা ও সহায় ছিলেন; এবং নিজ কন্যাটীকে পাঠোপযুক্ত বয়স হইবার পূর্বেই ঐ স্কুলে দিয়াছিলেন। কেবল তাহা নহে; তাঁহারই প্রযত্নে বিজয়া ঘরে বসিয়া অতি উত্তমরূপ বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছেন। তিনি নিজে জ্ঞানের রসের আস্বাদ পাইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা যে কন্যাটীর পাঠের সুব্যবস্থা হয়। নশিপুরে তাহার কতদূর সুবিধা হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ। কয়েকজন শিক্ষিত যুবকের উদ্যমে গ্রামে একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উদ্যোগ-কর্তৃগণ তর্কভূষণ মহাশয়ের বাটীর বালিকাদিগকে লইতে আসিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "বালিকা-দিগের দশ বৎসর না হইতেই ত বিবাহ দিতে হইবে, দুই অক্ষর বাঙ্গালা পড়াইয়া কি হইবে?" এই কথা শুনিয়াই তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। তৎপরে কেহ আর বিশেষ জেদ করে নাই; সুতরাং এ পরিবারের বালিকারা স্কুলে যায় না। বিজয়ার সন্দেহ আছে, তর্কভূষণ মহাশয় বিন্ধ্যবাসিনীকে স্কুলে যাইতে দিবেন কি না। এ সকল কথা এখন ব্যক্ত করিলেন না, কেবল বলিলেন, "আচ্ছা ভেবে দেখি, কি করিলে ভাল হয়।"

ভবেশ। না, ছোটপিসি! তোমার যাওয়া হবে না! তুমি আবার কি ভেবে দেখ্‌বে? ছোটপিসী আমাদের সকলকে ভালবাসেন না কিনা, তাই কেবল যাব যাব করেন!

তর্কভূ। (কিঞ্চিৎ বিরক্তি-কর্কশ স্বরে) "থাক্, তোর রসিকতা রেখে দে!"

ভবেশ বেচারা অপ্রস্তুত! প্রথম তিরস্কারের পর অদ্যকার রাত্রে তাহার আর কথা কহা উচিত হয় নাই।

আহারান্তে তর্কভূষণ মহাশয় "ভেলো" কুকুরকে ভাত দিবার জন্য হরচন্দ্রকে আদেশ করিয়া আচমনার্থ নিজের শয়ন-ঘরের দিকে গমন করিলেন। শিবচন্দ্র ও শঙ্কর বাহির বাটীতে গেলেন। হরচন্দ্র অন্নমুষ্টি লইয়া খিড়কীতে গিয়া "ভেলো, ভেলো! আয়, আ-তু-তু" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভবেশ আচমনান্তে তাড়াতাড়ি আসিয়া আনন্দে করতালি দিয়া বলিতে লাগিল, "এইবার ছোটপিসি! এইবার কি হবে? এইবার শক্ত হাতে পড়েছ; বাবার হাতে পড়েছ, এইবার ত থাক্‌তেই হবে!" এই বলিয়া আনন্দে কালীর পৃষ্ঠে এক কীল।

কালী। মাগো গিছি!

গৃহিণী। মেয়েটাকে মার্‌লে দেখ!

তারা। ওর ভালবাসা ঐ রকম! যাকে ভালবাসে তার হাড়গোড় ভেঙ্গে দেয়।

বিজয়া। সত্যি! ওর মুখ দেখ্‌লে আর যেতে ইচ্ছা করে না। ভবেশ, আমি থাক্‌লে তুমি বড় খুসী হও?

ভবেশ। তার আর কথা! তুমিই ত আমাদের ঘরের লক্ষ্মী।

জ্যেষ্ঠাবধূ। আচ্ছা উনি শোবেন কোথায়?

ভবেশ। কেন আমার ঘরে!

জ্যে, ব। তুই কোথায় যাবি? (পাঠক ভুলিবেন না, ভবেশ জ্যেষ্ঠা বধূর দ্বিতীয় সন্তানের সমবয়স্ক।)

ভবেশ। কেন, মার কাছে।

জ্যে, ব। আর ছোট বৌ যখন আস্‌বে, কোথায় থাক্‌বে?

ভবেশ। (কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবে) সে যেখানে ইচ্ছা থাক্‌বে। কেন, ছোটপিসীর কাছে থাক্‌বে?

জ্যে, ব। আঃ কপাল! এমন মানুষেরও বিয়ে দেয়! এত বয়েস হলো, দাড়ি গোঁপ উঠ্‌লো, তোর বুদ্ধিশুদ্ধি হবে কবে?

গৃহিণী। আলাই বালাই, কিসের বয়েস! তোমরাই মেনে বয়েস দেখ! ও আমার কাল্‌কের ছেলে; সবে সতের বছর; ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস, ও আমার বেঁচে থাক্।

অম্‌নি সন্তানের প্রতি এক ঝলক ভালবাসা উথলিয়া উঠিল; স্নেহে তাহার মস্তক নিজবক্ষে ধারণ করিলেন।

ভবেশ। (আদরে মাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া) দেখ ছোটপিসি! আমাদের এই মা'টা যেন মিছরির কুঁদো।

বিজয়া। তা সত্যি!

ক্রমে রমণীগণ রন্ধনশালার দিকে গমন করিলেন, ভবেশ তাহার ঘরে গিয়া পড়িতে বসিল।

রাত্রিকালে বিজয়া শয্যাতে শয়ন করিয়া নিজের নশিপুরে থাকিবার বিষয় অনেক চিন্তা করিয়াছেন। মুমূর্ষুপতির মৃত্যু-শয্যার সে আদেশটী তিনি কোন-ক্রমেই অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না। প্রেমের কি স্বধর্ম! মৃত ব্যক্তির চরিত্রের গুণাবলী প্রেমাস্পদের চিত্তের উপরে দ্বিগুণ বলের সহিত কার্য করে। নন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজয়া এখন যেরূপ নিকটে অনুভব করিতেছেন, বোধ হয় জীবদ্দশাতে তত করেন নাই। তাঁহার এক একটী কথা ও এক একটী কাজ যেন জীবন্ত হইয়া তাঁহাকে শাসন করিতেছে। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন,— 'দেবরগণ আমাকে তাড়াইয়া না দিলে আমি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া দূরে থাকিতে পারি না।' বিন্ধ্যবাসিনীর শিক্ষার বিষয়ে এই স্থির করিলেন যে, এ বিষয়টা জ্যেষ্ঠের নিকট গোপন করা বিধেয় নয়; তৎপর দিনই সমুদায় কথা ভাঙ্গিয়া বলিবেন; যদি সে বিষয়ে জ্যেষ্ঠের অমত হয়, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় থাকিতে হইবে।

পরদিন মাধ্যাহ্নিক আহারের পর বিশ্রামান্তে তর্কভূষণ মহাশয় উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া বসিবামাত্র বিজয়া তাঁহার শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন।

তর্কভূ। কি বিজয়া, কোনও কথা আছে নাকি?

বিজয়া। হাঁ আছে।

তর্কভূ। কি কথা।

বিজয়া। তুমি যে আমাকে এখানে থাক্‌তে বল্‌ছো, সে বিষয়ে একটা কথা আছে। বিন্দু কল্‌কেতার মেয়ে স্কুলে পড়ে। তাঁর বড় সাধ ছিল বিন্দুকে ভাল ক'রে লেখাপড়া শেখাবেন, মর্‌বার সময়ে আমাকেও অনুরোধ ক'রে গেছেন; এখানে থাক্‌লে ত বিন্দুর পড়াশুনা বন্ধ হবে।

তর্কভূ। (একটু বিরক্ত স্বরে) তোমাদের ঐ গুলোই ত আমি ভালবাসি না।

নন্দকিশোর সৎলোক ছিল বটে, কিন্তু সকল কাজে একটু বাড়াবাড়ি ছিল। তার ফল দেখ, ভাই দুটোর কি দশা ঘটেছে। মেয়েছেলের লেখাপড়ার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? আর পড়বেই বা কত দিন? দশ বৎসর না হতেই ত শ্বশুর ঘরে পাঠাতে হবে। এদেশে ত কোনও দিন মেয়েছেলের লেখাপড়ার প্রথা নাই; সংসারের কোন্ কাজটা আট্‌কে আছে?

বিজয়া। তোমার কাছে আমার প্রাচীনকালের কথা বলা শোভা পায় না। শুনেছি সেকালে নাকি মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌তেন এবং জ্ঞানীদের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ কর্‌তেন? আর শাস্ত্রেও নাকি স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষাতে নিষেধ নাই।

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি; যে একটু উষ্ণতা আসিয়াছিল, ভগিনীর পবিত্র ও সরলতাপূর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। পুনরায় ধীরভাবে বলিলেন,—"হাঁ তুমি যা শুনেছ তা সত্য; প্রাচীনকালে রমণীদের বিদ্যাশিক্ষার রীতি ছিল বটে, আর ইহাও সত্য যে, এ বিষয়ে শাস্ত্রে নিষেধ নাই। আমার মনের কথাটা এই, যে প্রথাটা রহিত হয়েছে, এমন কি দরকার পড়েছে, যে নূতন ক'রে সে প্রথাটা চালাতে হবে?"

বিজয়া। দরকার আছে বৈ কি? আচ্ছা ভেবে দেখ দেখি, আমি পড়্‌তে জানি ব'লে তুমি আমাকে রামায়ণ মহাভারত পড়ে বৌদের শোনাতে বলেছ। যে জন্য বলেছ তা আমি বুঝেছি; আমার একটা কাজ বাড়ে ও বৌদেরও উপকার হয়। যদি বৌরা পড়তে পার্‌তেন, রামায়ণ মহাভারত পড়ে কি উপকার পেতেন না? বিদ্যাশিক্ষা কর্‌লে ত জ্ঞানলাভ কর্‌বার উপায় হয়; জ্ঞান কি পবিত্র বস্তু নয়? কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলের পক্ষেই কি জ্ঞানলাভ করা দরকার নয়?

এ বিষয়ে তর্কভূষণ মহাশয় কখনও এত কথা ভাবেন নাই। রামায়ণ মহাভারত পড়ার কথাতেই তাঁহার চিত্তের সমক্ষে একটা নূতন চিন্তা আনিয়া দিল; তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, বিন্ধ্যবাসিনী যাঁহার কন্যা, সে ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে একজন উৎসাহী লোক ছিলেন; বিজয়ারও সাধ কন্যাকে লেখাপড়া শেখায়; এ অনুমতি না পাইলে হয়ত কলিকাতাতে চলিয়া যাইবে; গিয়া সেই সকল স্বজাতি-ও-স্বধর্ম-বিদ্বেষী লোকের সংস্রবে পড়িবে; যে ভয়ে তাহাকে দূরে রাখিতে চাহিতেছি, তাহা পূর্ণমাত্রায় ঘটিবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা তুমি যদি ইচ্ছা কর ত তোমার মেয়েকে এখানকার স্কুলে দিও।"

বিজয়া। তবে কাল কি পরশু আমি একবার কলিকাতায় যাই; যদি এখানে থাক্‌তে হয়, তবে আমার দেবরদের অনুমতিক্রমেই থাকা উচিত।

তর্কভূ। তা বৈ কি? সে বেশ কথা। যাও তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এসগে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠের প্রথমে আস্‌বার চেষ্টা ক'রো; জৈষ্ঠ্যের প্রথমে কালীবাড়ীতে কথা বস্‌বে। আমার ইচ্ছা তুমি তখন এখানে থাক।

এই কথোপকথনের দুই একদিন পরেই বিজয়া কলিকাতায় কনিষ্ঠ দেবরের ভবনে গমন করিলেন।

পরলোকগত নন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজয়ার জন্য বিশেষ কিছু সংস্থান করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় দয়ালু ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। আত্মীয়স্বজনের, প্রতিবেশিবর্গের ও অপরাপর লোকের সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। এরূপ লোকের হস্তে অর্থ সঞ্চিত হওয়া বড়ই কঠিন। তাহাতে আবার তাঁহাকে স্বীয় উপার্জিত অর্থের দ্বারা সমগ্র পরিবারের ব্যয়ভার চালাইয়া, সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়ের উৎকৃষ্টরূপ শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে হইত। যৌবনের প্রারম্ভেই পিতামাতার পরলোক হওয়াতে তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের অভিভাবক ও পিতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রক্ষা, শিক্ষা ও পরিণয়াদি সমুদায় কার্য তাঁহাকেই সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। ভ্রাতৃদ্বয়কে যত উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, তাহা দিবেন, এই তাঁহার মনে একটা সাধ ছিল। সুখের বিষয় যে, সে সাধ পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি মরিবার কিছু দিন পূর্বে উভয় ভ্রাতাকেই সুশিক্ষিত ও কৃতী দেখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যু-শয্যাতে উভয় সহোদরকে নিকটে ডাকিয়া তাহাদের হস্তে স্বীয় বিধবা পত্নী ও পুত্রকন্যার ভার অর্পণ করিয়া যান।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মধ্যম সহোদর হরিকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় একটী ডেপুটী কালেক্‌টারী কর্ম পাইয়া মেদিনীপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি একজন সেকালের হিন্দু কালেজের সীনিয়র স্কলারশিপ-প্রাপ্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তি। কালেজে থাকিতে থাকিতেই ইঁহার যশঃসৌরভ চারিদিকে এরূপ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল যে, তখনই তাঁহার দিকে রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; এবং কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইবামাত্রই দুই শত টাকা বেতনের একটী কর্ম প্রাপ্ত হন। সেই কর্ম হইতে ডেপুটী কালেক্‌টর পদে উন্নীত হইয়াছেন। ইংরাজী-শিক্ষিত দলে ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই বলে, বাঙ্গালীর ছেলে হইয়া এমন ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে প্রায় দেখা যায় না। আর বাস্তবিক সে কথাও সত্য; তাঁহাকে ইংরাজী-সাহিত্য-মৌচাকের একটী মাছি বলিলেও হয়! ইংরাজী সাহিত্যে এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নাই যাহা তিনি পাঠ করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি মিল্‌টনের "প্যারাডাইজ্‌ লষ্ট্‌" হইতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারেন। শেক্ষপীয়ারের নাটক সকল এমন সুন্দর রীতিতে পড়িতে পারেন যে, পার্শ্বের ঘর হইতে শুনিলে লোকের বোধ হয় যেন একজন ইংরাজ অভিনয় করিতেছে। এরূপ শুনা যায় যে, তাঁহার শেক্ষপীয়ার পড়া শুনিয়া কাপ্তেন রিচার্ডসন্‌ সাহেব একবার তাঁহাকে কতকগুলি পুস্তক পারিতোষিকস্বরূপ উপহার দিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে পাঠকালে হরিকিশোর অপর কতিপয় যুবকের সহিত সম্মিলিত হইয়া একটী বিতর্ক-সভা (Debating Society) স্থাপন করেন। সেই সভাতে তাঁহারা কয়েকজন প্রধান বক্তা ছিলেন। কিন্তু বক্তৃতাশক্তিতে হরিকিশোরকে কেহই অতিক্রম করিতে পারিত না। তিনি যখন ওজস্বিনী ভাষাতে সুযুক্তিসহকারে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা, জাতিভেদের কদর্যতা প্রভৃতি বর্ণনা করিতেন, তখন সভাস্থ যুবক-দলের মন একেবারে অগ্নিময় হইয়া উঠিত; এবং তাহারা করতালির চটপটা ধ্বনিতে ঘর কম্পান্বিত করিয়া তুলিত। সভাভঙ্গে সকলেই হরিকিশোরকে একটা

প্রকাণ্ড রিফরমার বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তি করিতে করিতে ঘরে যাইত। আর হরিকিশোর যে যৌবনের প্রারম্ভেই একজন রিফরমার বা সংস্কারকদলভুক্ত লোক হইয়াছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি ইংরাজী শিক্ষার গুণে উদারভাবাপন্ন হইয়াছিলেন; দেশ-প্রচলিত কোন প্রকার কুসংস্কার তাঁহার মনে ছিল না; এবং ইহা দেখাইবার জন্যই বোধ হয়, দশজন যুবক একত্র হইলে সর্বসমক্ষে সাহস করিয়া সুরাপান করিতেন। সে সময়ে সুরাপান করাটা রিফরমারদিগের একটা প্রধান লক্ষণ ছিল। নন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় মিতাচারী লোক ছিলেন। তিনি সহোদরের এই রিফরমেশনের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করেন। ইহা লইয়া দুইভ্রাতাতে বিবাদ ও কিছুদিন মনান্তরও ঘটিয়াছিল। অবশেষে হরিকিশোর স্বীয় কর্মস্থলে গমন করেন ও নন্দকিশোরের মৃত্যু হয়।

সর্বকনিষ্ঠ যুগলকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়; ইনিও একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। তবে মধ্যমের ন্যায় যশস্বী হইতে পারেন নাই। ইনি সম্প্রতি কলিকাতায় জি, টি, সার্ভে অফিসে, একশত টাকা বেতনে একটী কর্মে নিযুক্ত আছেন। পঠদ্দশাতে রিফরমেশন বিষয়ে ইনি মধ্যমের অনুগামী হইয়াছিলেন; অর্থাৎ গোপনে একটু একটু সুরাপান ও অখাদ্য-ভোজন করিতে শিখিয়াছিলেন। নন্দকিশোরের জীবদ্দশাতে রিফরমেশনের বেগটা কিছু সংযত ছিল। তিনি পরলোকগত হইলে যুগলকিশোর অবাধে ও অসঙ্কোচে নিজের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার কলিকাতার বাসার বৈঠকখানাতে প্রায় প্রতিদিন রাত্রেই কতকগুলি সমবয়স্ক বন্ধুর সমাগম হইয়া থাকে। সকলেই ইংরাজী-শিক্ষিত, সকলেই সংস্কারক ও স্বজাতি-বিদ্বেষী। ইংরাজ জাতির মত জাতি নাই, শেক্ষপীয়ারের মত কবি নাই, বেকনের মত জ্ঞানী নাই, নিউটনের মত তত্ত্ববিদ্ নাই, ইংরাজী সুরার মত আমোদ দিবার জিনিষ নাই, এবিষয়ে ঐ যুবকদলের সকলেরই মতের অদ্ভুত একতা। তাঁহারা পাঁচজনে একত্র হইলেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বিদ্রূপ, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রতি উপহাস ও প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিয়া থাকেন; এবং সর্বশেষে ইংরাজী সুরা সেবনের দ্বারা, ও অখাদ্য ভোজনের দ্বারা, সংস্কারকার্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্বক স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হন। অবশ্য এত কথা বাহিরের লোকের বিদিত নহে; একটা জনরব আছে এইমাত্র। সেকেলে লোকেরা এই যুবকদলকে মনে মনে ঘৃণা করেন ও দূরে পরিহার করিবার চেষ্টা করেন। বিজয়াকে কলিকাতাতে থাকিতে হইলে, এই দেবরেরই আশ্রয়ে থাকিতে হয়; তাহাতে তর্কভূষণ মহাশয়ের বিশেষ আপত্তি। কিন্তু যে দিন নন্দ-কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুশয্যাতে সহোদরদ্বয়কে ডাকিয়া তাঁহাদের হস্তে স্বীয় পত্নী ও পুত্রকন্যার ভার অর্পণ করিয়া যান, সে দিনের, সে ঘটনার কথা বিজয়ার স্মৃতিতে জাগ্রত রহিয়াছে। দেবরদ্বয়ের নিকট হইতে দূরে থাকিবার প্রস্তাব যখনই তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হয়, তখনই যেন তাঁহার মন বলে, তাহা হইলে তিনি অপরাধিনী হইবেন। সুতরাং তিনি স্বীয় পতির মৃত্যুশয্যার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া পুত্রকন্যার রক্ষা ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবার জন্য দেবরদ্বয়কে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যুগলকিশোরের কথার ভাবে বোধ হইল, তিনি একাকী সে ভার বহনে অসমর্থ ও অনিচ্ছুক। হরিকিশোর অধিকাংশ সাহায্য করিলে তিনি তাহাদিগকে স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাখিয়া শিক্ষাদান করিতে পারেন। এই কথোপকথনের পর বিজয়া সমুদায় বিবরণ আনুপূর্বিক লিখিয়া মধ্যম

দেবরকে মেদিনীপুরে পত্র লিখিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, পত্রের কোনও উত্তর নাই। কয়েকদিন পরে বিজয়া দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন, তাহারও উত্তর নাই। শেষে যুগলকিশোর মধ্যমের অভিপ্রায় জানিবার জন্য নিজে এক পত্র লিখিলেন। সংক্ষেপে উত্তর আসিল;—"আমার অনেক দেনাপত্র; আমি অধিক কিছু সাহায্য করিতে পারিব না, তবে ইন্দু যদি হিন্দুস্কুলে পড়ে, তাহার স্কুলের বেতন পাঁচ টাকা মাসে দিতে পারি।" এই উত্তর পাইয়া যুগলকিশোর অতিশয় চটিয়া গেলেন। বলিলেন, "দেনাপত্রের জ্বালা কি কেবল তাঁরই? আমারও অনেক দেনাপত্র আছে। তিনি যদি তিন শত টাকা বেতন পাইয়াও পাঁচ টাকার অধিক দিতে না পারেন, তবে আমি কোন্ সাহসে একেলা এত বড় ভারটা গ্রহণ করি?"

বিজয়া দেবরদ্বয়ের এই ভাব দেখিয়া মর্মাহত হইলেন। পতির মৃত্যুশয্যার সেই দৃশ্য বার বার তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইতে লাগিল; পতি মহাশয় দেবরদ্বয়ের সুশিক্ষার জন্য যাহা কিছু করিয়াছিলেন সমুদায় চক্ষের নিকট আসিতে লাগিল; সেই সকল স্মরণ করিয়া গোপনে অনেক অশ্রু বিসর্জন করিলেন। অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া নশিপুরে থাকিবার জন্য দেবরদ্বয়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। এ অনুমতি পাইতে আর অধিক বিলম্ব হইল না। যুগলকিশোর বলিলেন, "সে ত বেশ! এখানে থাকা আর সেখানে থাকা একই কথা।" বিজয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিলেন না। অবশেষে তাঁহার নশিপুরে ফিরিয়া আসাই স্থির হইল।

বিজয়া যখন নশিপুরে পুনরাগমন করিলেন, তখন তর্কভূষণ মহাশয়ের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের আনন্দ আর মনে ধরে না! গৃহিণী বলিলেন, "বাঁচলাম বাপু, তুই আমার হাতের কাজগুলো বুঝে নিলে আমি বাঁচি।" পুত্রগণ সকলে মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল; বধূগণ বিজয়াকে বেষ্টন করিয়া অকৃত্রিম সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; দাস দাসী পরিবার পরিজন কাহারই আনন্দ প্রকাশ করিতে বাকি রহিল না। তর্কভূষণ মহাশয়ের আনন্দ বাহিরে বুঝিতে পারা গেল না; কিন্তু বিজয়া দারুণ বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার স্নেহ ও পরিবারপরিজনের আদর-যত্নের মধ্যে নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, ইহাতে তাঁহার প্রাণে যে গভীর তৃপ্তি জন্মিল, তাহার কিছু কিছু সেই গভীর আকৃতিতেও লক্ষ্য করিতে পারা গেল। বিজয়া নশিপুরে প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র গৃহিণী তাঁহার হস্তে ভাঁড়ারের চাবিগুলি দিয়া তাঁহাকে এক প্রকার সংসারের কর্ত্রী করিয়া দিলেন। তিনি সেই ভার যথাসাধ্য বহন করিতে লাগিলেন।

বিজয়া গৃহের কর্ত্রী হওয়াতে দাসীদ্বয়, বিধবা চতুষ্টয় ও বধূগণ, সকলেরই অল্পাধিক কাজ বাড়িয়া গেল। পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলার দিকে তাঁহার অতিশয় দৃষ্টি। গৃহে বা প্রাঙ্গণে বা কোনও লুক্কায়িত কোণে, কোন স্থানেই, একটু মলিন দ্রব্য পড়িয়া থাকিবার যো নাই; তাহা হইলেই দাসীদ্বয়কে তিরস্কার সহ্য করিতে হয়। বধূগণ নিজ নিজ গৃহ অপরিষ্কার বা বিশৃঙ্খল করিয়া রাখিতে পারেন না; রাখিলেই দেখিতে পান যে বিজয়া নিজে তাঁহাদের গৃহ পরিষ্কার করিতেছেন ও জিনিষ পত্র গুছাইতেছেন। তখন তাঁহারা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ঝাঁটাগাছি কি কাপড়খানি কাড়িয়া লইতে পথ পান না। পূর্বে সংসারের কাজকর্মের শৃঙ্খলা ছিল না; কে কি করিবে, তাহার ঠিক থাকিত না; "তরকারিগুলো কুটে দেওনা গো, মাছটা কুটে দেওনা গো", করিতে করিতে

একজন বধূ গিয়া কুটিতে বসিলেন; এইরূপে কাজ চলিত। ফল এই হইয়াছিল, কোন কাজ সময়ে হইত না। বিজয়া সে নিয়ম রহিত করিলেন। রন্ধন, মাছ-তরকারি কোটা, ছেলেদের প্রাতরাশ প্রস্তুত করা, প্রভৃতি সমুদায় কার্যের ভার এক এক জনকে ভাগ করিয়া দিলেন; এবং নিজে সকলের সঙ্গে থাকিয়া খাটিতে লাগিলেন। যেন কলের মত সমুদায় কাজ চলিতে লাগিল। অবশ্য বিজয়ার পরিশ্রমটা কিছু গুরুতর হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি হৃষ্ট-চিত্তে সে শ্রম বহন করিতে লাগিলেন। কেবল তিনি কেন, মিষ্ট স্বভাবের এমনই গুণ, তাঁহার ব্যবস্থা সকলেই হৃষ্ট-চিত্তে পালন করিতে লাগিলেন।

এ স্থলে কেহ কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে, রন্ধনের ভার, মাছতরকারি কোটার ভার, ছেলেদের প্রাতরাশের ভার, এ সমুদায় ভার ত অপরের হস্তেই রহিল। গৃহিণীর নিজের হস্তে কেবল এক ভাঁড়ারের ভার ছিল। তাহাও যদি বিজয়াকে দিলেন, তবে তাঁহার আর কি কাজ থাকিল? কেন, তাঁহার কি কাজ নাই? যে দশ বারটী পৌত্র পৌত্রীর উল্লেখ করিয়াছি, সে স্কুলটী রাখে কে? সে কি সাধারণ ব্যাপার? তাহাদের মধ্যে সর্বদাই কিচিমিচি, টিকটিকি, চুলোচুলি, হাতাহাতি, নখাঘাত, দংষ্ট্রাঘাত ও পদাঘাত প্রভৃতি চলিতেছে। সে সময় সেই শিশুদলের মধ্যে পড়িয়া বিবাদের মীমাংসা করা, চিনির পাতাটি বা মিছরির কাগজটি বাজারের সামগ্রীর সহিত আসিয়া নামিবামাত্র যখন একেবারে সেইদিকে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র চরণের গতি হয়, তখন অগ্রসর হইয়া সেগুলি রক্ষা করা ও নখে খুঁটিয়া একটু একটু দিয়া সকলকে বিদায় করা, ঐ ক্ষুদ্র সৈন্যদলের কাহারও সর্দি কাসি জ্বর প্রভৃতি হইলে গাছ-গাছড়া প্রভৃতি কুড়াইয়া পাঁচন প্রলেপ প্রভৃতি প্রস্তুত করা, বঁটীতে কলম কাটিয়া কয়লা ঘসিয়া কালি করিয়া বালকদিগকে পাঠশালে প্রেরণ করা, এবং সর্বশেষে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে ঐ শিশুদের মধ্যে সমাসীন হইয়া "একানড়ের কথা", "ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী পাখীর কথা", "পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা" প্রভৃতি নানা কথা বলিয়া তাহাদিগকে নিদ্রায়িত করা, এসকল কি কাজের মধ্যে নয়? তাঁহার কাজের অভাব কি? বৎসরে একটী দুইটী করিয়া তাঁহার বংশ বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং তাঁহার কাজের অন্ত নাই। বরং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে বিজয়া আসিয়া সংসারের ভার গ্রহণ করাতে তিনি তাঁহার নিজের প্রকৃত কাজ করিবার অধিক সময় পাইলেন।

একদিন বেলা তৃতীয় প্রহর গড়াইয়া যায়; উঠানের রৌদ্র গোলার গায়ে উঠিতেছে, দাসীদ্বয়ের একজন গৃহ মার্জনা করিতেছে, অপর জন জল বহিতেছে; বিধবাদের একজন রোয়াকের এক পার্শ্বে বসিয়া পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া শলিতা পাকাইতেছেন; গৃহিণীর আসর এখনও ভাঙ্গে নাই; তিনি সম্মুখের রোয়াকে পা ছড়াইয়া বসিয়াছেন, একটী বধূ মাথার চুল বাছিয়া দিতেছে, আর একজন স্থূল বর্তুল বাহুখানি নিজ কক্ষে লইয়া একটী ছোট ঝিনুকের দ্বারা ঘামাছি মারিতেছে; জ্যেষ্ঠা বধূ নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া তাঁহার ঘরে সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটিকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছেন; পার্শ্বের দাবাতে ছেলেরা পুতুল খেলিতেছে; বিজয়া তাঁহার ঘরে শয়ন করিয়া একাগ্রমনে নিজে রামায়ণ পাঠ করিতেছেন, ওদিকে বাহিরে কালীবাড়ীতে কথকতা বসিবার উপক্রম হইতেছে, ধর্মানুরাগী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ এক একটী করিয়া কথকতার আসরে আগমন করিতেছেন; কথক ঠাকুর বাহির বাড়ীর পশ্চিমের ঘরে মাধ্যাহ্নিক আহারের পর

একঘুম ঘুমাইয়া উঠিয়া মুখহস্তাদি প্রক্ষালন করিতেছেন; এবং তর্কভূষণ মহাশয় আহারান্তে বিশ্রামের পর চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া স্বস্থানে বসিয়াছেন; এমন সময়ে গোবিন্দ একজন চাষা লোককে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ ব্যক্তি তর্কভূষণ মহাশয়ের একজন প্রজা। সে দুইটী বড় মাছ, দুইটী মানকচু ও অপরাপর অনেক সামগ্রী উপঢৌকন স্বরূপ লইয়া আসিয়াছে। গৃহিণী ডাকিয়া বলিলেন, "ভাঁড়ারী ঠাকরুণ পড়া ছেড়ে ওঠ গো, তোমার ভাঁড়ারের জিনিষ এসেছে।" ইহা শুনিয়া বিজয়া বাহিরে আসিলেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভাঁড়ারের দিকে গমন করিলেন। ভাঁড়ারে জিনিষগুলি পৌঁছাইয়া দিয়া গোবিন্দ চলিয়া যায়, এমন সময় বিজয়া ডাকিলেন—"গোবিন্দ, শোন!" গোবিন্দ দাঁড়াইল।

বিজয়া। আমি অনেকদিন হতে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করব মনে করছি; এতদিন হয়েই ওঠে নি। তুমি কি পড়া ফেলে এসেছ?

গোবিন্দ। না, আমাদের পাঠ দেওয়া সাঙ্গ হয়েছে।

বিজয়া। তবে একটু স্থির হয়ে শোন। তোমরা এখন কয় ভাই বোন্?

গোবিন্দ। পাঁচ ভাই, দুই বোন্।

বিজয়া। তোমাদের চলে কি প্রকারে?

এইবার গোবিন্দের মুস্কিল! সে অতি লাজুক ছেলে, সহস্র কষ্ট পাইলেও আপনাদের দারিদ্র্যের কথা কাহাকেও বলে না। কাহারও নিকট কোনও দিন কোনও সাহায্য প্রার্থনা করে নাই। আপনাদের দুঃখের কাহিনী লইয়া কাহারও দ্বারস্থ হওয়াকে কাপুরুষোচিত কর্ম্ম বলিয়া মনে করে। সুতরাং বিজয়ার প্রশ্নে তাহার অন্তরে এক প্রকার লজ্জার আবির্ভাব হইল। সে দাঁড়াইয়া অন্যদিকে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিল। বিজয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে তাহার মনে ক্লেশ হইতেছে।

বিজয়া। তুমি কি ক্লেশ পাইলে? আমাকে পর ভেব না; তুমি ত আমাদের বাড়ীর ছেলে; আমি অনেকদিন তোমাদের খবর জানি না বলেই জিজ্ঞাসা করেছি।

গোবিন্দ। অতি কষ্টে চলে।

বিজয়া। তোমার বাবার সেই কাসির ব্যায়রাম কি এখনও আছে?

গোবিন্দ। হাঁ, আছে।

বিজয়া। ভবিষ্যতে তোমার উপরই তাঁদের প্রধান নির্ভর?

গোবিন্দ। হাঁ, তা বৈ কি?

বিজয়া। তুমি কেবল সংস্কৃত পড়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিতি কাজের দ্বারা কি নিজের অবস্থার উন্নতি করতে পারবে?

গোবিন্দ। যেরূপ দিন কাল পড়েছে, তাতে সে আশা অল্প। সেই জন্যেই আমি রাত্রে ভবেশের নিকট একটু একটু ইংরাজী পড়তে আরম্ভ করেছি এবং বাঙ্গালাতে অঙ্ক ভূগোল প্রভৃতি শিখেছি।

বিজয়া। ওরূপ লোকের হাতে পায়ে ধরে এক আধটু ইংরাজী পড়ে কি বেশী শিখতে পারবে?

গোবিন্দ। যত দূর হয়; অন্য উপায় ত নাই।

বিজয়া। তুমি কেন কলকেতায় গিয়ে থাকবার চেষ্টা কর না?

গোবিন্দ। বাবা একে অতি ভাল মানুষ, তাতে সর্ব্বদা পীড়িত; তিনি যে

গিয়ে কোন বন্দোবস্ত কর্‌তে পারেন, তার সম্ভাবনা নাই। কে যোগাড় কর্‌বে?

বিজয়া। আচ্ছা, তোমার কল্‌কেতায় থাক্‌বার সুবিধা যদি কর্‌তে পারি, তা হলে কি তুমি কল্‌কেতায় যেতে পার?

কলিকাতায় যাইবার কথা শুনিয়া গোবিন্দের মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে কলিকাতার সংস্কৃত কালেজে গিয়া পড়িবে, এই তাহার মনের বড় সাধ; এই তাহার প্রাণের অনেক দিনের পোষিত আকাঙ্ক্ষা; এই তাহার বহুদিনের জাগ্রতাবস্থার স্বপ্ন। কিন্তু সেরূপ যোগাযোগ হওয়া দুরূহ বোধে সে বাসনা হৃদয়ে এক প্রকার চাপিয়া রাখিয়াছে। বিশেষ সংস্কৃত কালেজে বেতন দিবার নিয়ম হইয়াছে শুনিয়া আরও দমিয়া গিয়াছে। কোথায় বা থাকে, কে বা খাইতে দেয়, কে বা বেতন দেয়! পিতা পীড়িত ও দীনদরিদ্র; তিনি যে গিয়া যোগাড় করিয়া দিবেন, তাহা সম্ভব নয়। সে নিজে অতিশয় লাজুক; কাহাকেও যে কিছু বলিবে, তাহাও পারে না। সুতরাং সে বিষয়ে একপ্রকার নিরাশ। বিজয়ার প্রস্তাব শুনিয়া অন্য লোক হইলে লম্ফ দিয়া উঠিত, কত কথা বলিত, কিন্তু সে ধীরভাবে উত্তর করিল;—"তা হলে ত ভালই হয়।"

বিজয়া। তুমি কোন্ স্কুলে পড়্‌তে চাও?

গোবিন্দ। সংস্কৃত কালেজে।

বিজয়া। সেখানে কি ইংরাজী পড়ায়?

গোবিন্দ। হাঁ, এখন পড়ায়। আর বিশেষ আমি সংস্কৃত অনেকটা পড়েছি, অন্য স্কুলে ভর্তি হলে সে সব বৃথা যাবে।

বিজয়া। আমি যদি সুবিধা কর্‌তে পারি, তোমাকে বল্‌বো।

গোবিন্দ যাইতে প্রস্তুত; বিজয়া বারণ করিয়া বলিলেন;—"একটু দাঁড়াও, আমি আস্‌ছি।" গোবিন্দ দুই এক মিনিট অপেক্ষা না করিতে করিতে বিজয়া আবার আসিলেন। আসিয়া বলিলেন,—"আমি তোমাকে একটা অনুরোধ কর্‌তে যাচ্চি। তুমি অনুরোধ রাখবে ত?"

গোবিন্দ। কিরূপ অনুরোধ না জান্‌লে কিরূপে বল্‌বো?

বিজয়া। বিশেষ কঠিন অনুরোধ নয়। কথাটা কি জান, আমি তোমাকে পাঁচটী টাকা দিচ্চি, আজ সন্ধ্যার সময় গিয়ে গোপনে তোমার মায়ের হাতে দিয়ে এস।

এই বলিয়া পাঁচটী টাকা অঞ্চল হইতে বাহির করিলেন। গোবিন্দ অতিশয় লজ্জিত হইয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিজয়া। তুমি মনে করো না যে আমি দান কর্‌ছি। আমার দান কর্‌বার মত অবস্থা নয়। আমার এখানে আসা অবধি এক মাসের অধিক কাল তুমি বিন্দুকে পড়াচ্চ; আমার শক্তি থাক্‌লে তোমাকে আরও অধিক দেওয়া উচিত ছিল। ইহা তোমার পরিশ্রমের সামান্য পারিতোষিক মাত্র জান্‌বে। না নিলে মনে কর্‌ব যে কিরূপ সদ্ভাবে দিচ্চি, তুমি তা বুঝ্‌তেই পার্‌লে না।

শেষোক্ত কথাগুলিতে গোবিন্দ আর না লইয়া থাকিতে পারিল না।

বিজয়া। আমি ত তোমাকে বিন্দুকে পড়াতে বলি নাই; তুমি যে আপনা হতে পড়াও, ইহার কারণ কি?

গোবিন্দ। আপনার ঐ মেয়েটী বড় বুদ্ধিমতী; ওর সঙ্গে কথা কইলে আনন্দ হয়; একদিন কথায় কথায় বল্‌লে কল্‌কেতায় ওর পড়াবার মাষ্টার ছিল,

এখানে কেউ নাই; তাই আমি বলেছি,—আচ্ছা আমি তোমাকে পড়া বলে দেব।

বিজয়া। তুমি যেমন ছেলে তার মত কাজই করেছ; আচ্ছা তুমি যেমন পড়াচ্ছ তেমনি পড়াও, আমি মাসে তোমাকে পাঁচ টাকা করে দেব।

গোবিন্দ। (সলজ্জভাবে) না, আমি টাকা নেব না।

বিজয়া। সে বিষয়ে পরে দেখা যাবে! বিন্দুকে কেমন দেখ্‌ছ?

গোবিন্দ। ওর স্বভাব চরিত্র বড় ভাল; সচরাচর এমন মেয়ে দেখা যায় না; কেবল দোষের মধ্যে একটু একগুঁয়ে।

বিজয়া। ওতেই ওকে খেয়েছে; ওটা ওদের বংশের দোষ; তিনি বড় একগুঁয়ে লোক ছিলেন; ইন্দুও একগুঁয়ে।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে একজন ছাত্র গোবিন্দকে ডাকিতে আসিল। গোবিন্দ তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। বিজয়া কথা শুনিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলেন।

এইস্থলে গোবিন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। গোবিন্দ ঐ নশিপুর গ্রামের রামনিধি চাটুয্যের জ্যেষ্ঠ সন্তান। রামনিধি কোথা হইতে যে সে গ্রামে আসিয়াছিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এইরূপ শুনা যায়, তিনি দক্ষিণ দেশের লোক। পূর্বদেশে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া যাইবার সময় কি সূত্রে নশিপুরে আসিয়া অনেকদিন থাকিয়া যান। সেই সময়ে নশিপুরের হরিহর চক্রবর্তীর একটী কন্যার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। দিন স্থির, গাত্রে হরিদ্রা পর্যন্ত হইয়া গেল, তারপর কি জানি কি কারণে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষে বিবাদ হইয়া বিবাহের দিন বর আসিল না। তখন মহাবিপদ! কন্যাকর্তা অনন্যোপায় হইয়া নিদ্রিত রামনিধিকে তুলিয়া আনিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তখন রামনিধির বয়ঃক্রম ৩০।৩৫ এর কম হইবে না। রামনিধি সে বিবাহে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু শুনে কে? সকল বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া বিবাহ হইয়া গেল। কিছুদিন লোকে ইহা লইয়া গোলমাল করিল; কেহ বলিল, রামনিধি ব্রাহ্মণ নয়; কেহ বলিল, ভাট বামন; এমন কি এই কারণে কয়েক মাস হরিহর চক্রবর্তীকে একঘরে হইয়া থাকিতে হইল। কিন্তু শেষে গোলমাল থামিয়া গেল। তদবধি রামনিধি নশিপুরেই বাঁধা পড়িলেন। শ্বশুরের প্রদত্ত কয়েক বিঘা ভূমি ও গ্রামের জমিদার বাবুদের বাড়ীতে পূজারির কাজ করা ভিন্ন তাঁহার অন্য সম্বল নাই। এখন তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা বলিলে হয়। ব্রাহ্মণ নিরীহ ভালমানুষ; মুখে কথাটী নাই; বর্ণ-জ্ঞান-বিহীন, নিজের নামটীও স্বাক্ষর করিতে পারেন না; লোকের দ্বারে ভিক্ষা করার অভ্যাস নাই। সেই কয়েক বিঘা ভূমি ও ঠাকুরপূজা হইতে যাহা কিছু পান, তদ্দ্বারা অতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ইহার উপরে আবার তাঁহার কাসের পীড়া, মধ্যে মধ্যে হাঁফ কাস বাড়িয়া সকল কর্মের বাহির হইয়া পড়েন। গোবিন্দ এই ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত। তাহার বয়ঃক্রম ১৮ কি ১৯ বৎসর হইবে, কিন্তু তাহার দেহ এরূপ সুস্থ ও সবল যে দেখিলে ২৩ কি ২৪ বৎসর বলিয়া বোধ হয়। দেহে অপরিমিত বল থাকাতে গোবিন্দ সকল প্রকার দৈহিকশ্রমসাধ্য কার্যে সর্বদাই অগ্রসর। কোনও স্থানে যাইতে, আসিতে, মোট বহিতে ও অপরাপর শ্রমসাধ্য কাজ করিতে, সে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য; এজন্য সে সকলের প্রিয়।

ওদিকে কালীবাড়ীতে কথকতা বসিয়াছে। কথক ঠাকুর যথাসময়ে বেদীর

উপরে সমাসীন হইয়াছেন। তাঁহার পরিধানে অতি শুভ্র পট্টবস্ত্র; সুস্থ ও সবল দেহটী সুপরিষ্কৃত ও শুভ্র চাদরখানির দ্বারা অর্ধাবৃত; চাদরের ভিতর হইতে গৌরকান্তি ও তদুপরি সুমার্জিত উপবীতটী দৃষ্ট হইতেছে; কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা; ললাটদেশ শ্বেতচন্দনের দ্বারা প্রলিপ্ত; উত্তমাঙ্গ পুষ্পমালার দ্বারা পরিবেষ্টিত; তাহার দুইটী অংশ দুই কর্ণমূলের নিকট দুলিতেছে; তাঁহার আকৃতি সৌম্য; চক্ষুর্দ্বয় বিশাল ও দৃষ্টি মাধুর্যব্যঞ্জক। ইনি দেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ কথক; নাম গঙ্গাধর শিরোমণি। অপরাপর কথকতা ব্যবসায়িগণের অধিকাংশই যেমন সংস্কৃতানভিজ্ঞ, কোনও রূপে কথকতা শিক্ষা করিয়া কাজ চালাইয়া থাকেন, শিরোমণি মহাশয় সেরূপ নহেন; ইনি সংস্কৃতভাষাব্যুৎপন্ন ব্যক্তি, একজন অদ্বিতীয় পৌরাণিক, এবং বোধ হয় অনুরাগবশতঃই কথকতা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। ইঁহার আকৃতি যেমন কমনীয়, কণ্ঠও তেমনি সুমিষ্ট; কথকতার মধ্যে যে সকল গান গাইয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশ ইঁহার স্বরচিত। শিরোমণি মহাশয়ের কথকতা শিক্ষিত বিদ্যা নহে; তিনি একজন উপস্থিতবক্তা ও সুরসিক লোক। একবারকার একটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি; তাহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কিরূপ। একবার কলিকাতার কোন ধনীর ভবনে তিনি কথা কহিতেছেন। লক্ষ্মণের শক্তিশেলের বিষয়ে কথা হইতেছিল। লক্ষ্মণ শক্তিশেলের আঘাতে অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন; তখন রামচন্দ্র বানরদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ হে কপিগণ! তোমাদের মধ্যে ত সকল কাজের উপযুক্ত বানর আছে; গাছ, পাথর বহিবার বানর, সেতু বাঁধিবার জন্য ইঞ্জিনীয়ার বানর, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর বানর দেখি; বৈদ্য বানর কি কেহ নাই?" যখন কথাটা এইস্থলে পেঁাছিয়াছে, তখন কলুটোলার বৈদ্য-জাতীয় সেনবংশজ একজন বড়লোক আসরে প্রবেশ করিতেছেন। ঐ বড়লোকটীর সহিত শিরোমণি মহাশয়ের আত্মীয়তা ছিল; তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কথক বলিয়া উঠিলেন;—"এই যে বৈদ্য বানর উপস্থিত!" অমনি সভামধ্যে একটা হাস্যের রোল পড়িয়া গেল। আজ কিন্তু তিনি রসিকতা করিতেছেন না। আজ আর এক রসের অবতারণা করিয়াছেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের বিশেষ আদেশক্রমে তিনি দক্ষ-যজ্ঞ, সতীর প্রাণত্যাগ, হিমালয়ে সতীর জন্ম, সতীর তপস্যা ও হরের সহিত পুনর্মিলন, এই পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কথা কহিতেছেন। অদ্য হরকে পাইবার জন্য সতীর তপস্যা বিষয়ে কথা হইতেছে। শিরোমণি মহাশয়ের প্রতিভাগুণে এমনি ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে যে, সকলেই স্পন্দ-হীন। বিশেষতঃ গিরিরাজ-পত্নী মেনকা ও উমার কথোপকথনের স্থলটী এমন সুন্দর হইয়াছে যে, সে সময়ে কেহই চক্ষুর্দ্বয়কে শুষ্ক রাখিতে পারেন নাই। তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা গেল যে, ভাবাবেশে তাঁহার মুখমণ্ডল দীপ্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে এবং দুই চক্ষে অজ্ঞাতসারে জলধারা বহিতেছে। কালীর দালানে চিকের অন্তরালে মহিলাগণ বসিয়াছেন। সেখানে বিজয়ার চক্ষে জলধারা বহিতেছে। শিরোমণি মহাশয় মূল বিষয় অবলম্বন করিয়া পাতিব্রত্যধর্মের মহিমা, দেবদ্বিজে ভক্তি, বৈরাগ্য, তপস্যা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের আবশ্যকতা. প্রভৃতি অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন; এবং প্রত্যেকটীই পৌরাণিক আখ্যায়িকার সাহায্যে এরূপ উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত করিয়াছেন যে, ঐ সকল উপদেশ সকলের হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। কথার মধ্যে যে

কতবার সভাস্থ ব্যক্তিদিগের মুখ হইতে "ধন্য ধন্য" "সাধু সাধু" শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

ক্রমে বিপ্রগণের সায়ংসন্ধ্যার সময় উপস্থিত হওয়াতে কথা ভাঙিগয়া গেল। সকলে কথকের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তর্কভূষণ মহাশয় সায়ংসন্ধ্যা করিবার জন্য কালীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন; মহিলাগণ স্ব স্ব গৃহে চলিলেন।

আজ দুই ব্যক্তি দুই ভাবে শয্যাতে যাইতেছেন। মানবের হিতার্থে কোনও সদনুষ্ঠান করিলে লোকে যে প্রকার বিমল আত্ম-প্রসাদ অনুভব করে, তর্কভূষণ মহাশয় সেই আত্ম-প্রসাদ লইয়া শয়ন করিতেছেন। এতদ্বারা অনেকের ধর্মে মতি বাড়িবে, এই চিন্তাতে তাঁহার প্রাণে এক প্রকার আনন্দের সঞ্চার হইতেছে। তিনি মনে মনে সংকল্প করিতেছেন যে, প্রতিবেশিগণের হিতার্থে প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে বাড়ীতে এইরূপ কথা দিবেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ধর্মবিশ্বাসও অদ্যকার কথাতে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার অভীষ্ট দেবতা হর-পার্বতীকে যেন চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছেন। অন্য দিন তিনি কেবল মাত্র 'দুর্গে দুর্গতিহারিণী!' বলিয়া ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া শয়ন করেন, আজ সেই দুর্গার সান্নিধ্য অনুভব করিয়া তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইতেছে। এইভাবে তিনি আজ শয্যাতে যাইতেছেন।

বিজয়ার ভাব অন্য প্রকার। অন্যান্য দিন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া শয্যাতে যাইবামাত্র তাঁহার নিদ্রা হয়। অদ্য মনের উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রা আসিতেছে না। নানাপ্রকার চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হইতেছে। তিনি ত পূর্বাবধিই তপস্বিনী হইয়াছিলেন; আহারে, বিহারে, বিষয়-সুখভোগে ঘোর ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, অদ্যকার কথাতে কঠোরতর তপস্যার বাসনা তাঁহার অন্তরে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তিনি মৃত পতির গুণাবলী যতই স্মরণ করিতেছেন, ততই আপনাকে অতি হীন বলিয়া অনুভব করিতেছেন, এবং পরকালে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার উপায়স্বরূপ কঠোর তপস্যা আবশ্যক বলিয়া অনুভব করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, সেই যে তাঁহার পতি মৃত্যুদিনে শেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন—"ঈশ্বরের চরণাশ্রয় করিয়া থাকিও," বৈধব্যদশাপ্রাপ্তির দিন হইতে সেই কথাটি মনের মধ্যে ঘুরিতেছে: আজ আবার বিশেষভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে। বিজয়া মনে মনে আপনাকে প্রশ্ন করিতেছেন—ঈশ্বরের চরণাশ্রয় করা কাহাকে বলে? দাদা কি ঈশ্বরের চরণাশ্রয় করেন নাই? উঁহার মনে ত বেশ শান্তি দেখিতে পাই, সে শান্তি কেন আমার মনে আসে না? ওরূপ বিশ্বাসের দৃঢ়তা আমার কেন হয় না? আমি কেন অন্তরে কিছুই ধরিতে পারি না? তিনি যে বলিতেন, দেবদেবীর উপাসনা অজ্ঞ ও দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য, আমার দাদা কি তবে অজ্ঞ ও দুর্বল? যে সকল কথা আজ শুনিলাম, এ সকল কি কবির কল্পনা? তাহাই যদি হয়, কেন তিনি আমাকে সত্য উপাসনা শিখাইলেন না? তাহা হইলে যে আজ কিছু ধরিতে পাইতাম ও প্রাণে শান্তিলাভ করিতাম। ফল কথা এই, নন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখনকার ব্রাহ্মসমাজের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তিনি বিজয়ার ষোল বৎসর বয়স হইতেই তাঁহাকে নিজ ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; নিজে তাঁহাকে উত্তমরূপে বাঙ্গালা পড়িতে শিখাইয়া মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের "বিচারের চূর্ণক" "পৌত্তলিক প্রবোধ" প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের

গ্রন্থ সকল পড়াইয়াছেন; প্রতি মাসে রীতিমত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" পড়িতে দিয়াছেন; তাহাতে যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বাহির হইত, তাহা অবলম্বন করিয়া মুখে মুখে তৎসংক্রান্ত আরও অনেক কথা শিখাইয়াছেন; ভূচিত্র আনিয়া এই ধরাটা কত বড়, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং সংক্ষেপে ভূগোলের স্থূল স্থূল বিবরণগুলি শিখাইয়াছেন; বিজয়ার মনটাকে এইরূপে প্রশস্ত ও উদার করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মনের যে কোনও সংস্কারকে—ভ্রান্ত সংস্কার বোধ হইয়াছে তাহাই ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন; সকলি ভাঙ্গিয়াছেন; কেবল ভাঙ্গেন নাই, ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাসটা, বরং তাহা দৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্না রমণীর পক্ষে দশ বার বৎসরকাল এরূপ শিক্ষাধীনে থাকিলে যাহা হয়, বিজয়ার পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছে। পাছে এই মনস্বিনী নারীকে বুঝিতে কেহ ভ্রমে পড়েন, সেই জন্য এত কথা বলা।

যাহা হউক, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজয়াকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার ফল এই হইল যে, বিজয়া মনে মনে দেশপ্রচলিত পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি আস্থাবিহীন হইলেন; ক্রমে ধর্মভাব যেন তাঁহার অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তৎপরে তিনি কালের স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া যাইতেন; কৌলিক আচার সমুদায় পালন করিতেন; অথচ হৃদয়ের কোনও দৃঢ় প্রতীতি রাখিতেন না। পতি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার কাজ ছিল, ভুলাইয়া রাখিবার মত বিষয় ছিল। সুতরাং হৃদয়ে শূন্যতা অনুভব করিতে পারেন নাই। অকালে পতি-বিয়োগ হওয়াতে তাঁহার বোধ হইল যেন হঠাৎ নৌকা ডুবিয়া জলে ভাসিলেন; তৎপরে হাত বাড়াইয়া ধরিতে যান, ধরিবার মত কিছুই পান না। এখনও তিনি ঐ প্রকার অবস্থাতে আছেন। তবে স্বীয় পতির অনুসরণ করিয়া চিরদিন লৌকিক ও কৌলিক ক্রিয়াকলাপে যোগ দিয়া আসিতেছেন; এবং এখনও দিবার সংকল্প রহিয়াছে। সনাতন রীতিনীতিবিরুদ্ধ কোনও আচরণ কখনও করেন নাই; করিবার ইচ্ছাও নাই। তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার ভিতরকার এত কথা জানেন না। কিরূপেই বা জানিবেন? বিজয়া দুই একদিনের জন্য পিত্রালয়ে যখন আসিতেন, তখন সাবধানে আপনার মনের ভাব গোপন রাখিতেন ও সকল ক্রিয়া-কলাপে যোগ দিতেন। এমন কি তিনি যে এত লেখাপড়া শিখিয়াছেন, তাহাও তর্কভূষণ মহাশয় অগ্রে তত জানিতেন না।

সে যাহা হউক, বিজয়া প্রায় সমস্ত রজনী অনিদ্রাতে ও বহু চিন্তাতে যাপন করিয়া এই প্রতিজ্ঞা লইয়া উঠিলেন, যে, আরো কঠোর তপস্যাতে আপনাকে নিক্ষেপ করিবেন। তদনুসারে ইহার দুইদিন পরেই সেই সুন্দর আনিতম্বলম্বিত ঘন নীল কেশরাশি কাটিয়া ছোট করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে গৃহিণীর মনে এতই উত্তেজনা হইল যে, পাঁচ সাত দিন তাঁহার মুখে আর অন্য কথা ছিল না;—যে আসে সকলকেই বলেন—"বিজয়া অমন চুলগুলো কি করে কাট্‌লো দেখ।" অবশেষে একদিন তর্কভূষণ মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কেটেছে তাতে কি হয়েছে? বেশই ত করেছে; ও যেমন বংশের মেয়ে, সেই রকম কাজ করেছে; ওই ত বৈধব্যাচার।" তদবধি গৃহিণী নিরস্ত হইলেন।

যেমন একটা জাহাজ চলিয়া গেলে নদীর জলরাশি অনেকক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলিত থাকে, এবং নদীপার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র তরণীগুলির কম্পনে সেই আন্দোলন অনুভূত হয়, সেইরূপ গৃহস্থের গৃহে কোন একটা বৃহৎ ঘটনা ঘটিলে তাহার কম্পন অনেক দিন থাকে; এবং অনেক বিষয়ে সেই কম্পন লক্ষ্য করিতে পারা যায়। ১০ই বৈশাখ ভুবনেশ্বরীর বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ জ্যৈষ্ঠ অবসান-প্রায়, তথাপি তাহার কম্পন আজিও চলিয়াছে। আজিও তন্নিবন্ধন লোকজনের বিদায় আদায় চলিয়াছে। বাদ্যকর, মালাকার, প্রভৃতি বিদায় হইতেছে। স্বগ্রামের ও চতুষ্পার্শ্বের গ্রামের দরিদ্র লোক, যাহারা এই সময়ে কিছু কিছু পাইবার আশা করে, তাহারাও যথেষ্ট পাইতেছে। তর্কভূষণ মহাশয় মনের সাধ মিটাইয়া এই সকল দরিদ্র লোককে প্রীত করিয়া দিতেছেন। তাঁহার নিজ প্রজাগণ এই বিবাহোপলক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ত্রুটী করে নাই। তাহারাও বিবাহোৎসবান্তে তাঁহার পিতৃসম হস্ত হইতে আনন্দ ও আশীর্বাদের চিহ্নস্বরূপ নানাবিধ উপহার প্রাপ্ত হইতেছে। কয়েকজন প্রজা সেই বিবাহের সময়ে আসিয়া এখনও পড়িয়া রহিয়াছে, তত্ত্ব প্রভৃতি বহন করিতেছে, ও গৃহের অপরাপর কার্য করিতেছে। কেবল তাহা নহে। গ্রামে একদল নিষ্কর্মা যুবক আছে; তাহারা বৎসরের মধ্যে একটা বারইয়ারি করিয়া থাকে। গ্রামের প্রকাশ্য স্থানে একটা আটচালা বাঁধিয়া একটা ঠাকুর তুলিয়া, কয়েকদিন যাত্রা গান প্রভৃতির আয়োজন করিয়া, নিজেরা আমোদ করে ও গ্রামবাসীদিগকে আমোদ যোগায়। গ্রামের লোক এ কার্যে আনন্দের সহিত সাহায্য করিয়া থাকে। কারণ, ইহা ভিন্ন সম্বৎসরের মধ্যে গ্রামের সামান্য লোকের আমোদ প্রমোদ করিবার অন্য উপায় নাই। গ্রামের মধ্যে বিবাহ কি শ্রাদ্ধ কি অন্য কোন অনুষ্ঠান হইলে ঐ যুবকদল কিঞ্চিৎ পয়সা আদায় করিতে ছাড়ে না। সকলের হাত ছাড়ান যায়, তাহাদের হাত ছাড়ান দুষ্কর। তাহারা এইরূপে যে কিছু আদায় করে, তাহা সম্বৎসরকাল কাহারও হস্তে জমাইয়া রাখে; তৎপরে বারইয়ারি উৎসবের সময় ব্যয় করে। তাহারা তর্কভূষণ মহাশয়কেও ধরিয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিবার প্রয়োজন হয় নাই। তিনি নিজে গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইলেও যুবকদিগের ঐ সাম্বৎসরিক পূজার উৎসবের পক্ষপাতী; ছেলেরা, বিশেষতঃ গ্রামের সাধারণ লোকে, বৎসরে দুই চারিদিন আমোদ প্রমোদ করে, ইহা মন্দ নয়, মোটামুটি তাঁহার এই প্রকার একটা ধারণা আছে। ছেলেরা আসিয়া ধরাতে তিনি বলিয়াছেন—"ওহে বাপু! আমাকে পীড়াপীড়ি কর্‌বার প্রয়োজন নাই। আমার বাগানের বাঁশ ঝাড় হতে তোমাদের আটচালা বাঁধিবার বাঁশ লইও এবং তদ্ভিন্ন আমি এককালীন দশটী টাকা দিতেছি, লইয়া যাও।" যুবকদল অতি সন্তুষ্ট হইয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের বদান্যতার প্রশংসা করিতে করিতে গিয়াছে।

ঐ যুবকদল বিদায় হইলেই আর এক যুবকদল আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রযত্নে গ্রামের ইংরাজী স্কুলটী স্থাপিত হইয়াছে ও চলিতেছে। ইঁহারাও বারইয়ারিদলের অনুকরণ করিয়া বিবাহাদি উৎসবে কিছু কিছু অর্থ আদায় করিয়া থাকেন। ইঁহারা উপস্থিত হইলে তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন—"অবশ্য তোমাদের কিছু প্রাপ্তির আশা কর্‌বার অধিকার আছে; বারইয়ারির জন্য ১০৲ দশ টাকা

দিয়াছি, আর তোমরা ত দেশের একটা উপকার কর্‌বার জন্য লেগেছ, তোমাদের সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য। তোমাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তোমরা দেশের হিতৈষী বন্ধু।" এই বলিয়া তাহাদিগকে ২৫৲ পঁচিশ টাকা দিয়াছেন। এইরূপ ভুবনেশ্বরীর বিবাহের সময় হইতে যে ব্যয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহার শেষ আর ত্বরায় হইতেছে না। ইহার উপরে কথক ঠাকুরের বিদায়ের ব্যয়; তৎপরে এই জ্যৈষ্ঠের শেষেই জামাই-ষষ্ঠীর সময় প্রথম দুই জামাতাকে আনান হইয়াছে; তৃতীয়, কার্যানুরোধে আসিতে পারেন নাই। তাঁহার ভবনে এবং নব জামাতা প্রসিদ্ধ উলোগ্রামের রামরতন মুখুয্যে মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথের ভবনে, জামাই-ষষ্ঠীর তত্ত্ব প্রেরিত হইয়াছে। নবজামাতার তত্ত্ব এরূপ প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে যে, দেখিয়া রামরতন মুখুয্যে মহাশয়ের প্রতিবেশবাসিনী গৃহিণীগণ ধন্য ধন্য করিয়াছেন। এই সকল কারণে তর্কভূষণ মহাশয়ের ব্যয় আর থামিতেছে না।

ভুবনেশ্বরীর বিবাহের সময় হইতে যে ছাত্রদের অনধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এখনও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। গোলেমালে দিন কাটিয়া যাইতেছে। জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্র দুইদিন হইল কলিকাতায় গিয়াছেন। অদ্য কথা বন্ধ আছে। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়। বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার স্বস্থানে আসীন; সমাগত কতিপয় প্রতিবেশীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন। শঙ্কর বাহিরের দাবাতে বসিয়া কয়েকজন চাষা লোকের নিকট তাহাদের একটী গাভীর অপমৃত্যুর বিবরণ শুনিতেছেন; তাহারা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইতে আসিয়াছে। এমন সময়ে বাহিরে অদূরে ভয়ানক কোলাহল শ্রুত হইল। সকলের চিত্ত স্বভাবতঃ সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তর্কভূষণ মহাশয় কথাবার্তার মধ্যে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন;—"ওকি গোলযোগ?" উপস্থিত প্রতিবেশীর মধ্যে একজন বলিলেন,—"বোধ হয় ছেলেরা খেলা কর্‌ছে।" আবার সকলে একটু অন্যমনস্ক হইলেন। কিন্তু গোলযোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তর্কভূষণ মহাশয় একজনকে দ্বারের নিকট গিয়া শুনিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি দ্বারে গিয়া বলিল,—পূর্বদিকে কোথায় ঘরে আগুন লেগেছে। শুনিবামাত্র তর্কভূষণ মহাশয় শম্বুকটী হাতে করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং পরিধেয় বস্ত্র সংযত করিতে করিতে বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। তিনি যদি ব্যস্তসমস্ত হইয়া চলিলেন, তবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও চলিলেন; চাষা লোকগুলিও চলিল; উপস্থিত প্রতিবেশিগণ চলিলেন; ছাত্রগণ যে কয়জন ছিল, চলিল। তাঁহারা পথে গিয়া শুনিলেন, নাপ্তে বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, কয়েকখানি ঘরে আগুন লাগিয়াছে; ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; প্রবল বায়ুভরে সেই আগুন চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে; এবং গোবিন্দ একখানি প্রজ্বলিত গৃহের চালে উঠিয়া দা দিয়া চাল কাটিয়া নামাইবার চেষ্টা করিতেছে; তাহার চতুর্দিকে অগ্নি; মধ্যে মধ্যে ধূমে তাহার চক্ষুর্দ্বয় আবৃত হইয়া যাইতেছে; আর কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই জ্বালারাশি আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিবে; সকলে চারিদিক হইতে চীৎকার করিতেছে, "ও গোবিন্দ আর নয়, ও গোবিন্দ আর নয়; শীঘ্র নেমে পড়্; ওরে মলি মলি"।

নিজ ছাত্রের এই পরোপকার-প্রবৃত্তি ও সাহস দর্শনে এই ঘোর ব্যস্ততার মধ্যেও তর্কভূষণ মহাশয়ের মনে কিঞ্চিৎ আনন্দ হইল; কিন্তু তিনি বুঝিলেন

যে আর এক মুহূর্তও গোবিন্দের সে চালের উপর থাকা কর্তব্য নয়। ডাকিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ নামিয়া পড়।" গুরুর আদেশমাত্র গোবিন্দ লম্ফ দিয়া নামিয়া পড়িল।

যে নিষ্কর্মা বারইয়ারিদলের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি, তাহারা কোথা হইতে সদলে আসিয়া উপস্থিত। সকলে অবশিষ্ট ঘরগুলি বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিরূপে আগুন লাগিল, কার দোষে আগুন লাগিল, এসকল প্রশ্ন করিবার সময় নাই; সকলেই বিপন্নিবারণের জন্য ব্যস্ত। তর্কভূষণ মহাশয় চালে উঠিলেন না, জল বহিলেন না, বিশেষ একটা কিছু করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার পরামর্শে, ব্যস্ততায় ও উৎসাহদানে, সে ক্ষেত্রে কি এক অপূর্ব ভাবের আবির্ভাব হইল! সকলে প্রাণকে প্রাণ জ্ঞান না করিয়া অগ্নি নির্বাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু চেষ্টা করিলে কি হইবে? একে জ্যৈষ্ঠ মাস, সমুদায় জলাশয় শুষ্ক; কিয়দ্দূরে চাটুয্যেদের পুকুরে একটু জল আছে বটে, কিন্তু কলসি কলসি করিতে কলসি আসে না; কলসি আনিতে দশজন ছুটিতেছে; এক জনের হাতের কলসি ধরিয়া তিন জনে টানাটানি করিতেছে; সকলেই চীৎকার করিতেছে, সুতরাং কাহারও কথা কেহ শুনিতে পায় না; কেহ বা জল দিতে দিতে কলসি ফেলিয়া জিনিষপত্র বাঁচাইতে ছুটিতেছে; কেহ বা জিনিষপত্র টানিতে টানিতে ছুটিয়া আসিয়া কলসি ধরিতেছে। ওদিকে সময় বুঝিয়া বায়ু আসিয়া দেখা দিয়াছে; জ্বালারাশি সর্বভূক বৈশ্বানরের লোলায়মান জিহ্বার ন্যায় আকাশ-দেহ লেহন করিয়া চতুর্দিকে ধাবিত হইতেছে; সুতরাং তর্কভূষণ মহাশয় যে ঘরগুলি বাঁচাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা বাঁচাইতে পারিলেন না।

এই ব্যস্ততার মধ্যে দুইটী শিশু সন্তান সঙ্গে একটী বিধবা নারী কাঁদিয়া ছুটাছুটি করিতেছে; "ওগো বাবা! আমার কি হবে গো! ওগো এই হতভাগিনীর যে মাথা রাখ্‌বার জায়গা নেই গো! ওগো কি হলো গো!" তর্কভূষণ মহাশয় ঐ বিধবাকে চিনিতেন। দুই বৎসর হইল সেই হতভাগিনী পতিহীনা হইয়া, দুইটী শিশু সন্তান লইয়া, ঐ নাপিত বাড়ীর পার্শ্বে একখানি কুঁড়ে ঘরে পড়িয়া থাকিত; এবং ধান ভানিয়া, গৃহস্থের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্মে খাটিয়া ও পাট কাটিয়া দড়ি বিক্রয় করিয়া, অতিকষ্টে আপনার ও শিশু দুইটীর ভরণপোষণ নির্বাহ করিত। ভুবনেশ্বরীর বিবাহের সময় তর্কভূষণ মহাশয় তাহাকে ও তাহার সন্তানদিগকে এক একখানি নূতন বস্ত্র ও পাঁচটী টাকা দিয়াছিলেন। ঐ সমুদায় বস্ত্র ও টাকা তাহার ঘরের একটী আমকাষ্ঠের সিন্দুকে ছিল। ঘরে আগুন লাগিয়া তাহার সর্বস্ব গিয়াছে; তাই সে পাগলের ন্যায় কাঁদিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। সে নিকটে আসিলে তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, "আহা বাছা! তোর ঘরখানি গেল।" এই কথা বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল; শেষে বলিলেন, "তুই কাঁদিস্‌নে; তোর ঘর আবার হবে।" সে কি তা শোনে, সে কাঁদিয়া আর এক দিকে ছুটিয়া গেল।

অবশেষে আগুন নির্বাপিত হইল। তখন কাহার কি গিয়াছে, কেহ মারা পড়িয়াছে কিনা, গরু বাছুর কিছু মরিয়াছে কিনা, এই সকল অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। ক্রমে সায়ংসন্ধ্যার সময় উপস্থিত। তর্কভূষণ মহাশয় গৃহাভিমুখে প্রতি-নিবৃত্ত হইবার পূর্বে হরের মাকে ডাকিয়া বলিয়া আসিলেন—"তুই ছেলে দুটোকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে রাত্রে থাকিস্‌। তোর যা গেছে সে জন্যে ভাবিস্‌নে;

আমার বাঁশ ঝাড়ে বাঁশ আছে, গাদাতে খড় আছে; তোর যেমন ঘর ছিল তেমনি হবে।”

এদিকে গোবিন্দ কিঞ্চিৎ পূর্বেই বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আগুন লাগিয়া তাহার দুই খানা পা একেবারে ঝলসিয়া গিয়াছে। সে বাহির বাড়ীতে আসিয়া নিজের শয়ন-ঘরে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, কাহাকেও কিছু বলে নাই। কিন্তু বিজয়া বাড়ীর ভিতর হইতে কেমন করিয়া সে সংবাদ পাইয়াছেন। তর্কভূষণ মহাশয় সদলে বাড়ীতে আসিয়া দেখেন, বাহিরের ঘরে বিজয়া, গৃহিণী, কালী, তারা প্রভৃতি গোবিন্দের শুশ্রূষাতে রত হইয়াছেন। কি একটা প্রলেপ দেওয়াতে জ্বালাটা একটু কমিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি সায়ংসন্ধ্যা করিতে কালীবাড়ীতে গেলেন। যাইবার পূর্বে ভৃত্যকে বলিয়া গেলেন, “হরের মার ঘর পুড়ে গিয়েছে; আজ রাত্রে কোথায় পড়ে থাক্‌বে; কাল প্রাতে খিড়কীর পথের ধারের ঘরের কাটকাট্‌রাগুলো বাহির করে ফেলে ঘরটা পরিষ্কার করে দিও; তার ঘর তৈয়ার হওয়া পর্যন্ত সে সেখানে থাক্‌বে।”

এদিকে গোবিন্দ একটু সুস্থ হইলেই বিজয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঘরে আগুন কি করে লাগ্‌লো?”

গোবিন্দ। নাপ্তেদের রান্না ঘরের চালে একটা দড়ি ঝুলান ছিল; রান্না খাওয়ার পর উনানে আগুন ছিল; একটী ছোট ছেলে কোন্‌ অবসরে রান্না ঘরে প্রবেশ করে, উনানের আগুনে একটী নারিকেল পাতা জ্বালাইয়া কেমন করে সেই দড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।

বিজয়া। তুমি তখন কোথায় ছিলে?

গোবিন্দ। আমি মার সঙ্গে দেখা করে বাড়ী হতে আস্‌ছিলাম।

বিজয়া। আগুনের ভিতরে গেলে কেন?

গোবিন্দ। আমি গোলমাল শুনে ছুটে এসে দেখ্‌লাম, একখান ঘর জ্বল্‌ছে, তাহা বাঁচবার কোনও উপায় নেই; পাশের পুকুরটাতে এক বিন্দুও জল নেই, সকলে চাটুয্যেদের পুকুর হতে জল আনতে ছুট্‌ছে; এদিকে বাতাসের জোরে আগুন ছড়িয়ে পড়্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর এক খানা ঘরে লাগ্‌লো; তখন সকলে বল্‌লে, সেই ঘরের চাল কেটে নামিয়ে দিতে পার্‌লে অন্য ঘরগুলো বাঁচে। দেখ্‌লাম সকলেই বলে, “ওঠনা” “চালটা কাটনা” কিন্তু কেউ ওঠে না। অবশেষে আর থাক্‌তে পারলাম না, নিজেই উঠ্‌লাম।

গৃহিণী। বাবা, আপনার প্রাণটা বাঁচিয়ে ত পরের উপকার কর্‌তে হয়।

ক্রমে মহিলাগণ একে একে অন্তঃপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বিজয়া অনেকক্ষণ গোবিন্দের নিকট বসিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ অতি লাজুক ছেলে; সে তাঁহাকে বারবার অন্তঃপুরে যাইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি গেলেন না; অবশেষে মৌনী হইয়া পড়িয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বিজয়া গোবিন্দকে নিদ্রিত দেখিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয়ের সায়ংসন্ধ্যা ও জপ সমাপন করিতে প্রায় দেড়ঘণ্টা দুইঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। তদন্তে তিনি বাহির বাড়ীতে আসিয়া মধু চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হরের মা ছেলে দুটি নিয়ে এসেছে কি?” যখন শুনিলেন আসিয়াছে, তখন বলিলেন, “বিজয়াকে গিয়ে বল যে তাদের যেন কষ্ট না হয়, ভাঁড়ার ঘরের রোয়াকে আজ রাত্রে তারা থাক্‌বে।” “যে আজ্ঞা” বলিয়া মধু সেই

আদেশ পালন করিতে গেল। তর্কভূষণ মহাশয়ও চণ্ডীমণ্ডপে নিজের স্থানে উঠিয়া সমাগত কতিপয় প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রতিবেশিগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তর্কভূষণ মহাশয় যথাসময়ে আহারাদি করিয়া সকাল সকাল গিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু অদ্য তাঁহার মন কিরূপ উত্তেজিত, কোন রূপেই নিদ্রা হইতেছে না। কেবল অগ্নিকাণ্ড ও হরের মার কথা মনে আসিতেছে। অনেকক্ষণ পরে নিদ্রা আসিল। কিন্তু গৃহী লোকের বিশ্রাম-সুখ সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের আয়ত্তাধীন নহে। কখন কোন্ ঘটনা ঘটে, তাহা কে বলিতে পারে? রাত্রি দুই প্রহর অতীত না হইতে কে একজন আসিয়া শঙ্করের ঘরের দ্বারে তাঁহাকে ডাকিতেছে। শঙ্কর প্রগাঢ় নিদ্রাতে আছেন; অনেক বার ডাকাডাকি করাতেও উত্তর দিতেছেন না। ইত্যবসরে বিজয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। শুনিলেন, গৌরীপতির শ্বশুরের গ্রামের কয়েকজন লোক বরযাত্র গিয়াছিল, তাহারা বিবাহান্তে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছে; সে দিন রাত্রে সেখানে থাকিবে। এই সকল কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে গৃহিণী ঠাকুরাণী দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন, এবং আপনার দ্বারে দাঁড়াইয়াই চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিজয়ি! কি রে, এত রাত্রে কে ডাকাডাকি করে?" এই চীৎকারে কর্তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার কর্ণে বিজয়ার এই কথাগুলি প্রবেশ করিল—"বৌ দিদি! কর কি? বড়দার ঘুম ভেঙ্গে যাবে; চেঁচাও কেন? কয়েকজন লোক এসেছে, যা করবার আমরাই কর্‌চি?" তর্কভূষণ মহাশয় বুঝিলেন, কয়েকজন অতিথি উপস্থিত। অমনি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। "কি বিজয়া! কে এসেছে?"

বিজয়া। সেজ কর্তার শ্বশুরের দেশ হতে পাঁচজন ভদ্রলোক বরযাত্র গিয়েছিলেন। তাঁরা ঘরে ফিরে যাচ্চেন। আজ রাত্রে এখানে থাক্‌বেন।

তর্কভূষণ। শঙ্করকে তোলো, আর সেজ বৌমাকে তোলো। তাঁর বাপের বাড়ীর লোক, তিনি উঠে আতিথ্য করুন। (ইতি মধ্যে শঙ্কর ও সেজ বৌ দুই-জনেই উঠিয়া বাহির হইয়াছেন।) ওঁদের খাওয়া দাওয়ার যোগাড় ত কর্‌তে হবে।

বিজয়া। ওঁরা বল্‌ছেন সন্ধ্যার সময় বাজারে জল খেয়ে এসেছেন, কেবল একটু শোবার বন্দোবস্ত হলেই হয়।

তর্ক। সে কাজটা তাঁরা ভাল করেন নাই। আস্‌ছেন ভদ্রলোকের বাড়ী; বাজার হতে খেয়ে এলেন কি করে? ও কথাই নয়; তুমি ভাঁড়ারে দেখ রান্নার কি কি যোগাড় হতে পারে; প্রাতে ওঁদের নিশ্চয় আহার হয় নাই; সমস্ত রাত্রি কি উপবাসে রাখা যেতে পারে?

বিজয়া। সকল আয়োজনই আছে, এখনি ডাল ভাত হতে পারে; কেবল মাছটা নেই।

তর্কভূষণ। সমস্ত দিন অনাহারের পর মাছের ঝোল ভাতটা হলেই ভাল হতো। মধো একবার পুকুরে জালটা ফেলে দেখুক না, যদি দৈবাৎ মাছ মিলে যায়।

শঙ্কর। না—বাবা! এ রাত্রে কি মাছ ধরা হতে পারে? ঐ ডাল ভাত হোক্।

তর্ক। তা ত আছেই; যদি মাছটা যুটে যায় মন্দ হয় না; তুমি মধোকে একবার ডাক না। আর আমি কি বাহিরে ভদ্রলোকগুলির কাছে যাব?

শঙ্কর। না বাবা! এ রাত্রে আর আপনাকে যেতে হবে না; আপনি শয়ন

করুন, যা করবার ছোটপিসী ও আমি করে নিচ্ছি।

বিজয়া। তাইত, কাজটাই বা এমন কি, দেখতে দেখতে দুটো উনান জেবলে সেজ বৌ ও আমি ওঁদেরকে খাইয়ে দিচ্ছি। দাদা! তুমি শোওগে!

পুত্র ও ভগিনীর তাড়াতে কর্তা আর বাহিরে যাইতে পারিলেন না, মধুর অপেক্ষা করিয়া রোয়াকে দণ্ডায়মান রহিলেন।

শঙ্কর। আমি মধোকে জাল ফেলতে বলছি, আপনি গিয়ে শয়ন করুন না।

ওদিকে গৃহিণী আসিয়া ঠেলিতেছেন,—"ওগো চলো, ঘরে চলো; সবে একটু ঘুময়েছিলে, ঘুমটা ভেঙ্গে গেল! আমার যেমন কিছু মনে থাকে না।"

তর্ক। (বিরক্তি-কর্কশ স্বরে) আঃ কর কি! ঘুমটা কি এতই হলো? এইরূপে দুই কর্তা গিন্নীতে কিয়ৎক্ষণ বিবাদ চলিল। অবশেষে মধু আসিয়া উপস্থিত।

তর্ক। মধু, একবার জালগাছা খিড়কীর পুকুরে বার দুই ফেলে দেখত কিছু পড়ে কিনা।

মধু। যে আজ্ঞে।

গৃহিণী। এমন বাতিক গ্রস্ত মানুষ নাকি হয়! চললো এই রেতে পুকুরে মাছ ধরতে।

তর্ক। ওগো সমস্ত দিন অনাহারে পথশ্রম করে যদি আসতে, তাহলে জানতে পারতে চারটী মাছের ঝোল ভাতের জন্য বাঙ্গালির প্রাণটা কেমন করে।

সৌভাগ্যক্রমে মধু জাল ফেলিবামাত্র কতকগুলি বাটা মাছ পাইল। তর্কভূষণ মহাশয় শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এদিকে বিজয়া ও সেজ বৌ দুই উনান জবালিয়া ডাল ভাত চড়াইয়া দিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে, ডাল মাছের ঝোল ভাত প্রস্তুত হইল। অতিথিদিগকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনা হইল। তর্কভূষণ মহাশয় ভোজন স্থানে আগমন করিলেন; সুমিষ্ট সম্ভাষণে অতিথিদিগকে নানা প্রশ্ন করিয়া আপ্যায়িত করিলেন; এবং যতক্ষণ তাঁহারা আহার করিলেন, ততক্ষণ নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রত্যেকের আহারের তত্ত্বাবধান করিলেন। অতিথিগণ পরিতোষ পূর্বক আহার করিয়া পরস্পর তর্কভূষণ মহাশয়ের পরিবারটীর প্রশংসা করিতে করিতে বাহিরে শয়ন করিতে গেলেন। তর্কভূষণ মহাশয় পুনরায়, "দুর্গে দুর্গতি-হারিণি!" বলিয়া ইষ্টদেবতার নাম স্মরণপূর্বক শয়ন করিলেন।

৫

এবার দারুণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। বৃদ্ধেরা বলিতেছেন, তাহারা অনেক বৎসরের মধ্যে গ্রীষ্মের এরূপ প্রখর প্রতাপ দর্শন করেন নাই। খানা, খন্দ, খাল, বিল, পুকুর, পুষ্করিণী সমুদায় শুকাইয়া গিয়াছে; কোথাও একবিন্দু জল নাই; অন্যান্য বৎসর বৈশাখের মধ্যভাগ হইতেই মধ্যে মধ্যে এক এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গ্রীষ্মের উত্তাপের অনেকটা উপশম করে, এবং জ্যৈষ্ঠের প্রারম্ভেই চাষের কাজ আরম্ভ হইয়া যায়; এবার জ্যৈষ্ঠ মাস বিগত-প্রায়, আকাশে একবিন্দু মেঘের সঞ্চার নাই; চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে, মাঠের তৃণ শুকাইয়া গিয়াছে; মাটী ফাটিয়া ফুটীফাটা :; চাষ বাসের কাজ আরম্ভ হইতে পারিতেছে না। এই প্রখর গ্রীষ্মের দিনে

একদিন বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত-প্রায়। তর্কভূষণ মহাশয়ের অন্তঃপুরে যেন দ্বিপ্রহর রাত্রি! কে কোথায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। যে যেখানে ছায়া পাইয়াছে, সেইখানে পড়িয়াছে। গৃহিণী এক পাল নাতি পুতি পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার শয়ন ঘরের মেঝেতে পড়িয়া ঘুমাইতেছেন, তাহারাও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; বধূগণ স্বীয় স্বীয় গৃহে নিদ্রিত আছেন; বাহিরে যেন অগ্নি বৃষ্টি হইতেছে! ভেলো কুকুর গোলার নীচে পড়িয়া আলোহিত রসনা বিনির্গত করিয়া শ্বসিতেছে; বিড়ালগুলি ছায়াযুক্ত স্থানে পড়িয়া ঘুমাইতেছে; ভবেশের পোষা শালিক পাখীটী নিজ নয়নদ্বয় উল্টাইয়া, নিজ খাঁচাতে শয়ন করিয়া, নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতেছে; এবং মধ্যে মধ্যে কোনও কিছু শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া একবার "কালী তরাও" বলিয়া আবার চক্ষু মুদিত করিতেছে। এমন সময়েও কেবল এক শ্রেণীর জীবের বিশ্রাম নাই; তাহারা পাড়ার বালক বালিকা। তাহাদের চক্ষে ঘুম নাই। যাহারা স্কুলে পড়ে, তাহাদেরও প্রাতে স্কুল হওয়াতে তাহারা দুপুর বেলা বাড়ীতে থাকে, ও দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ায়। এই শিশুদলের মধ্যে যাহারা দুষ্ট ও পিতামাতার অবাধ্য, তাহারা জনকজননীকে নিদ্রিত দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছে; এবং আম্র কাননে কাননে ঘুরিয়া ঢিল মারিয়া আম পাড়িতেছে; ও গাছে উঠিয়া পক্ষীশাবক চুরি করিয়া বেড়াইতেছে। আর যাহারা পিতামাতার বাধ্য, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া কোনও ছায়াযুক্ত স্থানে বসিয়া খেলা করিতেছে। অদ্য তর্কভূষণ মহাশয়ের ভবনের শিশুদিগের এই অবস্থা। বিন্ধ্যবাসিনী, সুখদা ও অপরাপর কয়েকটী বালকবালিকা পাশের দাবাতে বসিয়া পুতুল খেলিতেছে। কেবলমাত্র তাহাদের কথোপকথনের অপরিস্ফুট শব্দ সেই মধ্যাহ্নের প্রগাঢ় নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিতেছে।

ভবেশ কেবল শালিক পাখী পুষিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। স্কুলের কোনও বালকের বাড়ী হইতে কতকগুলি পায়রা আনিয়াছে। তর্কভূষণ মহাশয় যখন প্রথম সেগুলিকে দেখেন, তখন বাড়ী অপরিষ্কার করিবে বলিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমে যখন দেখিলেন তাহারা রহিয়া গেল, তখন তাহাদের জন্য খিড়কীর পথের ধারে পাশের দাবার নিকটে খোপ বাঁধিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, এবং আহারার্থে প্রত্যহ আধসের মটর কড়াইএর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। নিরাপদ স্থানে খোপ পাইয়া ও আহারের উত্তম বন্দোবস্ত পাইয়া ক্রমশঃই তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাদের মধ্যে যে দুই চারিটী দেখিতে সর্বাপেক্ষা সুন্দর, বাড়ীর বালকবালিকারা তাহাদের পায়ে ঘুঙুর পরাইয়া দিয়াছে। পায়রাগুলি এমনি গাঘেঁষা যে, শিশুদের পাত হইতে ভাত কাড়িয়া খায়, পায়ে পায়ে বেড়ায়; ও হাত হইতে মটর খুঁটিয়া লয়। তাহার দুই তিনটী পায়রা আজ ছেলেদের খেলার স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পুতুলটীকে কাপড় পরাইয়া শোয়াইবামাত্র একটী পায়রা আসিয়া তাহাকে ঠোক্‌রাইতেছে। একটী বালিকা বলিয়া উঠিল, "মর পায়রাটা আবার মর্‌তে এল; আমার পুতুলটাকে ঠোকরাচ্চে কেন ভাই?" একটী বালক বলিল, "ঠুক্‌রে দেখছে খাবার জিনিষ কিনা।" এই বলিয়া বাম হস্তে পায়রাটাকে সরাইয়া দিল। এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে। ক্রমে কন্যাকে কাপড় পরাইয়া প্রস্তুত করা হইল। এইবার শ্বশুর বাড়ী পাঠান হইবে। কন্যার মাতা বলিল,—"ওগো বেহারারা পাল্‌কী আন, পাল্‌কী আন।" চারিটী বালকে পাল্‌কী ধরিয়া আনিল। তন্মধ্যে পুতুলকে শোয়ান হইল; বেহারারা তুলিল;

কন্যার মাতার ত কাঁদা চাই, সুখদা কাঁদিয়া উঠিল;—"ওগো মা, তোমায় ছেড়ে কেমন করে থাক্‌বো গো।"

গিরিশচন্দ্র তাঁহার শয়ন-গৃহে শয়ন করিয়া কি একখানা ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন; হঠাৎ ক্রন্দনের ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হওয়াতে, তিনি চমকিয়া উঠিলেন; ক্ষণকালের জন্য গ্রন্থখানি হইতে তাঁহার চিত্ত সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি উঠিয়া দেখিবার জন্য বহির্গত হইলেন। গিয়া দেখেন, চারিটী বালক বেহারা হইয়া একখানি পুতুলের পাল্‌কী ধরিয়াছে, পাল্‌কীর মধ্যে একটী পুতুল সে সুখদার কন্যা, বিন্ধ্যবাসিনীর পুত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে, কন্যা পাল্‌কী করিয়া শ্বশুর বাড়ী যাইতেছে, তাই সুখদা ক্রন্দনের অভিনয় করিতেছে। গিরিশচন্দ্র বলিলেন—"বাঁচ্‌লাম বাবা! তোদের কান্না শুনে মনে করেছিলুম বুঝি একটা কি কাণ্ডই হলো।" এই বলিয়া শিশুদের মধ্যে একটু খেলা করিবার জন্য বসিলেন। বলিলেন—"ওরে আমি আজ তোদের বাড়ী অতিথি ব্রাহ্মণ, আমাকে কি খেতে দিবি?" সুখদা ও বিন্ধ্যবাসিনী গিরিশচন্দ্রকে একখানি খেলাঘরের পিঁড়ী বসিতে দিয়া, ব্যস্তসমস্ত হইয়া পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত রাঁধিয়া ফেলিল। রাঁধিয়া ফেলিবার ভাবনা কি! ইঁদুর মাটির ভাত, খেংরা কাটির ডাঁটা, চাকুন্দ বিচীর ডাল, খোলাকুচির মাছ, পানের বোঁটার তরকারী, এ সমুদায় ত নিকটেই প্রস্তুত। অতএব পাক শাক শীঘ্রই হইয়া গেল! গিরিশচন্দ্রও পরিতোষপূর্বক আহার করিলেন। পরিশেষে গিরিশচন্দ্র একটী সুন্দর পুতুল হস্তে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"বাঃ বেশ সুন্দর পুতুলটী, এটী কার?"

সুখদা। ওটী আমার, বিন্দু কেড়ে নিয়েচে।

বিন্ধ্যবাসিনী। আমি কেড়ে নিয়েচি? মিথ্যে কথা! তুই আমার একখান ভাল কাপড় নিয়ে বদল দিস্‌নি?

সুখদা। হেঁ, আমি বুঝি বদল দিয়েছি?

বিন্ধ্যবাসিনী। (নাসাগ্রে অঙ্গুলি দিয়া) ওমা, তুই যে সব কর্‌তে পারিস্‌, ডাক ওদের পুঁটীকে, কি বলে? আমি কি তোর পুতুল চেয়েছিলেম, তুই আমার কাপড়খানা নেবার জন্যে পুতুলটা আমাকে দিলি।

সুখদা। হেঁ, তাই বুঝি।

বিন্ধ্যবাসিনী। (নিতান্ত বিরক্ত হইয়া) এই নে, তোর পুতুল নে, যে মিথ্যে কথা বলে তার সঙ্গে আমি খেলিনে।

এই বলিয়া খেলা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও গমনে উদ্যত।

সুখদা। এই তোমার কাপড় তুমি নেও।

বিন্ধ্যবাসিনী। আমি কাপড় চাইনে; আমি আর খেল্‌বো না। বলিয়া প্রস্থান।

গিরিশ। বিন্দু যেও না, শোন, শোন, এদিকে এস। (বিন্ধ্যবাসিনী মুখ ভার করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া দাঁড়াইল।) একটা কথায় অত রাগ কি কর্‌তে আছে।

বিন্ধ্যবাসিনী। যে মিথ্যে বলে, আমি তারে দেখতে পারিনে, একটা পুতুলের কি এতই লোভ, যে আমি মিথ্যা কথা বল্‌বো? আমার মা যত ভাল ভাল পুতুল দিয়েছিলেন, আমি সব ওদের দিয়েছি।

বাস্তবিক বিন্ধ্যবাসিনীর হৃদয়টা কিছু প্রশস্ত; সে আপনার ভাল ভাল খেলনাগুলি পাড়ার দশজন বালিকাকে বিলাইয়া দিয়াছে। সে পিতামাতার নিকট

যে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে মিথ্যা কথার প্রতি তাহার বড়ই ঘৃণা। আর তার খেলাতে মন নাই; সে দিন ত আর সুখদার সঙ্গে কোনরূপেই খেলিবে না। গিরিশচন্দ্র অনেক বুঝাইলেন, কিছুতেই না। অবশেষে গিরিশচন্দ্র তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য দুইজন বালককে আদেশ করিলেন। সে শক্ত মেয়ে খুঁটীর মত রহিল; তাহারা দুইজনে হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া আনিতে পারিল না। অবশেষে গিরিশচন্দ্র নিজে উঠিলেন; তখন বিন্ধ্যবাসিনী ছুটিয়া নিজ জননীর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল; গিরিশচন্দ্র অনুসরণ করিলেন। বিজয়া আলু থালু হইয়া একাগ্রচিত্তে একটী বৃক্ষের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন, তাঁহাদের পদশব্দে শশব্যস্ত হইয়া অঙ্গ আবরণ করিলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, কি, ব্যাপারটা কি?"

গিরিশ। দেখ ছোড়্‌দিদি! তোমার এই মেয়েটী বাপু বড় একগুঁয়ে।

বিজয়া। কেন কি হয়েছে?

গিরিশ। আমাদের সুকীর সঙ্গে বেশ খেল্‌ছিল, কি একটা পুতুল নিয়ে তক্‌রার কর্‌লে, তারপর আর কোন ক্রমেই খেলবে না। আমি কত বুঝালাম, ধরে আনবার জন্য দুটো ছেলেকে পাঠালাম, কার সাধ্য কিছুতেই পারা গেল না। শেষে আমি যদি ধরতে গেলাম, ত তোমার ঘরে পালিয়ে এল।

বিন্ধ্য। আমি কেন খেলবো? যে মিথ্যে কথা কয়, তার সঙ্গে আমি খেলিনে। মা, সুকীর সেই পুতুলটা কি আমি কেড়ে নিয়েচি? সুকী নাকি কাপড় নিয়ে বদল দেয় নি?

বিজয়া। হাঁ আমাকে পুতুলটা দেখিয়েছিল ও বলেছিল বটে, যে কাপড় নিয়ে বদল দিয়েছে। তা সুকীর পুতুল, সুকী নিলেই বা।

বিন্ধ্যবাসিনী। নিক্‌ না, আমি ফেলে দিয়েছি। মিথ্যে কথা বলে কেন?

বিজয়া। (গিরিশের প্রতি) থাক, খেলবে না ত খেলবে না, টানাটানি করে আর কি হবে? গিরিশ, তুমি একটু বসো; একটা কথা আছে।

গিরিশচন্দ্র বিজয়ার তক্তপোষের একপার্শ্বে বসিলেন।

"তুমি কি এমন কোনও বাঙ্গলা বই জান, যাতে পরকালের বিষয় পরিষ্কার করে লেখা আছে?"

গিরিশ। এমন কোনও বাঙ্গলা বইএর কথা ত মনে হয় না; তবে ইংরাজীতে আমরা যে ফিলজফি পড়ি, তাতে এ বিষয়ে অনেক কথা আছে।

বিজয়া। তার কি বাঙ্গলা অনুবাদ হয় নি?

গিরিশ। না।

বিজয়া। তুমি সেই ইংরাজী বইটা পড়ে আমাকে শোনাতে পার ও ভাবার্থটা বুঝিয়ে দিতে পার?

গিরিশ। তা পারি, এক দিন দেব।

বিজয়া। তাতে কি আছে?

গিরিশ। ঈশ্বর ও পরকাল কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহারি সম্বন্ধে বিচার আছে।

বিজয়া। আমি ঠিক তাই চাই।

গিরিশ। আচ্ছা, তবে এক দিন শুনো।

বিজয়া। আর একটা কথা আছে; তোমাদের বাসাতে আমাদের গোবিন্দের একটু থাক্‌বার জায়গা হয় না?

গিরিশ। জায়গার অভাব কি? আমি ও পঞ্চু যে ঘরে থাকি, সে ঘরেও হতে পারে, অন্য ঘরেও হতে পারে। আর এত লোকের খাওয়া চলে, তারও একমুটো ভাত হতে পারে।

বিজয়া। তবে গোবিন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও না কেন? তার বড় ইচ্ছা সংস্কৃত কালেজে পড়ে; লজ্জাতে কাকেও কিছু বল্‌তে পারে না। তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে দিতে পার্‌লে একটা গরিব পরিবারকে রক্ষে করা হয়।

গিরিশ। গোবিন্দ ত বাড়ীর ছেলে, সে থাক্‌বে তাতে আর কি? তবে এ বিষয়ে একটু গোলযোগ ঘটেছে; বাবা যে আর পরের ছেলে বাসাতে রাখ্‌তে চান এরূপ বোধ হয় না।

বিজয়া। কেন, কি গোলযোগ ঘটেছে?

গিরিশ। বাবা পঞ্চুর প্রতি বড় চটেছেন; চটে বলেছেন, "আর পরের ছেলে বাসাতে রাখ্‌বো না; বাঁধ কেটে লোণা জল আর নিজের ক্ষেতে আন্‌বো না।"

বিজয়া। তোমার মাস্‌তুতো ভাই পঞ্চু? সে ত ভাল ছেলে, সকলের মুখেই তার প্রশংসা শুনি, বড় কর্তা তার উপরে এত চট্‌লেন কেন? (বিজয়া বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে বড়কর্তা, মেজকর্তা, সেজকর্তা প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকেন।)

গিরিশ। সে ত ছেলে ভাল, তার মত সচ্চরিত্র ছেলে আজ কাল দেখা যায় না; কিন্তু তার কতকগুলি বড় দোষ আছে। প্রথম, সে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে না; দ্বিতীয়, সে বুধবার বুধবার ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কর্‌তে যায়, ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নেয়; তৃতীয়তঃ, প্রতি শনিবার রাত্রে কি এক "নবরত্ন" সভা কর্‌তে যায়। বাবা এই সকল কথা শুনে একেবারে হাড়ে চটে গেছেন; তার সঙ্গে আর কথা কন না।

বিজয়া। পঞ্চু কি বলে?

গিরিশ। আমি তাকে কত বলেছি; সে বলে সন্ধ্যা-আহ্নিক কর্‌বো কি, যা বিশ্বাস করি না, তা করা ত ভণ্ডাম। আমি বলি, সব কথা কি তুমি বোঝ? একটা প্রথা চলে আস্‌চে, কর্‌লেই বা; তা সে কোনও মতেই শোনে না।

বিজয়া। ব্রাহ্মসমাজে যায়, তত্ত্ববোধিনী কাগজ পড়ে, তাতে রাগের বিষয় কি? আমাদের তিনি ত ব্রাহ্মসমাজে যেতেন, তত্ত্ববোধিনী কাগজও নিতেন। ব্রাহ্ম-সমাজে ত পরমেশ্বরের উপাসনা হয়; আর আমি নিজে তত্ত্ববোধিনী কাগজ পড়ে দেখেছি, তাতে অতি চমৎকার কথা থাকে, পড়লে মানুষের জ্ঞান হয়; সকলেরই ত তত্ত্ববোধিনী পড়া উচিত।

গিরিশ। ও ছোড়্‌দিদি, তুমি মেয়েমানুষ কিনা, তাই সোজাসুজি বুঝেছ। ব্রাহ্মসমাজে গিয়েই ত বেগড়ানে বুদ্ধি ঘটে। সেখানে গিয়েই ত শোনে পুতুল-পূজা করতে নেই, জাত্‌টে কিছু নয়, কুসংস্কারগুলো ছাড়্‌তে হয়।

বিজয়া। কৈ আমাদের তাঁর ত বেগড়ানে বুদ্ধি দেখি নাই।

গিরিশ। তিনি ত বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোক ছিলেন। মনে যাই থাকুক, কাজে সমাজবিরুদ্ধ আচরণ কিছু কর্‌তেন না। এরা আবার এককাটি সরেস! বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত কিনা। তবে ইহার ভিতর একটা কথা আছে। পঞ্চুর বেগড়ানে বুদ্ধিটা বোধ হয় কেবল ব্রাহ্মসমাজ থেকে হয়নি; সে ডফ্‌সাহেবের স্কুলে পড়তো, মিশনারি সাহেবেরা তার সঙ্গে লেগেই আছে; একবার ত একটা গুজবই উঠলো, পঞ্চু খ্রীষ্টান হবে।

বিজয়া। তুমি ত বাপু বেগড়ানে বুদ্ধি বল্‌ছো, আমি ত তা বল্‌তে পারিনে। ধর্মে মতি, পরমেশ্বরে ভক্তি, জ্ঞানে রুচি হলে যদি বেগড়ানে বুদ্ধি হয়, তবে সে বেগড়ানে বুদ্ধি আমাদের সকলের হোক্‌। আমরা অতি অধম, ভগবানকে ভুলেই থাকি; তাঁতে যদি কারুর মতি গতি হয়, সে ত আনন্দেরই কথা।

গিরিশ। তুমি যে উল্টো বুঝ্‌লে; পুতুলপুজো কর্‌বো না, জাত ভাঙবো, সন্ধ্যা-আহ্নিক কর্‌বো না এই সব বুদ্ধিই বেগড়ানে বুদ্ধি। ঈশ্বরে মতি হয়, সে ত ভালই; সেই সঙ্গে হাঙ্গামাগুলো যোটে বলেই ত দোষের কথা।

বিজয়া। ও কথা থাক্‌। আবার একটা কি সভার নাম কর্‌লে, "নবরত্ন" নাকি?

গিরিশ। হাঁ "নবরত্ন"; সেটার বিষয় আমি ভাল জানি না; পণ্ডুর মুখে শুনেছি, তার নাম "নবরত্ন" নয়, আসল নামটা আত্মোন্নতি-বিধায়িনী সভা। ব্রজরাজ ঘোষ নামে একটী সভ্যের বাড়ীতে সে সভা বসে; এরা ৯ জনের অধিক সভ্য নেয় না বলে, সেই ব্রজরাজের মা নাকি সভার নাম নবরত্ন দিয়াছেন। তারা যাকে তাকে যেতে দেয় না; নাস্তিককে সভ্য করে না; যে মদ খায়, তাকে সভ্য করে না; আর তাদের একটা নিয়ম এই আছে, সভাতে কর্তব্য বলে যা ঠিক হবে, তা সকলকে কর্‌তেই হবে।

বিজয়া। বাঃ! এরূপ সভা ত বেশ; আজ-কালকের দিন লেখা পড়া শেখা লোকের মধ্যে নাস্তিক, নাস্তিক, একটা ধুয়ো পড়ে গেছে; এরা ত বেশ, নাস্তিককে নেয় না। আর মদ খায় না এটাও ত বেশ কথা। শেষ কথাটাও মন্দ নয়। যা কর্তব্য বলে ঠিক হয়, তা ত করাই ভাল।

গিরিশ। সভাটা কি রকম সর্বনেশে একবার ভেবে দেখ্‌লে না? আজ যদি তারা ঠিক করে জাত রাখ্‌ব না, তবে, কাল তাদের মধ্যে যারা বামন আছে, সকলেই পৈতা ফেলে দেবে। আজ যদি ঠিক করে, বাল্যবিবাহ করা হবে না, কাল তাদের কেউ আর বাল্যবিবাহ কর্‌বে না। পুতুল পুজো করা হবে না, বাল্যবিবাহ করা হবে না, এ দুটো নাকি ঠিক হয়ে গেছে; এখন জাতিভেদের উপর তর্ক চল্‌ছে।

বিজয়া। পণ্ডু কি এই সভায় সভ্য? সে পুতুল পুজো কর্‌বে না, বাল্য-বিবাহ কর্‌বে না, প্রতিজ্ঞা করেছে?

গিরিশ। করেছে বৈ কি, তবে আর কি বল্‌ছি? বিয়ের জন্যে তাকে কত পীড়াপীড়ি করা হয়েছিল, কোন ক্রমেই কর্‌লে না।

বিজয়া। বড় কর্তা এসব কথা জানেন?

গিরিশ। এত কথা কি আর জানেন? তা হলে কোন্‌ দিনে তাকে তাড়িয়ে দিতেন। কেবল এইমাত্র শুনেছেন, যে শনিবার শনিবার কোথায় সভা কর্‌তে যায়, তাতেই এত রাগ। বাবা সভা করতে যাওয়াটা দেখ্‌তে পারেন না। আর বোধ হয় আমাকে ইংরাজী পড়্‌তে দিয়ে অবধি তাঁর ভয়টা কিছু বেশি; পাছে ছেলে বিগ্‌ড়ে যায়।

বিজয়া। যাক, ওসব বাহিরের কথা; গোবিন্দকে তোমাদের বাসাতে রাখ্‌বার কি হবে?

গিরিশ। বাবারই প্রধান আপত্তি: তিনি এতদিন বাড়ীতে ছিলেন, তিনি থাক্‌তে থাক্‌তে কথাটা তুল্‌লে না কেন?

বিজয়া। বলি বলি করে ভুলে গেলাম।

গিরিশ। এক দিকে দেখ্‌তে গেলে, বাবা থাক্‌তে না তুলে ভালই করেছ। তিনি পণ্ডুর বিশেষ বিবরণ কর্তা দাদা মশাইকে বলে অমত করে দিতেন, তা হলে আর হতো না। এখন কর্তা দাদা মশাই সকল কথা না শুনে গোবিন্দকে যদি পাঠান, বাবা আর ফেরাতে পারবেন না।

বিজয়া। বড় কর্তা কি আর পণ্ডুর কথা দাদাকে বল্‌তে বাকি রেখেছেন।

গিরিশ। বোধ হয় বলেন নি। সে দিন ত কর্তা দাদা মশাইয়ের সাক্ষাতে ব্রাহ্মসমাজের কথা হচ্ছিল, কর্তা দাদা মশাই ত কিছু বল্‌লেন না।

বিজয়া। ও গিরিশ! তুমি বুঝি দাদাকে আজও চেন নি? উনি ঐ সকল কথার মধ্যে বসে আছেন, অথচ কোনও কথাতে থাকেন না। কার উপরে কি ভাব, তা কি হঠাৎ প্রকাশ করেন? আচ্ছা, যদি দাদা পণ্ডুর কথা শুনেই থাকেন, তা হলে কি হবে?

গিরিশ। গোবিন্দকে কর্তা দাদা মশাই ভালবাসেন। এটা ত বুঝ্‌বেন সে গরীবের ছেলে, তার একটা উপায় হলে ভাল হয়। ছোড়্‌দিদি! তুমি একটু নিরালয়ে বলো; দয়াটা খুব আছে, হয় ত মত হবে।

বিজয়া। বেশ কথা, তাই বল্‌বো। আমি বল্‌লে মত হতে পারে; আমাকে দাদা বড় ভালবাসেন; আমার কোন কথা প্রায় ফেলেন না।

গিরিশ। কর্তা দাদা মশাইয়ের ধুগড়ীর ভিতর খাসা চাউল; দেখ্‌লে কে বল্‌বে মানুষটীতে রস কস কিছু আছে, কিন্তু যাকে ভালবাসেন, প্রাণ দিয়েই ভালবাসেন।

বিজয়া। আবার যাকে ঘৃণা করেন, অমনি প্রাণ দিয়েই ঘৃণা করেন।

গিরিশ। ঠিক্‌ বলেছ, কর্তা দাদা মশাইয়ের আধাআধি কিছু নাই; লোক-দেখানে কাজ একটুও নাই; মনে এক রকম বাহিরে অন্য রকম সহ্য কর্‌তে পারেন না।

বিজয়া। যা হোক, তবে আমি শীঘ্র দাদাকে একবার নিরালয়ে বল্‌বো; তোমার প্রতি অনুরোধ, তুমি গোবিন্দকে একটু দেখ্‌বে, বইখানা আসখানা যোগাড় করে দেবে।

গিরিশ। সে বিষয় বলা বাহুল্য মাত্র, সে ত আমাদের বাড়ীর ছেলে।

এই কথোপকথনের পর দিনেই বিজয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট গোবিন্দের কলিকাতায় শিবচন্দ্রের বাসাতে থাকিবার প্রস্তাব করিলেন। তর্কভূষণ বলিলেন;— "ও যদি আপনার অবস্থার উন্নতি কর্‌তে পারে, ভালই। শিবচন্দ্রের এত দিকে এত ব্যয় হয়, আর ও থাক্‌লে কি বিশেষ ব্যয় হবে? আচ্ছা, গিরিশের সঙ্গে সে কল্‌কেতায় যাক্‌।"

তদনন্তর গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খুলিবার সময় গোবিন্দ গিরিশচন্দ্রের সহিত কলিকাতায় গেল, এবং এক টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইল। বিজয়া গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া গোবিন্দের খরচের জন্য মাসে মাসে ৩্ টাকা করিয়া গোপনে গিরিশের নিকট পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

গিরিশচন্দ্র ও গোবিন্দের কলিকাতা যাত্রার অব্যবহিত পরেই গৃহিণী ও বিধবা-চতুষ্টয় দশহরার দিন গঙ্গাস্নান করিবার জন্য শান্তিপুরে গিয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বরীর বিবাহের সময় ষোড়শী পিত্রালয়ে আসিলে, গৃহিণী তাহার সহিত এই পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, দশহরার সময়ে তিনি ও বিধবা-

চতুষ্টয় এক দিনের জন্য গঙ্গাস্নানার্থ তাহার শ্বশুরালয় শান্তিপুরে গমন করিবেন; এবং বিজয়া সংসারের ভার লইয়া থাকিবেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তিনি আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। দশহরার দিন সন্নিকৃষ্ট হইলে, গৃহিণীগণের শান্তিপুর গমনের চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। কি উপায়ে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করা যায়? এমন সময়ে দৈবাৎ শান্তিপুরের একখানা ঘোড়ার গাড়ি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। কর্তা তৎক্ষণাৎ গাড়োয়ানকে ডাকাইয়া সেই গাড়ি ভাড়া করিলেন। এইরূপ স্থির হইল যে দশহরার পূর্বদিন মহিলারা আহারান্তে সেই গাড়িতে শান্তিপুরে গমন করিবেন; তৎপর দিন গঙ্গাস্নানান্তে সেখানে যাপন করিয়া, তৃতীয় দিবসে নশিপুরে ফিরিয়া আসিবেন। মধু চাকর তাঁহাদের সর্মাভব্যাহারী হইবে।

যথাসময়ে গৃহিণী ও বিধবা-চতুষ্টয় আহারাদি করিয়া গাড়িতে যাত্রা করিলেন। মধু চাকর উপরে গাড়োয়ানের নিকট বসিয়া চলিল। আষাঢ়ের প্রারম্ভে রৌদ্রের অতি প্রখর তেজ; বর্ষা এখনও নামে নাই। এই রৌদ্রে অশ্বদ্বয়ের পক্ষে গাড়ি টানিয়া যাওয়া বড় সহজ নহে। কয়েক ক্রোশ অতি ক্লেশে আসিয়াই অশ্বদ্বয় একেবারে ক্লান্ত ও শক্তিহীন হইয়া পড়িল; সুতরাং চক্রধরপুরের বাজারে তাঁহাদিগকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। বৃক্ষের ছায়াতে গাড়ি দাঁড় করাইয়া, অশ্বদ্বয়ের মুখ খুলিয়া তাহাদিগকে ঘাস দিয়া, গাড়োয়ান তামাক খাইতে গেল। বিধবা-চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন নামিয়া গেলেন; গৃহিণী ও অপর বিধবাত্রয় গাড়িতেই রহিলেন। মধু নামিয়া দোকানে গিয়া বসিল; এবং পথিকদিগের সহিত আলাপ পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইল।

তর্কভূষণ মহাশয় আসিবার সময় মধুর হস্তে দশটী টাকা দিয়াছেন এবং তাহা হইতে গাড়ির ভাড়া ২৷৷০ আড়াই টাকা, ও ষোড়শীর শ্বশুরালয়ের তিনটী শিশুর হাতে ৩্ টাকা দিয়া, অবশিষ্ট টাকা রমণীগণের পুণ্যার্থে ব্যয় করিতে আদেশ করিয়াছেন। গৃহিণীকে কেবল এইমাত্র বলিয়া দিয়াছেন—"মধুর নিকট টাকা রহিল, প্রয়োজন মত চাহিয়া লইও।" এতদ্ভিন্ন গৃহিণী নিজে পাঁচটী টাকা স্বতন্ত্র আনিয়াছেন, তাহা তাঁহার অঞ্চলে বাঁধা রহিয়াছে। বিধবাগণও যথাসাধ্য কিছু কিছু অর্থ অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছেন।

বৃক্ষতলে গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় একটী ডোমজাতীয়া রমণী ভিক্ষা করিবার জন্য গাড়ির দ্বারে উপস্থিত। তাহার ক্রোড়ে একটী ছয় সাত মাসের শিশু সন্তান। তাহার শিশুটী দেখিয়া কর্ত্রী বলিলেন;—"ওমা ওমা, কেমন সুন্দর ছেলেটী দেখ, যেন পাথুরে গোপালটী! কি জাত কে জানে, কোলে করবার যো নেই, তা না হলে কোলে নিতাম।" তৎপরে তিনি যখন সে হতভাগিনীর দুঃখের কাহিনী শুনিলেন, যখন জানিতে পারিলেন, যে একমাস কাল হইল তাহার পতি তাহাকে ও ঐ শিশুটীকে পরিত্যাগ করিয়া অপর একটী স্ত্রীলোককে লইয়া কোন্ দেশে পলাইয়া গিয়াছে, এখন মুষ্টি-ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে ঐ হতভাগিনীর দিন চলে, তখন তাঁহার মন কৃপাতে আর্দ্র হইল। বলিলেন;—"আহা! এমন সুন্দর ছেলেটী একটু দুধ পায় না!" এই বলিয়া আপনার অঞ্চল হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া ঐ শিশুর দুধের জন্য সেই রমণীকে দিলেন; এবং বলিলেন—"তুই নশিপুরে আমাদের বাড়ীতে যাস্, তোর একটা উপায় করে দেব।" কিন্তু সে নশিপুরে কার বাড়ীতে যাবে? জিজ্ঞাসা

করাতে গৃহিণী বলিলেন—"জানিস্‌নে, সেই অমুক তর্কভূষণের বাড়ী।" তিনি ভাবিলেন, তাঁহার পতির ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তিকে জানে না, নরলোকে এমন কে আছে? কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়ের বিদ্যা-বুদ্ধির খ্যাতি, এই ডোম-কন্যার কর্ণে পেঁছে নাই। আর পেঁছিলেই বা কি? অমুক তর্কভূষণ বলিলেই ত কিছুই বুঝা যায় না। তর্কভূষণ মহাশয়ের সমগ্র নামটা রমণীদিগের কেহই বলিতে পারিতেছেন না। গৃহিণীর ত কথাই নাই; তিনি পতির নাম কিরূপে ধরিবেন? যে তিনটী বিধবা গাড়িতে আছেন, তাঁহারাও সম্পর্কে তর্কভূষণ মহাশয়ের ভ্রাতৃবধূ, কিরূপে ভাশুরের নাম ধরিবেন? যে বিধবাটীর নাম ধরিবার অধিকার আছে, তিনি গাড়িতে নাই। মহা মুস্কিল! রমণীগণ বুঝাইবার জন্য যা কিছু বলিতেছেন, তাহাতে ঐ ডোম-কন্যা কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। অবশেষে সে গিয়া একজন দোকানদারকে ডাকিয়া আনিল। সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক আসিল। গাড়ির দ্বারে জনতা! ব্যাপারটা কি? রমণীরা নশিপুরের কোন্‌ ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছেন, তাহা স্থির করিতে হইবে। গাড়ির দ্বারে জনতা দেখিয়াই মধু ছুটিয়া আসিল। গৃহিণী মধুকে তর্কভূষণ মহাশয়ের নামটা বলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। দোকানদার শুনিয়া বলিল, "ওঃ জানি, জানি, আমি ওকে পাঠিয়ে দেব।"

এক ভিখারিণী চলিয়া যাইতে না যাইতে আবার আর এক দল ভিক্ষুক উপস্থিত। এক দণ্ডের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গ্রামের দরিদ্র ও ভিক্ষুকদিগের মধ্যে এই বার্তা ছড়াইয়া পড়িল যে, বাজারের গাড়িতে কে একজন বড়লোকের স্ত্রী যাইতেছেন, তিনি বেঁশের স্ত্রীকে একটা টাকা দিয়াছেন। অমনি একটী দুইটী করিয়া অনেকগুলি ভিক্ষুক গাড়ির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। আবার মধু ছুটিয়া আসিল। সে মনে ভাবিল, গৃহিণীর নিকট আরও টাকা আছে, তাহা তাঁহার হস্তে থাকিলে একটীও থাকিবে না; সেগুলি কাড়িয়া লওয়া আবশ্যক। ভাবিয়া বলিল—"মা ঠাক্‌রুণ! আপনার কাছে আর কত টাকা আছে?"

গৃহিণী। সে কথায় তোমার কাজ কি?

মধু। আপনার অসাধ্য ত কিছু নেই। কুবেরের ভাণ্ডার আপনার হাতে দিলে এক দিনে লুটিয়ে দিতে পারেন। দেন, আমার কাছে টাকা গুলো দেন।

গৃহিণী। টাকা কি জন্যে? গরিব দুঃখীকে খাওয়াবার জন্যেই ত। আহা ওদের পেটে ভাত নেই, গায়ে বস্ত্র নেই, এসব দেখে কি থাকা যায়?

মধু। সে আমি বুঝ্‌বো, আপনি টাকাগুলো আমাকে দেন না। পেটে ভাত নেই? আপনিও যেমন, ওরা ভাত খেয়ে ঘরে ঘুমুচ্ছিল, একজনকে একটা টাকা দিয়েছেন কিনা, তাই শুনে সব ছুটে এসেছে।

এই বলিয়া সে সেই ভিক্ষুক জনতাকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিল।

গৃহিণী। আঃ মধু কর কি? অমন করে তাড়িয়ে দেও কেন? ওরা কি বল্‌ছে শুন্‌তে দেও না।

মধু। ও ঢের শোনা আছে; আপনারা বাড়ীতে থাকেন, তাই শুন্‌তে পান না, আমরা পথে ঘাটে সর্বদাই শুন্‌ছি। আমাকে টাকাগুলো দেন না; যাকে যা দিতে হয়, আমি দিচ্চি।

গৃহিণী দেখিলেন, টাকাগুলি না দিলে মধু কোন প্রকারেই ছাড়ে না, অবশেষে

অঞ্চল হইতে চারিটী টাকা বাহির করিয়া মধুর হস্তে দিলেন। মধু সেই ভিক্ষুক জনতাকে ডাকিয়া একটু অন্তরালে লইয়া গেল, এবং গালাগালি দিয়া অধিকাংশকেই তাড়াইল। কতকগুলি ছাড়িবার পাত্র নহে; তাহারা মধুর নিকট তাড়া খাইয়া আবার গৃহিণীর নিকট আসিল। মধু গালাগালি দিয়া সকলকে তাড়াইয়া দিয়াছে শুনিয়া, গৃহিণী ঠাকুরাণী অতিশয় বিরক্ত হইলেন; এবং মধুকে ডাকাইয়া তিরস্কার করিয়া অবশিষ্ট কয়েকজনকে কিছু কিছু দিয়া বিদায় করিতে আদেশ করিলেন। তিনি যাহাকে চারি আনা দিতে বলিলেন, মধু তাহাকে দুই আনা দিয়া বিদায় করিল; তিনি যাহাকে আট আনা দিতে বলিলেন, মধু তাহাকে চারি আনা দিল; এইরূপ করিয়া দিতে দিতে আরও দুই টাকা ব্যয় হইয়া গেল। মধু ভাবিতে লাগিল, এখন শীঘ্র গাড়ি ছাড়িলে হয়, আর অধিক বিলম্ব করিলে আমার হস্তস্থিত টাকার উপরেও টান পড়িবে। সে গাড়োয়ানকে ত্বরা দিয়া যাত্রা করিল।

নশিপুরের নারীগণ ক্রমে শান্তিপুরে ষোড়শীর শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাহারা সমুচিত সমাদরের সহিত গৃহীত হইলেন। পর দিন সকলে গঙ্গাস্নান করিলেন। মধু শিশুদিগের হস্তে দিবার জন্য তিনটী টাকা গৃহিণীর হস্তে দিল, তিনি শিশুদিগকে দিলেন। গঙ্গাতীরে গৃহিণী যে দান ধ্যান করিলেন, তাহাতে মধুর হস্তে কয়েক আনা পয়সা মাত্র অবশিষ্ট রহিল। সেই সম্বল হস্তে লইয়া, সে তৎপরদিন মহিলাদিগকে সঙ্গে করিয়া নশিপুরে প্রস্থান করিল।

তাঁহাদের ফিরিয়া আসিবার দুই এক দিন পরেই ডোম-কন্যা গঙ্গী নশিপুরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। ওদিকে হরের মার নূতন ঘর বাঁধা হইয়া, সে সেই ঘরে গিয়াছে। তর্কভূষণ মহাশয়ের আদেশক্রমে গঙ্গী সেই খিড়কীর ঘরে আশ্রয় পাইল; এবং বাহির বাড়ীর গোয়ালে গরুর সেবা করিতে লাগিল। বর্ষাশেষে তর্কভূষণ মহাশয় গ্রামের মধ্যে একটু জমির যোগাড় করিয়া তাহাকে একটী ঘর বাঁধিয়া দিলেন। সে নশিপুরের অধিবাসিনী হইয়া রহিল।

৬

গ্রীষ্মাবকাশের অবসানে গিরিশচন্দ্র ও গোবিন্দ কলিকাতায় যাওয়ার পর হইতে পূজার সময় পর্যন্ত এই কয়েক মাসের মধ্যে আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল: সেটী নশিপুরের নিষ্কর্মা যুবকদলের কলিকাতা গমন। এই নিষ্কর্মা যুবকদের উল্লেখ অগ্রেই করা হইয়াছে। ইহার অনুরূপ যুবকদল অনেক গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায়; অন্ততঃ যে সময়কার কথা হইতেছে, সে সময়ে অনেক গ্রামে দেখিতে পাওয়া যাইত। নশিপুর ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম, সুতরাং ইহাদের সকলেই ব্রাহ্মণ-সন্তান। কোনওরূপে খাওয়া পরা চলিয়া যায় বলিয়া ইহাদের কাজ কর্ম করিবার প্রবৃত্তি নাই; ঘরে বসিয়াই থাকে। ইহাদের অধিকাংশের বয়ঃক্রম ১৮।১৯ হইতে ২৫।২৬ এর মধ্যে। গল্প করিয়া, তাস খেলিয়া ও হাস্য পরিহাস করিয়া ইহাদের সমুদায় সময় অতিবাহিত হয়।

তর্কভূষণ মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র হরচন্দ্র যে আমোদপ্রিয় দলের প্রিয়পাত্র বলিয়া পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, সে দল স্বতন্ত্র; তাহাদের বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। ইহারা বারইয়ারির দল। এই ব্রাহ্মণযুবকগণ আলস্যে দিন যাপন করে বটে, কিন্তু ইহাদের দ্বারা গ্রামের লোকের অনেক উপকার হয়। ইহারা অতিশয় পরোপকারী। যদি রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে কাহারও গৃহে মানুষ মরে, সংবাদ পাইবামাত্র ইহারা সদলে উপস্থিত হয়, ও শব বহন, শবদাহ প্রভৃতি করিয়া গৃহস্থের মহোপকার সাধন করে। গৃহদাহ উপস্থিত হইলে ইহারা দলে বলে আসিয়া পড়ে; কাহারও ভবনে বিবাহ শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান উপস্থিত হইলে, এবং খাটিবার লোক না থাকিলে, ইহারা উপস্থিত হইয়া রন্ধন, পরিবেশন, প্রভৃতি সমুদায় কার্যের ভার লইয়া যাহাতে সুশৃঙ্খলরূপে কার্য সমাধা হয়, সে বিষয়ে বিধিমতে সাহায্য করে। এই গুণে ইহারা সকলের প্রিয়; এবং এই কারণেই ইহারা মধ্যে মধ্যে লোকের উপরে যে কিছু উপদ্রব করে, তাহা গ্রামস্থ লোক সহ্য করিয়া থাকে।

ইহাদের কিছু কিছু উপদ্রবও আছে। তাহার কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোনও গৃহস্থের গৃহে পরিবারস্থ লোকেরা তাহাদের একটী বালিকা বধূকে বড় ক্লেশ দিত। এই কারণে যুবকদল সে পরিবারের প্রতি বিরক্ত ছিল। একদিন ইহারা শুনিল যে সেই বধূটীর পতি (তাহাদের পরিচিত একটী যুবক) পিতামাতার প্ররোচনায় বালিকা বধূটীকে গুরুতর রূপে প্রহার করিয়াছে। ইহাতে যুবকদল এতই চটিয়া গেল, যে সেইদিন রাত্রেই সেই যুবককে একাকী পথে পাইয়া সকলে পড়িয়া এরূপ প্রহার করিল, যে সে কয়েকদিন উত্থান-শক্তি-রহিত হইয়া রহিল।

আর একবার আর একটা কাণ্ড বাধাইয়াছিল। এই নশিপুর গ্রামে কায়স্থ-জাতীয় একজন লোক আছেন। লোকে কৃপণতা বশতঃ তাঁহার নাম করে না, কেবল "অমুক ঘোষ" বলিয়া সঙ্কেতে নির্দেশ করিয়া থাকে; অতএব আমরাও তাঁহার নাম না করিয়া অমুক ঘোষ বলিয়া নির্দেশ করিব। অমুক ঘোষ একজন ধনশালী ব্যক্তি; অথচ নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে আবশ্যক মত দুই পয়সা ব্যয় করিতে অতিশয় নারাজ। এই বিষয় লইয়া গ্রামবাসীদিগের মধ্যে সর্বদা আলোচনা হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে তাঁহার সহিত পথে সাক্ষাৎ হইলে লোকে অনেক সময় তাঁহাকে শুনাইয়া বলিয়া থাকে—"আজ গতিক ভাল নয়, দিনটা ভাল গেলে হয়!" একবার পূজার পূর্বে একদিন রাত্রে এই যুবকদল অমুক ঘোষের গৃহে এক দুর্গা প্রতিমা ফেলিয়া দিল। এদেশে প্রথা আছে, কোনও গৃহস্থের গৃহে ঠাকুর ফেলিয়া দিলে, গৃহস্থকে বাধ্য হইয়া পূজার আয়োজন করিতেই হয়। কিন্তু অমুক ঘোষ সহজে হারিবার লোক নন; তিনি সেই রাত্রেই নিজ ভৃত্যদিগের দ্বারা ঐ প্রতিমা জলে ফেলিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতে যুবকদল যখন শুনিল যে, প্রতিমা জলে ফেলিয়া দিয়াছে, তখন তাহারা সেই প্রতিমার গণেশটা তুলিয়া, তাহার স্কন্ধে কাছা পরাইয়া, অমুক ঘোষের হস্তে গণেশ-জননীর অপঘাত মৃত্যু, বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। শুনিতে পাওয়া যায়, এইরূপে প্রায় চারি পাঁচ শত টাকা তুলিয়া তাহারা মহাধুমধাম সহকারে গণেশ-জননীর শ্রাদ্ধ করিয়াছিল।

আর একটা কাণ্ড ইহা অপেক্ষাও বিগর্হিত হইয়াছিল। নশিপুরে জয়রাম বাচস্পতি নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রায় এক বৎসর হইল তিনি পরলোক-

গত হইয়াছেন। পুত্র পৌত্র, কন্যা, দৌহিত্রে তাঁহার ঘর পরিপূর্ণ, তথাপি ৬৫ বৎসর বয়সে যখন তাঁহার গৃহ শূন্য হইল, তখন বৃদ্ধ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহা তাঁহার একটা বাতিকের মধ্যে দাঁড়াইল। যাহাকে নিকটে পান তাহারই সহিত গম্ভীর ভাবে এই আলোচনাতে প্রবৃত্ত হন; "তুমি বল ত বাপু! গৃহের একজন কর্ত্রী না থাকিলে কি গৃহের শৃঙ্খলা থাকে?" লোকে বলে,—"হাঁ তা বৈ কি?" ক্রমে সমস্ত গ্রামে ইহা একটা কৌতুকের ব্যাপার হইয়া উঠিল। বাচস্পতি মহাশয় যখন পথ দিয়া যাইতেন, গ্রামের বালক-বালিকাগণ করতালি দিয়া বলিত—"বিয়ে পাগলা বুড়ো বর, বিশের মাকে বিয়ে কর।" বিশের মা একজন কৈবর্তজাতীয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, তাহার একটি চক্ষু নাই ও এক পায়ে গোদ। বাচস্পতি মহাশয় এই কথা শুনিলেই ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুদিগকে প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হইতেন। তাহাদের সহিত দৌড়িয়া পারিবেন কেন, তাহারা হরিণশিশুর ন্যায় লম্ফ দিয়া কোথায় পলাইয়া যাইত। একবার এই নিষ্কর্মা যুবকদল মনে করিল, যে বৃদ্ধ বাচস্পতিকে প্রতারণা করিয়া একটা ভোজ আদায় করিবে। ইহাদের একজন ঘটক সাজিয়া গম্ভীরভাবে বাচস্পতি মহাশয়কে বলিল—"ঠাকুর দা, লক্ষ্মীছাড়ারা আপনাকে নিয়ে তামাসা ঠাট্টা করে, আমি কিন্তু আপনার জন্য একটী কনে দেখে এসেছি।" বাচস্পতি অমনি তন্মনস্ক। ক্রমে প্রকাশ পাইল, যে কন্যাটী পার্শ্বের এক গ্রামে আছে, তাহার পিতা মাতা নাই; ভাই বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছে; সমুদায় ঠিক; কেবল দিন স্থির করিলেই হয়। বৃদ্ধ বাচস্পতির সহিত এই বন্দোবস্ত হইল, যে বিবাহ-যাত্রার পূর্বদিনে তাহাদিগকে ভোর দম লুচি সন্দেশ খাওয়াইবেন। তদনুসারে দিন স্থির হইয়া তৎপূর্বদিন যুবকদল উত্তমরূপ ভোজের আমোদ করিল। পরদিন বর লইয়া বিবাহ দিতে গেল। গ্রামের লোকে মনে করিল, সত্য সত্যই বুঝি বিবাহ দিয়া আনিতে যাইতেছে। ও দিকে সে গ্রামের একজন যুবকের সহিত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহাদের ঘরে বিবাহের আসর করিয়া রাখিবে এবং একটী বালককে স্ত্রীলোকের কাপড় পরাইয়া কন্যা সাজাইয়া রাখিবে। সেই কন্যার সহিত যথাসময়ে বিবাহ হইয়া যাইবে। তৎপরে শয়ন-গৃহে একটী খড় ও মৃন্নির্মিত কন্যামূর্তি শয্যাতে শয়ান রাখা হইবে। ঐ মূর্তির মস্তক ও দুই বাহু লৌহের তারের দ্বারা পার্শ্ববর্তী গৃহের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যেই শয্যাতে গিয়া বসিবেন, অমনি মৃন্ময়ী কন্যা উঠিয়া দুই বাহু বিস্তার করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিবে। পরামর্শ মত সমুদায় বন্দোবস্ত হইয়াছিল। যথাসময়ে পুরোহিত আসিল; কন্যা আসিল; এবং কন্যার ভ্রাতা কন্যাকর্তা হইয়া বিবাহ দিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাসর ঘরে গিয়া যেই বসিলেন, অমনি শয্যাতে শয়ান মৃন্ময়ী কন্যা উঠিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া শয্যার উপরেই নাচিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিশয় ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া দ্বার খুলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। আসিয়া দেখেন, যুবকদল করতালি দিয়া হাসিতেছে। তখন বুঝিলেন, যে সমুদায় প্রবঞ্চনা। তর্কভূষণ মহাশয় এই সংবাদ শুনিয়া যুবকদিগকে ডাকিয়া অনেক তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইহাদের পরোপকারপ্রবৃত্তির গুণে, গ্রামের লোকে এরূপ অনেক উপদ্রব সহ্য করিয়া থাকে।

ইহাদের আর একটা কীর্তির কথা বলিতে হইতেছে। ইহাদের সকলগুলিই ঔদরিক ও ভোজন-পটু। ইহারা একবার চৌদ্দ পনর জনে একত্র হইয়া কোনও

স্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। সেখানে পূর্ণমাত্রায় চর্ব, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, সর্ববিধ আহারের পর পনর জনে প্রায় বিশ সের মিঠাই খাইয়াছিল; তদবধি গ্রামের লোক ইহাদিগকে হাঁসের দল বলিত। ইহারা সেই নাম মঞ্জুর করিয়া লইয়াছে। একজন ইংরাজীশিক্ষিত যুবকের পরামর্শে, আপনাদের মধ্যে ঔদরিকতা ও ভোজন-পটুত্ব বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তিকে "সোয়ান" নাম দিয়াছে। সোয়ান পক্ষী রাজহংস অপেক্ষা সুন্দর ও বলবান; সুতরাং সোয়ান ইহাদের দলপতি। যেখানেই নিমন্ত্রণ হউক না কেন, সকলে যাউক আর না যাউক, সোয়ানকে যাইতেই হয়। ইহাদের নিয়ম এই, সকলগুলি একসঙ্গে আহার করিতে বসে; নিমন্ত্রণকর্তাকে সেরূপ বন্দোবস্ত করিতেই হয়। আহারে বসিবার পূর্বে "সোয়ান" দক্ষিণহস্ত হংস মুখাকৃতি ও ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, মুখে হংসের ন্যায় শব্দ করে। তাহাই ইহাদের আহ্বান-ধ্বনি। ভিড়ের মধ্যে যে যেখানে থাকুক, সোয়ানের ডাক শুনিলেই তৎক্ষণাৎ সকলে সমবেত হয় ও আহারে বসে। সোয়ানের নিম্নে দুই শ্রেণী আছে;—এক রাজহংস, অপর পাতিহাঁস। যাহারা ভোজন-শক্তিতে নিকৃষ্ট, তাহারাই পাতিহাঁস। আহারে সুদক্ষ বলিয়া একবৎসর হইল ইহারা গোবিন্দকে দলে ভর্তি করিয়া পাতিহাঁস করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মেম্বর হইতে হইলে দুইটী মাত্র গুণের প্রয়োজন; স্বভাবচরিত্র ভাল হওয়া চাই এবং ভোজনে পটুতা চাই। গোবিন্দের সে উভয় গুণই আছে।

এতদ্ভিন্ন ইহাদের রাজহংসের দলে একটী বিশেষ ব্যক্তি আছেন, তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাঁহার নাম "তাওক" বা "অষ্টাবক্র"। সকলে হয়ত ভাবিতেছেন, এ আবার কিরূপ নাম? ভিতরকার কথাটা এই, ইহার নাম তারক। তারকের জন্মগত কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। তাহার বুদ্ধিযোগ অতি অল্প। জন্মাবধি অঙ্গসন্ধির এরূপ শিথিলতা, যে তারক সোজা হইয়া ভাল করিয়া হাঁটিতে পারে না। হাঁটিতে গেলেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, দেহটা এক প্রকার হইয়া যায়। এজন্য গ্রামের অনেক লোকে তাহাকে অষ্টাবক্র বলে। এতদ্ভিন্ন তারকের কথা কহিতে গেলে লাল পড়ে, ও সকল কথা ভাল উচ্চারণ হয় না। কেহ তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "তাওক"। এজন্য যুবকদল তাহাকে "তাওক" বলিয়া ডাকিয়া থাকে। তাওক কি গুণে ইহাদের দলে আসিল? কেবল ভোজনশক্তির গুণে। তাওকের কুক্ষিটী যেমন সুদীর্ঘ, তেমনি সুবিশাল; সুতরাং অনেক দ্রব্য তাহাতে ধরে। এই কারণে যুবকদল তাহাকে হাঁসের দলে ভর্তি করিয়া লইয়াছে। কেবল তাহা নহে, এক বৎসরের মধ্যে রাজহংসের দলে প্রোমোশন দিয়াছে। তাওকের বুদ্ধিযোগ যে অত্যল্প, সেটী তাহার পৈতৃক সদ্গুণ। তাহার পিতা নবকান্ত রায় বুদ্ধিমত্তাগুণে গ্রামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন স্বরূপ অনেক গল্প গ্রামে প্রচলিত আছে। একবার নাকি নবকান্তের জননী তাঁহাকে বাজার করিবার জন্য পয়সা দিয়াছিলেন। এক হাতে মাছের পয়সা, অপর হাতে তরকারির পয়সা দিয়া, উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন, কি কত আনিতে হইবে। সর্বশেষে বলিয়া দিলেন, "মাছ ও তরকারি আলাদা করিয়া আনিও, মিশাইও না।" নবকান্ত বিজ্ঞতাসূচক গ্রীবাসঞ্চালন দ্বারা জানাইলেন, যে এত বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই পথ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মহা বিপদ উপস্থিত! আঁস পয়সা ও নিরামিষ পয়সা মিশিয়া গিয়াছে! অর্থাৎ দুই হাতের পয়সা ভুলক্রমে এক হাতে হইয়া গিয়াছে। আর একবার বাড়ীতে একটী অনুষ্ঠানের সময়

লোকাভাবনিবন্ধন নবকান্তের হাতে একটী টাকা দিয়া, তাঁহার পিতা বলিয়া দিলেন, "প্রথম হাটে তরিতরকারি ভাল পাওয়া যায়; শীঘ্র যাও, প্রথম হাটে ভাল তরিতরকারি যাহা দেখিবে, এক টাকার কিনিয়া আনিবে।" তাঁহার প্রতি যে এতটা বিশ্বাস স্থাপন করা হইল, ইহাতে সাতিশয় প্রীত হইয়া, নবকান্ত দুই হাত দুলাইয়া বাজারে চলিলেন; মনে মনে আশা করিয়া গেলেন, বিশ্বাসের উপযুক্ত কাজ সেদিন নিশ্চয় করিবেন। গিয়াই দেখেন, কুমারেরা এক বাজরা কলিকা নামাইয়াছে। অমনি প্রথম হাটের জিনিষ সেই এক বাজরা কলিকা ক্রয় করিয়া বাড়ীতে আসিলেন। পিতা দেখিয়া বলিলেন,—"হাঁ আবাগের বেটা ভূত! তরিতরকারি বল্‌তে কি কল্‌কে বুঝায়?"

"তাওক" সেই বুদ্ধিমানের সন্তান, সুতরাং তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য তদনুরূপ হইবারই কথা। তাওকের বুদ্ধিতে কতদূর হয়, তাহার কিন্তু পরীক্ষা হইল না। কেহ কখনও তাহাকে লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা করে নাই; করিলে শিখিতে পারিত কিনা, বলিতে পারি না। অনুমানে বোধ হয়, শিখিলেও শিখিতে পারিত; কারণ, এই যুবক দলের একজন তাওককে অনেক কষ্টে "ক" লিখিতে শিখাইয়াছে। সে গৌরবে তাওকের পা মাটিতে পড়ে না। কেহ তাহাকে "ক" লিখিতে বলিলেই দৌড়িয়া একখানা কয়লা কি একটা কিছু আনিয়া মৃত্তিকার উপরে প্রকাণ্ড এক "ক" লিখিয়া দেখায়; নিতান্ত যদি কয়লা কি অন্য কিছু না পায়, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা আকাশে "ক" লিখিতে আরম্ভ করে।

যাহা হউক, এই হাঁসের দল বর্তমান আষাঢ় মাসে ভূপেন্দ্রনাথ রায় নামক তাহাদের সঙ্গী একজন যুবকের বিবাহে বরযাত্র হইয়া কলিকাতায় যাইতেছে। রথের পূর্বদিন বিবাহ হইবে। ইহাদের পরামর্শ এই যে, ইহারা বিবাহের পরদিন কলিকাতাতে রথ দেখিবে, তৎপর দিন কালীঘাটে যাইবে, তৎপরে কয়েকদিন সহর দেখিয়া, উল্টা রথের সময় মাহেশের রথ দেখিয়া গ্রামে ফিরিবে। উত্তম আহার ও আমোদ করা ইহাদের কলিকাতা যাত্রার উদ্দেশ্য; সুতরাং তাওককে সঙ্গে লইয়াছে। গোবিন্দ, শিবচন্দ্রের হাতিবাগানের বাড়ী হইতে আসিয়া ইহাদের সঙ্গে যুটিয়াছে। তাওককে দেখিয়া সে বলিয়াছে,—"অষ্টাবক্রকে আনা ভাল হয় নাই; বিদেশে বড় বিভ্রাট ঘট্‌বে।" কিন্তু তখন আর বলিয়া কি হইবে? যুবকদল হাসিয়া তাহার কথা উড়াইয়া দিল; কিন্তু গোবিন্দের মনে একটু ভয় রহিল।

যথাসময়ে বিবাহসভায় বর ও বরযাত্রগণ উপস্থিত। হাঁসের দলের যুবকগণ অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝিতে পারিল, যে সহরের যুবকদিগের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে ও রসিকতাতে জয়লাভ করা তাহাদের পক্ষে সহজ নহে। সহরের যুবকগণ সকলেই ইংরাজীতে অভিজ্ঞ, দুই কথাতে পরাস্ত করিয়া দিবে। বেগতিক দেখিয়া হাঁসের দলের ইংরাজী-ভাষানভিজ্ঞ যুবকগণ আর আসরে বসিল না; ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। কেবল ইংরাজী শিক্ষিত কয়েকজন সহরের যুবকদিগের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু "তাওক" অকুতোভয়! সে সভামধ্যে গম্ভীর ভাবে বসিয়াছে। অবশেষে কন্যাপক্ষীয় একটী যুবক তাহার নিকট উপস্থিত।

প্রশ্ন। আপনি কি বরযাত্র?

তাওক। আমি বর নয়, বুপেন বর।

বেচারা তাওক বরযাত্র শব্দের অর্থ বর ভাবিয়াছে; সুতরাং প্রকৃত উত্তরই দিয়াছে। বরং এই বলিয়া তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়, যে তাহার এতটুকু

জ্ঞানও আছে যে ভূপেন সেদিনকার বর। কন্যাযাত্রীদিগের সাধ্য কি, সহসা তাওকের উত্তরের অর্থ গ্রহণ করে। আবার প্রশ্ন—"আপনার নাম কি?"

তাওক। আমা নাম তাওক।

এই কথা বলিতে এক ঝলক লাল পড়িয়া গেল। কন্যাপক্ষীয় যুবকটী এই উত্তর শুনিয়া, হাসিয়া সঙ্গিগণকে ডাকিয়া বলিল,—"ওরে ভাই এদিকে আয়, এখানে এক চীজ পাওয়া গেছে।" অমনি সকলে দৌড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইল। পুনরায় প্রশ্ন—"আপনার কে আছে?" তাওক উত্তর দিল, "আমা গউ আচে।"

এ কথাটারও টীকার প্রয়োজন। নশিপুরের বাড়ীতে তাওক সমস্ত দিন কি করে? তাহার একটী গরু আছে; সমস্ত দিন সেই গরুটী লইয়া থাকে। কখনও নাড়িয়া বাঁধিতেছে; কখনও গোয়ালে লইয়া যাইতেছে; কখনও খড় কাটিতেছে; কখনও খোল ভিজাইতেছে; সমস্ত দিন অন্য কর্ম নাই। বাস্তবিক গরুটী তাহার যেরূপ প্রিয়, তাহাতে জগতের মধ্যে তাহার আপনার লোক "গউ আছে" এ কথা বলা অন্যায় হয় নাই।

পুনরায় প্রশ্ন—"আপনি লেখা পড়া করেছেন?"

তাওক। আমি "ক" নিক্‌তে পাই। (পুনরায় লাল পতন)।

এই বলিয়া তাওক শূন্যে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা "ক" লিখিতে আরম্ভ করিল। ইহা দর্শন করিয়া সহরের যুবকগণ করতালি দিয়া অট্টহাস্য করিতে লাগিল।

গোবিন্দ আসরের দূরে দূরে ভ্রমণ করিতেছিল, এই হাস্যধ্বনিতে তাহার দৃষ্টি তাওকের দিকে আকৃষ্ট হইল। সে তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ হইয়া বলিল—"মহাশয় আপনারা ওকে ছেড়ে দিন, একটু দরকার আছে"; এই বলিয়া তাওকের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাওক কি যাইতে চায়! তাহার তখন "ক" লিখিবার ঝোঁক হইয়াছে; বিদ্যাটা না দেখাইয়া সে উঠিতে চায় না। গোবিন্দ তাহাকে বল-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বাহিরে লইয়া গেল, এবং আহারের পাত হওয়া পর্য্যন্ত সমগ্র সময় বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে লাগিল।

ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত। ছাতের উপরে আটচালা বাঁধিয়া আহারের স্থান হইয়াছে। হংসগণ "সোয়ানের" আহ্বানানুসারে ছাতের উপরে উপস্থিত। তাহাদের নিয়ম ছিল, সকলগুলি একত্রে বসিবে; বরকর্তা সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মহোৎসাহে আহার চলিল। সে বাড়ীর পুত্রদিগের নাম, বঙ্কিমচন্দ্র, জনজিৎলাল, চিরঞ্জীব ইত্যাদি। গৃহস্বামী বার বার পুত্রদিগকে ডাকিতেছেন,—"বঙ্কিম, জঞ্জিৎ, চিরঞ্জীব—এদিকে এস।" হাঁসের দলের একটী যুবক বলিয়া উঠিল, "ওহে ভাই! এ যে দেখি পিকিন, ন্যানকিন, ক্যাণ্টন।" ইহাতে ভোজন-কারীদিগের মধ্যে একটা হাস্যের রোল উঠিল। কন্যাকর্তা প্রবীণ লোক, যুবক-দিগের এ প্রকার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অপদস্থ হইয়া বলিলেন,—"এ ছেলেগুলি বুঝি বরযাত্র? বাঃ বেশ তৈয়ারি ছেলে ত। ভদ্রলোকের ছেলের এমন ইতরের মত ব্যবহার কেন?" এই কথা বলিয়া তিনি অন্যদিকে গমন করিলেন। গোবিন্দ সঙ্গীদিগের এই ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তোমরা অতি অসৎ; উনি অতি প্রবীণ লোক, বয়সে বাপের বড়; উঁহার প্রতি এই ব্যবহার কর্‌তে লজ্জা হলো না? যেমন কর্ম তেমনি ফল, বেশ হয়েছে, মুখের মত জুতো পেয়েছ; এমন জান্‌লে আমি তোমাদের সঙ্গে যুটতাম না।" ইহার পরে যুবকদল কন্যাকর্তার প্রতি ক্রোধ

করিয়া ক্ষতি করিবার মানসে আর এক ব্যাপার আরম্ভ করিল। পাত হইতে লুচি মিঠাই তুলিয়া পশ্চাৎদিকে ছাত হইতে নীচে ফেলিয়া দিতে লাগিল। তাহা লইয়া গোবিন্দের সহিত ঘোরতর বিবাদ হইল। অবশেষে কেহ লুচি কি মিঠাই দিতে আসিলেই গোবিন্দ বলে,—"আর লুচি মিঠাই দিবেন না। ওঁরা ছাত হ'তে পিছনে সমুদায় ফেলে দিচ্চেন।" সঙ্গী যুবকগণ গোবিন্দকে সমুচিত শিক্ষা দিবে বলিয়া শাসাইল; গোবিন্দ তাহা গ্রাহ্যই করিল না।

পরদিন রথযাত্রার দিন। প্রাতে আহারের সময় আবার একটা কাণ্ড হইয়া গেল। গোবিন্দ 'তারক'কে নিজের পার্শ্বে লইয়া বসিয়াছে; কি জানি কেহবা বিরক্ত করে। নির্বিঘ্নে আহার চলিয়াছে। যখন মৎস্য আসিতেছে, তখন অপর পার্শ্বের একটী যুবক তাওকের কাণে কাণে বলিল,—"তাওক, তুই মাছ খাস্‌নি। তোর খুকীর জ্বর দেখে এসেছিস্‌; তোর খুকীর জ্বর হ'লে কি তোর বৌ মাছ খায়?" তাওক মস্তক সঞ্চালন দ্বারা জানাইল, খায় না। যুবকটী বলিল,—"তবে তুইও মাছ খাস্‌নি।" তারকের দুর্বল মস্তকের মধ্যে এই একটা নূতন কথা প্রবেশ করিল। তাহার বুদ্ধি থাক, বা না থাক, একটা খুকী আছে। সে অনেকবার নিজ পত্নীকে কন্যার পীড়ার সময় মৎস্য আহার পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াছে; কিন্তু এ বিষয়ে যে তাহার কোনও বাধ্যতা আছে, সে কথা কখনও তাহার মনে উদয় হয় নাই। এখন সহজ ভাবেই বুঝিল বৌ যখন খায় না, তখন আমারও খাওয়া উচিত নয়। গোবিন্দ এ কথোপকথনের মর্ম কিছুই বুঝিতে পারিল না। তৎপরে যখন মৎস্য উপস্থিত, তারক কোনক্রমেই মৎস্য লইবে না। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল,—"কুকী বাল্‌সেচে।" "সোয়ান" বলিলেন,—"খুকী বাল্‌সেছে তা তোর কি? তুই মাছ খা।" তারক বলিল—"বৌ কায় না।" তখন ভোজের স্থল অট্টহাস্যের ধ্বনিতে ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল,—"ওমা, এমন মানুষেরও আবার খুকী আছে; কোন্‌ মেয়ের কপাল পুড়িয়েছে?" গোবিন্দ তাওকের কাণে কাণে অনেক বুঝাইল, তারক কোনক্রমেই মাছ খাইল না। অবশেষে গোবিন্দ অপর পার্শ্বস্থিত যুবকটীকে অনেক তিরস্কার করিতে লাগিল; এবং তৎপর দিনই তারককে লইয়া গ্রামে ফিরিবার ভয় দেখাইল।

সন্ধ্যার সময়ে হাঁসের দল রথ দেখিবার জন্য কলিকাতার রাজপথে বাহির হইল। তারক সঙ্গে আছে। গোবিন্দ তারককে বলিয়াছে,—"তাওক আমার চাদর ধরে থাকিস্‌, যেন ছাড়িস্‌নে।" তারক তদনুসারে গোবিন্দের চাদর ধরিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছে। ইতিমধ্যে মাড়েদের রূপার রথ উপস্থিত। সে রথ দেখিয়া কি আর তারক চাদর ধরিয়া থাকিতে পারে? কখন্‌ যে গোবিন্দের চাদর ছাড়িয়া দিয়া রূপার রথের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে, তাহা কেহ জানিতেও পারে নাই। বহুবাজারের চৌরাস্তার নিকটে গিয়া গোবিন্দ দেখিল, তারক পশ্চাতে নাই। একি সর্বনাশ! তাওক, তাওক! অষ্টাবক্র, অষ্টাবক্র! ভিড়ের মধ্যে কত ডাকাডাকি হইল; উত্তর নাই। উত্তর দিবে কে? তারক নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। কি করা যায়, গোবিন্দ ভাবিয়া আকুল। সঙ্গিগণ বিরক্ত হইয়া বলিল,—"মরুক বেটা বোকারাম, যেমন কর্ম তেমনি ফল। চাদর ছেড়ে দিয়ে গেল কেন?"

গোবিন্দ। আমি ত ঐ জন্যই বলেছিলাম, ওকে আনা ভাল হয় নাই। এখন কি করা যায়?

প্রথম যুবক। কি আর করা যাবে? এ ভিড়ে কোথায় খোঁজা যাবে? যেখানে

যাক, পুলিসের হাতে পড়্‌বেই, কাল খবর পাওয়া যাবে।

গোবিন্দ। সে কি হয়? এমন করে কি ফেলে যাওয়া যেতে পারে? সে কিছু বল্‌তেই পারবে না, মহাবিপদে পড়্‌বে।

দ্বিতীয় যুবক। একেবারে যে কিছু বল্‌তে পার্‌বে না, তা নয়; বিবাহ বাড়ীর ঠিকানাটা বল্‌লেও বল্‌তে পারে।

গোবিন্দ। হাঁ, সে আবার ঠিকানা বল্‌বে।

প্রথম যুবক। তবে তুমি কি কর্‌তে চাও?

গোবিন্দ। একবার খুঁজ্‌তে হচ্চে।

দ্বিতীয় যুবক। কোথায় খুঁজ্‌বে?

গোবিন্দ। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে, সেই রূপার রথখানার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। সেখানা কোন্‌ দিকে গেল, একবার দেখ্‌তে হচ্ছে।

প্রথম যুবক। সে রথ কাদের তা কি ক'রে জান্‌বে?

গোবিন্দ। সহরের লোক কি বলে দিতে পার্‌বে না? তোমরা বাসাতে যাও। আমি তার অন্বেষণে চল্‌লাম।

গোবিন্দ যদি চলিল, তবে আর একটী যুবকও তাহার সঙ্গ লইল। দুইজনে লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে জানবাজারে রাণী রাসমণির বাড়ীর অভিমুখে চলিল।

ওদিকে তারক রূপার রথের সঙ্গে সঙ্গে রাসমণির প্রাঙ্গণে উপস্থিত। তাহার অদ্ভূত গতি ও বিচিত্র ভাব দেখিয়া এক দল লোক তাহার চতুর্দিকে ঘিরিয়াছে। যতই প্রশ্ন করিতেছে, ততই হাস্যের তরঙ্গ উঠিতেছে; কোনও প্রশ্নের উত্তর বুঝিবার যো নাই। প্রশ্ন—তুমি কে? উত্তর—আমি তাওক।

প্রশ্ন। তোমাদের বাড়ী কোথা?

উত্তর। বেণীদেয় পুকুএ দাএ। (লাল পতন)।

বেচারা সত্য কথাই বলিয়াছে। নশিপুরে বেণী নামক একটী সমবয়স্ক যুবকের পুকুরের ধারে তাহাদের বাড়ী।

প্রশ্ন। কোন্‌ গ্রামে?

উত্তর। আমাদের গাঁয়ে। (লাল পতন)।

প্রশ্ন। সহরে কেন এসেছ?

উত্তর। বুপেন বয়, বিয়ে কএচে।

এটাও বেচারা ঠিক বলিয়াছে। তাহার ইহা স্মরণ আছে যে, ভূপেন বরের সহিত কলিকাতায় আসিয়াছে। ইহার অধিক আর সে কি বলিতে পারে?

এইরূপ কথোপকথন ও অট্টহাস্য চলিয়াছে, এমন সময় গোবিন্দ ও সঙ্গী যুবকটী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা তারককে সেই বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া গেল। পরদিন প্রাতে গোবিন্দ তারককে হাতিবাগানের বাসাতে লইয়া গেল, এবং যথাসময়ে নশিপুরে প্রেরণ করিল।

৭

একদিকে বর্ষার শেষ হইয়া শারদ-আকাশ যেমন প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করিল, অপর দিকে শারদীয় উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। এবারে ভুবনেশ্বরীর বিবাহে অনেক ব্যয় হইয়া যাওয়াতে তর্কভূষণ মহাশয়কে পূজার ব্যাপারটাতে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কিঞ্চিৎ ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া চলিতে হইতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কোনও অঙ্গের হানি হয় নাই। নিষ্ঠা এমনি একটী জিনিষ, ইহা যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই সুন্দর করে; ইহাতে মানবের কার্যের মধ্যে এমন এক আশ্চর্য প্রভাব উৎপন্ন করে, যাহা লোকের হৃদয়মনকে মুগ্ধ করিয়া সমুদায় কার্যকে সুশৃঙ্খল ও সুসম্পন্ন করিয়া দেয়। তর্কভূষণ মহাশয়ের ন্যায় নিষ্ঠাবান্ আস্তিক শাক্তের ভবনে দুর্গোৎসব যদি সুচারুরূপে সম্পন্ন না হয়, তবে কোথায় হইবে? পূজার এক মাস পূর্ব হইতেই পটুয়াগণ দেবী-মূর্তি গড়িতে আরম্ভ করিল। দিন দিন একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, আর পাড়ার বালক বালিকাদিগের দেখিবার একটী জিনিষ হইল। এদিকে বিজয়ার ভাঁড়ারে পূজার উপকরণসামগ্রী সকল সংগৃহীত হইতে লাগিল। ক্রমে পূজা উপস্থিত। আশ্বিনের শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূজার বোধন বসিল। তর্কভূষণ মহাশয় অগ্রেই পাড়ার একজন অনুগত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকে পূজার ভার দিয়াছিলেন; মনের কথা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ দক্ষিণাদি হিসাবে কিছু পাউক। শঙ্কর নিজে তন্ত্রধারকতা করিতে লাগিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় বিশেষ কিছু করিলেন না, কিন্তু সকলই করিলেন। তিনি পূজার কয়দিন পূজক ও তন্ত্রধারকদিগের সঙ্গে সমস্ত দিন উপবাসী রহিলেন। পরিধানে একখানি শুভ্রবর্ণ গরদ, গলে রুদ্রাক্ষের মালা, গাত্রে নামাবলী, ভক্তিতে উজ্জ্বল মুখ, উৎসাহে ও মানবপ্রীতিতে উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়, সে কয়দিন সে আকৃতি কি অপূর্ব ভাবই ধারণ করিল! যে হৃদয়ে পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা আছে, তাহাতে ভক্তির আবির্ভাব হইলে কি সুন্দরই দেখায়! এই কয় দিন তর্কভূষণ মহাশয় অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নানাহ্নিক সারিয়া লইতেন। তৎপরে সেই শুভ্রবর্ণ গরদখানি পরিয়া ও নামাবলীখানি গায়ে দিয়া সমুদায় কার্যের মধ্যে অবতীর্ণ হইতেন; ওদিকে বিজয়ার ভাঁড়ার হইতে এদিকে পূজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামগ্রী পর্যন্ত প্রত্যেক বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন; চণ্ডীপাঠের সময় ব্রাহ্মণদিগের সহিত সমবেত হইয়া কয়েক রূপ চণ্ডীপাঠ করিতেন; তৎপরে নৈবেদ্য সমুদায় বিভাগ করিয়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের ভবনে ভবনে প্রেরণ করা, লোকজন আসিলে আদর অভ্যর্থনা করা, প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত হইতেন। ঠাকুরদের ভোগ হইয়া গেলে যখন ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় হইত, তখন তিনি আহারস্থানে গিয়া, দণ্ডায়মান হইতেন ও প্রত্যেকের পাতের তত্ত্বাবধান করিতেন; ছাত্রগণ তাঁহার আদেশক্রমে পরিবেশন করিত। ব্রাহ্মণ-ভোজন হইয়া গেলে, বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণে চাষা লোক-দিকের পাত হইত। তর্কভূষণ মহাশয় তখনও গিয়া দণ্ডায়মান হইতেন ও প্রত্যেক পাতের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি সর্বদা বলিয়া থাকেন, "আহা, ওদের কেউ যত্ন করে খাওয়ায় না," সুতরাং তাঁহার ভবনে চাষালোকদিগের কিরূপ যত্নের সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। তিনি ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলোকদিগকে খাওয়ান অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে খাওয়াইয়া বরং অধিক সুখী হন। এরূপে সমস্ত দিনের পর রাত্রিকালের আরতি শেষ হইলে তবে

আহার করিতেন।

আরতির সময় তাঁহার সেই পবিত্র মুখশ্রী ভক্তিতে বিকশিত হইয়া কি ভাব ধারণ করিত, তাহার বর্ণনা হয় না। ধূপ-ধুনার গন্ধে দিক আমোদিত হইয়া যাইতেছে; চণ্ডীমণ্ডপখানি আলোক-মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব-শ্রী ধারণ করিয়াছে; প্রতিমার উভয় পার্শ্বে দুইজন ছাত্র ভক্তিসহকারে চামর ঢুলাইতেছে; আরতির পঞ্চপ্রদীপের আলোকমালা দেবীর নবরাগরঞ্জিত, উজ্জ্বল, চিত্রিত মুখের উপরে পড়িয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিতেছে; যেন জগদম্বা ভক্তগণের ভক্তি দেখিয়া ভাবে গদগদ হইতেছেন! ঢাক, ঢোল, কাড়া, কাঁসর, ঘণ্টা ও শঙ্খের ধ্বনিতে পাড়া কাঁপিয়া যাইতেছে! সেই ভক্তদলের মধ্যে তর্কভূষণ মহাশয় গলে নামাবলী দিয়া গলবস্ত্রে ও করযোড়ে দণ্ডায়মান; মুখে শব্দ নাই, নেত্রদ্বয় নিমীলিত; তৎপ্রান্ত দিয়া ভক্তি-অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। অনেক লোকে সন্ধ্যাকালে আরতি দেখা যত না হউক, তাঁহার সেই প্রেমোজ্জ্বল মুখ দেখিবার জন্য আসিত। অতিথি, অভ্যাগত, চাষাভূষা সকলেই তর্কভূষণ মহাশয়ের আতিথ্য, সৌজন্য ও আদর যত্নে আপ্যায়িত হইয়া যাইত।

এইরূপে পূজার ব্যাপার সমাধা হইয়া গেল। ক্রমে যথাসময়ে শ্যামাপূজা এবং জগদ্ধাত্রীপূজাও হইয়া গেল। পৌষমাস সমাগতপ্রায়; হৈমন্তিক ধান্য ঘরে আনিবার সময়। চাষার আনন্দের দিন, জমিদারের খাজনা পাইবার দিন, মহাজনের ঋণ আদায়ের দিন, বিধবা বেওয়া দুঃখিনীর ধান ভানিয়া দুই পয়সা উপার্জন করিবার দিন, দরিদ্র অনাথা, যে সম্বৎসর ভগ্ন ঘরে রৌদ্রবৃষ্টি ভোগ করিয়াছে, তাহার ঘরের চালে খড় দিবার দিন, ছেলেদের পৌষসংক্রান্তির পিঠেপুলির দিন, সকল দিন সন্নিকট হইতেছে। এ বৎসর ঈশ্বর-কৃপায় ফসল অতি উত্তম হইয়াছে। গ্রামে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহারই মুখ প্রফুল্ল। সকলেই বলে, "ভাই এবারে ফসলটা যে হয়েছে, কি আর বল্‌বো?" চাষা-গ্রামে কি ব্যস্ততাই লাগিয়াছে! মাঠের দিকে চাও, চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। কোনও ক্ষেত্রে পীতাভ সুপরিপক্ক ধান্য সকল চতুর্দিক ব্যাপিয়া রহিয়াছে; কোনও ক্ষেত্রে ধান কাটিয়া রাখিয়াছে; কোনও ক্ষেত্রে কাটা ধান গোছ বাঁধিতেছে; কোনও ক্ষেত্রে চাষারা গান করিতেছে, আর ধান কাটিতেছে; কোথাও বা ধান বহন করিতেছে।

এখন গ্রামে একটী মজুর পাওয়া ভার। সকলেই বলে—"আর মশাই ধান কাটা পড়িয়াছে।" চাষাগ্রামের পাঠশালা বন্ধ, ধানকাটা পড়িয়াছে। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা আবার ক্ষেত্রে কি করিবে? কেন, তাহাদের কি কাজ নাই? বাড়ীর বৃদ্ধাদের সহিত তাহারা কাটা ক্ষেতের পরিত্যক্ত ধানের শিশ সমুদায় কুড়াইতেছে। ইন্দুরদিগের সঙ্গে এ বিষয়ে মানুষের বিবাদ। ইন্দুরেরা সমস্ত রাত্রি শিশ বহন করিয়া গর্তের মধ্যে লইয়া যাইতেছে: বালকবালিকারা দিবাভাগে সেই গর্ত খুঁড়িয়া সেই শিশ বাহির করিয়া আনিতেছে। দরিদ্রদের নিকট এক একটী শিশের কি আদর! রাজারা বোধ হয় এত ব্যগ্রতা সহকারে হীরকের খনি খোঁড়ে না। বৃদ্ধারা বালকবালিকাদিগকে বলিতেছে—"দেখিস্, ভাল করে খুঁজিস্; এক একটী শিশ এক একটী লক্ষ্মী।" বাস্তবিক ধান্যের সহিত লক্ষ্মীর কিছু নিকট সম্বন্ধ আছে; পৌষমাসে বোধ হয় লক্ষ্মী ধান্য-বাহনে জগতে আসেন; এবার ত আসিয়াছেন; তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এদিকে তর্কভূষণ মহাশয়ের বাড়ীর পশ্চিম দিকের গোলার প্রাঙ্গণে স্তূপাকার

ধান আসিয়া পড়িয়াছে ও প্রতি ঘণ্টাতে আসিতেছে। একদিন প্রাতে তর্কভূষণ মহাশয় ছাত্রদিগকে পড়াইতে বসিবার পূর্বে গোয়ালবাড়ীতে একবার প্রবেশ করিয়াছেন। একটী ভৃত্য কয়েকদিন হইতে পীড়িত। কর্তা মহাশয়ের মুখে প্রকাশ নাই, কিন্তু ভৃত্যগুলিকে অতিশয় স্নেহ করেন। মাহিনার চাকর মাহিনা দিলেই তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ ফুরাইল, এভাবে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করেন না। তাহারাও মানুষ, তাহাদেরও সুখ দুঃখ আছে, কেবল দারিদ্র্যবশতঃ পরমুখাপেক্ষী, এটী তাঁহার সর্বদা স্মরণ থাকে। এইজন্য তিনি তাহাদিগকে বাড়ীর পরিবারের মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। তাহাদের ঘরগুলি সুপরিস্কৃত ও স্বাস্থ্যকর, আহারাদির ক্লেশ নাই; একটু অসুখ হইয়াছে জানিতে পারিলেই অমনি তাহার কাজ বন্ধ করিয়া দেন ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত করেন। তাহাদের পারিবারিক বিপদ আপদে কর্তা সর্বদাই মুক্তহস্ত। যে ভুবনেশ্বরীর বিবাহে, ভিন্ন গ্রামের দরিদ্র লোক পরিতুষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ভৃত্যগণ যে প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক পাইয়াছে, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। তর্কভূষণ মহাশয় তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদিগকে আনাইয়া সকলকে নূতন বস্ত্র দিয়াছেন এবং পিতল ও কাঁসার বাসন বিতরণ করিয়াছেন। যেমন কর্তা তেমনি গৃহিণী; ভবেশ যে তাঁহাকে মিছরির কুঁদো বলিয়াছিল, তাহা প্রকৃত কথা। এত প্রেম ও এত স্নেহ কি বিধাতা নারীহৃদয়ে দিয়াছেন; দাসদাসীগুলির আহার করিবার সময় একটু অতীত হইলেই কর্ত্রী ঠাকুরাণী টিক্‌টিক্‌ করিতে থাকেন,—"ওরে তোরা খা, ওরে তোরা খা।" তখন যদি কেহ তাহাদিগকে কোন কাজ করিতে বলে, তবে তিনি রাগিয়া উঠেন; বলেন— "তোমরা মানুষের মুখের দিকে চাও না, কেবল কাজটাই বোঝ।" সুতরাং এ বাড়ীতে ভৃত্যদিগের কি সুখ তাহা সকলে বুঝিতেই পারিতেছেন।

এই যে ভৃত্যটী পীড়িত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, অন্তঃপুর হইতে ঘন ঘন সংবাদ লওয়া হইতেছে; কর্ত্রী এবং বিজয়া অনেকবার আসিয়া দেখিয়া যাইতেছেন। কর্তাও প্রতিদিন দুইবার দেখিতেছেন। আজ প্রাতে আসিয়া তাহার হাত দেখিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—"কেমন রাম কেমন আছ?" সে বেচারা সমস্ত রাত্রি রোগযাতনায় ছট ফট করিতেছে, নিদ্রা হয় নাই, বড় যাতনা পাইয়াছে; তাঁহার এই সস্নেহ সম্ভাষণ শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু চক্ষুজল তিনি দেখিতে না পান, এইজন্য একটু মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কর্তা! রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই।" তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, "ঘুম না হবারই কথা, তোমার জ্বর যে বেড়েছে। আজ তোমাকে বাহির বাড়ীর পাশের ঘরে নিয়ে যেতে হবে।" এই বলিয়া বাহিরে আসিয়া মধুকে ডাকিয়া রাম চাকরকে সরাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, এমন সময় নরোত্তম ভট্টাচার্য নামক একজন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন,—"এস হে নরু ঠাকুর (নরোত্তম ভট্টাচার্য পাড়াতে নরু ঠাকুর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তর্কভূষণ মহাশয়ও আমোদ করিয়া তাঁহাকে নরু ঠাকুর বলিয়া ডাকিয়া থাকেন) খপর কি? অনেক দিন যে এদিকে এস নাই।"

নরু ঠাকুর। খপর আর কি, চিমে ঘোষের দৌরাত্ম্যে গ্রামে বাস করা ভার।

তর্কভূষণ। কেন, হয়েছে কি?

নরু ঠাকুর। সে দিন ক'টা ভাইয়ে পড়ে আমার ছেলেটাকে মেরেছে, শুনেছেন? বেটার এমনি অহঙ্কার, ব্রাহ্মণের ছেলের গায়ে হাত তুল্‌লে।

তর্কভূষণ। আরে সে কথা এখন রেখে দাও; হাত তোলা ত সামান্য কথা, যে দিন কাল দাঁড়াচ্চে, কবে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের মাথায় পা তুল্‌বে, তাই দেখ। হাঁ হাঁ শুনেছি বটে; তোমার ছেলেকে মার্‌লে কেন?

নরু ঠাকুর। আরে মশাই অতি সামান্য কারণ। ছেলেটা তাকে চিমে ঘোষ বলেছিল বলে, রাগ করে ভাই দুটোকে মারতে হুকুম দিলে।

তর্কভূষণ। তার নাম ত চিমু, তবে রাগ করে কেন?

নরু ঠাকুর। আজ্ঞে না, চিমে বল্‌লে হবে না। এদিকে ত পাতা-কুড়ুনীর ছেলে, হাতে দুটো টাকা হয়েছে কিনা, তাই ধরাকে সরা জ্ঞান হচ্চে। আর এখন চিমু বল্‌লে হবে না, শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কেদারেশ্বর ঘোষ বল্‌তে হবে।

তর্কভূষণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) চিমুটা বুঝি ওর ডাকনাম?

নরু ঠাকুর। আজ্ঞে হাঁ; আরে আঁটকুড়ীর পুত, তুই আজ হাতে দুটো টাকা পেয়ে, বুট জুতো পায়ে দিয়ে, টেরি কেটে দাঁড়ালেই কি সেই চিরদিনের চিমে ঘুচে যাবি?

তর্কভূষণ। যেন সে দিনের কথা মনে হচ্চে, ওর মা ঐ ছেলে কয়টী নিয়ে অতি দৈন্য দশায় দিন কাটাতো। যা হোক, কষ্টে সৃষ্টে ছেলে ক'টাকে একটু লেখাপড়া শেখালে, দুটাকা আন্‌তে শিখ্‌লো, ভালই হ'ল; লোকের উপর এত উপদ্রব কেন? ওদের বাপ হর ঘোষ ত মন্দ লোক ছিল না।

নরু ঠাকুর। সে বেঁচে থাক্‌লে বোধ হয় এমনটা হয়ে উঠ্‌তো না। নিমন্তক হলেই অনেক দোষ ঘটে। ওদের লেখা পড়ার মুখে ছাই। যেমন চিমে, তেমনি তার দুটো ভাই, যেন দুটো অসুর। লেখা পড়ার ফল ত এই দেখি, বামন দেবতা মানে না; হুটপাট করে বেড়ায়, যা তা খায়, দেশে যখন আসে, তখন জমিদার বাবুর বড় ছেলে জহরলালের সঙ্গে জুটে মদ খায়; ও যে কান্ডটা করে, তা যদি শোনেন কানে হাত দিতে হয়।

ষণ। এই শুন্‌তে পাই, রামহরি (জমিদার বাবুর নাম) ছেলেটীকে হিন্দু না কোথায় পড়িয়ে কৃতী করে এনেছে; বিষয় কর্ম তাকে বুঝিয়ে দেবে; তার স্বভাব চরিত্র বুঝি এই! আর সে যে ছেলে মানুষ, আমাদের হরের বয়সী হবে, চিমু তার সঙ্গে ইয়ারকী দেয়?

নরু ঠাকুর। সে লজ্জার কথা বলেন কেন? বয়সে বাপের বয়সী; বোধ হয়, পরের ছেলের মাথা খাওয়াতে একটা আমোদ আছে। বৈকালে চিমের দরজা দিয়ে কোনও দিন যদি যান, দেখ্‌তে পাবেন জহরলাল এসে যুটেছে।

তর্কভূষণ। জহরলাল এখানে এসে যোটে যে? রামহরির ভয়ে বাড়ীতে ইয়ারকিটা বুঝি ভাল চলে না?

নরু ঠাকুর। আপনার রামহরিরও মুখে আগুন; দেখেও দেখে না। সে কি জানে না, তার বাহির বাড়ীর বৈঠকখানায় কি কান্ড হয়?

তর্কভূষণ। জমিদার বাবুদের আশ্রয় পেয়ে বুঝি চিমুর এত প্রতাপ?

নরু ঠাকুর। তা বৈ কি? একে হাতে টাকা হয়েছে, তাতে বাবুরা সহায়, এখন হাতে মাথা কাট্‌তে চায়। আরে বাপু টাকা পেয়েছিস্‌, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খা, কেউ ত আর তোর টাকা কেড়ে খাবে না; লোকের উপর অত্যাচার কেন? কেবল যে আমার ছেলেটাকে মেরেছে, তা নয়; সেদিন একটা মেছুনী স্ত্রীলোককে মাছের দর নিয়ে তকরার করে, এমন মার্‌লে। অপরাধের মধ্যে সে

বলেছিল,—"মাছ আর কিনে খেতে হয় না। অমন ঢের ঢের বাবু দেখেছি; যাও, আমার মাছ দাও, আমি তোমাদের কাছে মাছ বেচ্‌ব না।" অমনি তার মাছের চুবড়ী উল্‌টে ফেলে দিয়ে গলাধাক্কা দিতে দিতে কটা ভেয়ে তাকে প্রায় দু তিন রসি পথ নিয়ে গেল।

তর্কভূষণ। জেলের মেয়েদের মুখটা কিন্তু বড় খারাপ, কিন্তু তা বলে অবলা স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলা কি উচিত? সে ত কাপুরুষের কাজ।

নরু ঠাকুর। আরে মশাই, হিন্দুর চামড়া গায়ে থাক্‌লে ত তা বুঝ্‌বে। ওদের হিন্দুর চামড়া বদ্‌লে গিয়েছে। ওদের মত কাপুরুষ আর ত দেখিনি।

তর্কভূষণ। তাই ত দেখ্‌ছি। আচ্ছা, চিমু যে হঠাৎ ফেঁপে উঠ্‌লো? অনেক টাকা কড়ি পায় বুঝি? কাজটা করে কি? শুন্‌তে পাই, বেশী লেখা পড়া ত শেখেনি।

নরু ঠাকুর। শুন্‌তে পাই, পল্‌টনদের রসদ যোগাবার কাজ পেয়েছে। তাতে নাকি দেদার চুরি। চুরি চামারি ক'রে কিছু টাকা করে আর কি?

তর্কভূষণ। কাজেই, তার ফল লোকের উপর উপদ্রব করা। যেমন যজ্ঞ তার দক্ষিণা ত সেইরূপ হওয়া উচিত।

নরু ঠাকুর। উপদ্রব ব'লে উপদ্রব; বাবু তিন মাসের ছুটী নিয়ে বাড়ীতে এসেছেন, বাড়ীর মধ্যে দুটী ঘর গাঁথাবেন ও বাগানের পাঁচীল দেওয়াবেন এই অভিপ্রায়। এসেই বেচারা নবে গোয়ালার এক কাঠা জমি কেড়ে নেবার যোগাড় করেছে। তাকি শুনেন নি?

তর্কভূষণ। হাঁ, শুনেছি, বাগানের পাঁচীলের ভিত কাট্‌বার সময় নবের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে; জোরে নাকি নবের জমি বাগানের ভিতর নিয়ে পাঁচীলের ভিত ফেলেছে। শঙ্কর নিজে দেখে এসে বলেছে, যে নবের প্রায় এক কাঠা জমি ঘিরে নিয়েছে। নীচ লোকের কি প্রবৃত্তি! এত টাকা পাচ্ছিস্‌, না হয় গরিবের এক কাঠা জমি কিনে নে। না বেচ্‌তে চায়, না হয় বাগানটা একটু বাঁকাই হলো। একি অত্যাচার!

নরু ঠাকুর। তেমনি হয়েছে; এই যে আস্‌বার সময় শুনে এলেম নবের মা প্রাতে উঠে উদ্দেশে গালাগালি দিচ্চে; নির্বংশ কর্‌চে। প্রাতঃকালে বেশ স্বস্তি-বাচন চলেছে।

তর্কভূষণ। চল্‌বে না! তারা গরিব লোক, আইন আদালত করে এমন সাধ্য নাই, কাজেই গায়ের জ্বালায় গালাগালি করে। মানুষটা অতি নচ্ছার! এদিকে দেখি বেশ ভিজে বেরালটীর মত। সেদিন পথে আমাকে ঢুক্‌ করে প্রণামটী কর্‌লে। আমি দাঁড়িয়ে দু চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করলাম। শেষে কথায় কথায় ঐ জমির উল্লেখ ক'রে বল্‌লাম, "ঈশ্বর ভাল দিন দিয়েছেন, লোকের উপর উপদ্রব করো না; তা হলে ধর্মে সবে না। গরিবের জমিটুকু ছেড়ে দিও।" তখন ত বেশ শিষ্ট শান্ত লোকের মত বল্‌লে—"মশাই যা শুনেছেন তা ঠিক নয়।"

নরু ঠাকুর। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী, আপনার উপদেশ ও পাষণ্ডের প্রাণে লাগ্‌বে কেন?

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে একজন পাড়ার লোক দৌড়িয়া আসিয়া বলিল,—"কর্তা শীগ্‌গির লোক পাঠিয়ে দিন; চিমে ঘোষ সদলে নবে গোয়ালার বাড়ীতে ঢুকে, নবের মাকে মেরে ফেল্‌লে; নবে ঘরে নেই, ধান কাট্‌তে গেছে।"

এই কথা যেই শোনা, অমনি তর্কভূষণ মহাশয়, "শঙ্কর একবার আয় তো" বলিয়া একটা ডাক দিয়া, নবের ঘরের দিকে ছুটিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ শঙ্কর, নরু ঠাকুর, ভৃত্য কয়জন ও ৩।৪ জন ছাত্রও ছুটিল। তর্কভূষণ মহাশয় নবের মার প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়াই দেখেন, চিমে ঘোষ বামহস্তে নবের মার চুলের মুটি ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে নিজের পায়ের চটিজুতা লইয়া বলিতেছে,—"হারামজাদি! আর গালাগালি দিবি? বল্ হয়েছে কি না? এখনি জুতিয়ে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেব। চিমের দুটী ভ্রাতা যেন দুটী যমদূত! তাদের একজন নবের মার দুই হাত ধরিয়া রাখিয়াছে, ও তাহাকে লাথি মারিতেছে; আর একজন এই অসহায়া স্ত্রীলোকের রক্ষার্থ সমাগত এক প্রতিবেশীর সহিত ঠেলাঠেলি করিতেছে। নবের মা প্রথম আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছিল; যে হাত ধরিয়াছে তাহাকে দংশন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে প্রহারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; এবং "বাবা গো, গেলাম গো! মলাম গো! কে কোথা আছ, বাঁচাও গো!" বলিয়া কাঁদিতেছে। তর্কভূষণ মহাশয় প্রবেশ করিয়াই সিংহ-বিক্রমে নবের মার চুলের মুটি হইতে চিমের হাত ছাড়াইয়া, তাহাকে এমন এক গলাধাক্কা দিলেন, যে, সে ৪।৫ হাত হটিয়া দেয়ালের গায়ে আঘাত প্রাপ্ত হইল। ওদিকে শঙ্কর অপর ভ্রাতাকে এমন সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়াছেন যে, সে "বাবা রে গিছি" বলিয়া অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। আর দুইজন ছাত্র তৃতীয় ভ্রাতাকে বলপূর্বক প্রাচীরের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়াছে।

তর্কভূষণ মহাশয় নবের মাকে ধরিয়া দাবাতে তুলিলেন। যেই তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার হস্তে রুধিরের ধারা পড়িল। জুতার আঘাতে তাহার মস্তক ফুটিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্রোধে আগুন হইয়া গেলেন; বলিলেন, "এরা আবার লেখা পড়া শিখেছে! এরা আবার ভদ্র-সন্তান! কাপুরুষ! অসহায়া স্ত্রীলোকের অঙ্গে এই প্রহার!"

ওদিকে একটী ছোট খাট দাঙ্গা বাধিয়াছে। চিমে ঘোষ তর্কভূষণ মহাশয়ের অর্ধচন্দ্রের ধাক্কাতে প্রথমে একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু সামলাইয়াই, "হতভাগা বেটা বামন, এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমার গায়ে হাত," বলিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু অমনি শঙ্করের সিংহ-গর্জন শুনিয়া ও চারিদিকের লোকের, "কি, এত বড় যোগ্যতা? মার্, মার্, পুতে ফেল্," প্রভৃতি শব্দ শুনিয়া সে সাহসটুকু অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পরে শঙ্কর যখন আবার অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া নবের মায়ের বাড়ী হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দিলেন, তখন আর বড় বিক্রম প্রকাশ করিতে পারিল না। কেবল মুখে বলিল, "আচ্ছা দেখ্বো।" শঙ্কর বলিলেন, "দেখিস্।"

ক্রমে কর্ত্তা মহাশয় নবের মাকে সুস্থ করিয়া স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। আজ প্রাতে ছাত্রদের অনধ্যায় গেল। তর্কভূষণ মহাশয় বাড়ীতে আসিয়া আর কিছুই বলিলেন না; যেন বিশেষ কিছু ঘটে নাই। দৈনিক গৃহকার্যে মনোযোগী হইলেন। কেবল মাত্র একবার বলিলেন,—"শুনেছিলাম ওরা লেখা পড়া শিখেছে, এই কি ওদের লেখা পড়া শেখার ফল?" এই বলিয়া তিনি রামা চাকরের পরিচর্যাতে নিযুক্ত হইলেন। চিমে ঘোষ ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয় কয়েক দিন শাসাইয়া বেড়াইতে লাগিল, যে, তর্কভূষণ মহাশয়কে ও তাঁহার পুত্রদিগকে মারিবে। সে কথায় এবাড়ীর কেহ কর্ণপাতও করিলেন না।

নবে গোয়ালা তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকটে পরামর্শ জানিতে আসিলে, তিনি বলিলেন, "বাপু! তুমি গরিব মানুষ, তুমি কি আইন আদালত করতে পারবে? শালিসিতে মেটাতে পারলে ভাল হয়; কিন্তু ওরা যে অকাল-কুষ্মান্ড, ওরা যে শালিসি গ্রাহ্য করে, এমন বোধ হয় না। কাজেই তোমাকে নালিশ করতে হবে। তা না হলে ওদের অত্যাচার থামবে না। যাও নালিশ কর গিয়ে।" পরামর্শ দিয়াই ভাবিলেন, নালিস করিতে যে পরামর্শ দিলেন, তার ব্যয় নির্বাহ কিপ্রকারে হইবে? জিজ্ঞাসা করিলেন, "খরচ পত্রের কি করবে?"

নবে। তাই ত ভাবনা।

তর্কভূষণ। তোমার মায়ের গহনাপত্র কিছু নেই? তাই বেচে ও ভদ্রলোকের কাছে ভিক্ষে শিক্ষে করে চালাও গে। আমি বাপু, তোমার এ সামান্য মোকদ্দমার খরচ দিতে পারতাম; কিন্তু তাতে তোমারই অনিষ্ট হবে। ওদের সঙ্গে আমাদের একটা মারামারি হয়েছে, আবার আদালতে যদি এ কথা প্রকাশ পায়, যে আমরা সমুদায় খরচ পত্র দিয়ে মামলা চালাচ্চি, তা হলে হাকিমদের ধারণা হবে এটা তোমার মোকদ্দমা নয়, আমাদেরি মোকদ্দমা। সে কথাটা ভাল নয়। তবে দশজন ভদ্রলোকে যেমন সাহায্য করবেন, তেমনি আমরাও সাহায্য করবো; তাতে কোন কথা হবে না।

ক্রমে ফৌজদারী আদালতে প্রথমে বাড়ী চড়াও হইয়া মারপিটের মোকদ্দমা উঠিল। চিমে ঘোষ কয়েক দিন বলিয়া বেড়াইল, যে তর্কভূষণ মহাশয়ের নামে ফৌজদারিতে মারপিটের নালিশ উপস্থিত করিবে। কিন্তু নালিস করিলেই, কোথায় মারপিট হইয়াছিল, কেন মারপিট হইয়াছিল, এই সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে তাহা পারিল না। শেষে নিজেরাই আসামী হইয়া আদালতে উপস্থিত হইল। প্রথম প্রথম তাহারা কয় ভ্রাতাতে অনেক আস্ফালন করিয়াছিল;—"কি হবে? মোকদ্দমা ফাঁসাইয়া দিব," ইত্যাদি। কিন্তু মোকদ্দমাটী যখন পাকিয়া দাঁড়াইল, তখন চিমু তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল; যাহাতে রফা হইয়া যায়। তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন নাই, যাহাদের মোকদ্দমা, রফা করিতে হয় তাহারা করিবে। এদিকে তিনি, শঙ্কর ও অপরাপর সাক্ষীদিগকে বলিয়া দিলেন,—"তোমরা সত্য বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না; এমন কি আমি যে চিমুকে গলাধাক্কা দিয়াছি, তোমরা যে তাহার ভাইদিগকে মারিয়াছ, তাহাও সমুদায় স্বীকার করিবে।" একজন বিষয়-বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন,—"যদি চিমে আপনার নামে নালিশ করে, তাহলে ত ঐ সব কথা প্রমাণ বলে গণ্য হবে।" শুনিয়া কর্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন;—"তা হোক, না হয় আমাদের কিছু সাজাই হবে, এমন কাজে কিছু সাজা হওয়াতে দুঃখ নেই; সত্যটা ঠিক বলা উচিত।" যথা সময়ে চিমে ঘোষের ১০০ একশত টাকা ও ভ্রাতৃদ্বয়ের পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা হইল। ভবিষ্যতে ভাল ব্যবহারের জন্য চিমে ১০০০ টাকা ও অপর দুইজনে ৫০০ শত টাকা করিয়া জামিন ও মুচলকা লিখিয়া দিয়া অব্যাহতি পাইল। চিমে ঘোষ বড় অপমানিত হইয়া বিষণ্ণ অন্তরে গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

ফৌজদারি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে, দেওয়ানীতে জমিকাড়ার মোকদ্দমা উঠিল। তাহাতেও চিমে পরাস্ত হইল। যে প্রাচীর গাঁথিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া

লইতে হইল। এই সকল কারণে চিমে ঘোষ তর্কভূষণ মহাশয় ও তাঁহার পরিবার-দিগের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া রহিল।

৮

দেখিতে দেখিতে আর কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। ১৮৫৩ সালের বৈশাখ মাস পড়িলেই বাড়ীতে কথা বসিল; এবং সমুদায় মাস কথা চলিল। ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাস উপস্থিত। ভুবনেশ্বরীর শ্বশুরবাড়ী হইতে পত্র লইয়া লোক আসিয়াছে; ভুবনকে শ্বশুরঘর করিবার জন্য পাঠাইতে হইবে। তর্কভূষণ মহাশয় উলোর রামরতন মুখুয্যের তৃতীয় পুত্রের সহিত ভুবনেশ্বরীর বিবাহ দিয়াছেন। রামরতন নিজে পণ্ডিত মানুষ নহেন, তবে সংস্কৃতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে। তাঁহার পুত্রটীর বয়স ১৭।১৮র অধিক হইবে না। সে গ্রামের এক চতুষ্পাঠীতে পড়িতেছে। অধ্যয়নে যে তার অধিক মনোযোগ আছে, বা কালে যে সে একজন কৃতী ও প্রতিষ্ঠাভাজন ব্যক্তি হইবে এরূপ লক্ষণ নহে। তথাপি তর্কভূষণ মহাশয় কৌলীন্যের অনুরোধে এবং প্রথম দুই পুত্র উপযুক্ত ও কর্মক্ষম হইয়াছে শুনিয়া মুখুয্যে মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথকে কন্যাটী সম্প্রদান করিয়াছেন। রামরতনের প্রথম দুই পুত্র, কাজচালানরূপ ইংরাজী শিখিয়া, কলিকাতাতে বিষয়কর্মে নিযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম, রাজেন্দ্রনাথ, কিছু অধিক কৃতবিদ্য এবং অপেক্ষাকৃত বড় বেতনের চাকুরী করে। মধ্যমটী, ব্রজেন্দ্রনাথ অধিক লেখা পড়া শিখিতে পারে নাই; সে সামান্য একটী শিপ্-সরকারী কর্মে নিযুক্ত আছে; এবং তাহাতে তাহার দুই দশ টাকা উপরি লাভও হইয়া থাকে; উভয় ভ্রাতাতে কলিকাতায় এক বাসাতে থাকে; এবং তাহাদের আয়ের দ্বারা মুখুয্যে মহাশয়ের সংসার এক প্রকার সুখেই চলিয়া যায়। ব্রাহ্মণ বাস্তবিক অতিশয় ভাল মানুষ; এবং স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ ভীরু। বাড়ীর মধ্যে তিনি নামে কর্তা; যে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই করে; তিনি বাধা দিতে পারেন না। তাঁহার সংসারে, এক গৃহিণী, চারিটী পুত্র ও তিনটী কন্যা ও দুই পুত্র-বধূ; তাহার মধ্যে দুইটী পুত্র কলিকাতায় থাকে; একটী কন্যা যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরেই হইয়াছে, সে বিবাহিতা হইয়া পতিগৃহে আছে; অপর দুইটী কন্যা ও চতুর্থ পুত্রটী গৃহেই আছে; প্রথম দুইটী পুত্রের বধূ গৃহেই আছে; এবং তৃতীয় পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথের বধূকে আনিতে লোক পাঠান হইয়াছে।

দুই দিন হইল, ভুবনেশ্বরীকে লইবার জন্য লোক আসিয়াছে। ভুবনেশ্বরী সর্বকনিষ্ঠা কন্যা ও তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার সন্তান বলিয়া শাস্ত্রে ও লোকাচারে যতদিন অবিবাহিত রাখিতে দেয়, তর্কভূষণ মহাশয় ততদিন তাহাকে অবিবাহিত রাখিয়াছিলেন। গৃহিণী সর্বদা বলিতেন,—"মেয়ে বিয়ে দিলেই ত পরের ঘরে যাবে, যতদিন কোলের কাছে থাকে থাক।" তিনিও সেই কথা মঞ্জুর করিয়া ভুবনকে দশম বর্ষের শেষ পর্যন্ত বিবাহ দেন নাই। দশম বর্ষের শেষে বিবাহ হয়, সুতরাং এখন তাহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ পার হইয়া দ্বাদশ বর্ষে পড়িতে যাইতেছে। এইবার ভুবনকে শ্বশুরঘর করিবার জন্য পাঠাইতে হইবে। বস্তুতঃ

এখনও তাহাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা ছিল না। তর্কভূষণ মহাশয় সন্তানগুলিকে অতিশয় স্নেহ করেন; বিশেষ, ভুবন তাঁহার শেষ অবস্থার কন্যা। তাঁহার মনের ভাবটা এই, "তাড়াতাড়ি বৌ বাড়ীতে লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি? ছেলে একটু কৃতী হইলে ও বৌ একটু বড় হইলে আনাই ভাল।" এই কারণেই প্রায় দুই বৎসরের অধিক কাল ভবেশের বিবাহ হইয়াছে, তথাপি তিনি সর্বকনিষ্ঠ বধূটিকে নিজ ভবনে আনিতেছেন না। বাটীর মেয়েরা আনিবার প্রস্তাব করিলেই বলিয়া থাকেন, "আহা, থাক্, যতদিন মা বাপের কাছে থাকে থাক্। একদিন আস্‌বেই ত, এত তাড়াতাড়ি কেন?" ভুবনের শ্বশুরের পত্র পাইয়া তর্কভূষণ মহাশয় প্রথমে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে তাহাকে অন্ততঃ আর এক বৎসর পাঠাইবেন না; এবং বৈবাহিককে সেই মর্মে পত্রোত্তর লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সে প্রস্তাব গ্রাহ্য না করিয়া লোক পাঠাইয়াছেন। রামরতন মুখুজ্যে মহাশয় পত্রে লিখিয়াছেন, তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে কার্য করিতে তাঁহার নিজের অসম্মতি ছিল না; কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা অর্থাৎ গৃহিণী কোনরূপেই সম্মত হইলেন না। সেজন্য লোক প্রেরণ করা হইল।

ভুবনের যাওয়ার বিষয়ে তাঁহার মনের মধ্যে একটা কিছু স্থির না থাকাতে তর্কভূষণ মহাশয় এতদিন তদুপযোগী কোনও আয়োজন করেন নাই। এখনও এক এক বার ভাবিতেছেন লোক ফিরাইয়া দিবেন। কিন্তু এখন তাঁহার একজন পরামর্শ দিবার লোক হইয়াছে। বিজয়ার বুদ্ধি বিবেচনার উপরে তাঁহার এমনি আস্থা, যে বিজয়া নশিপুরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি তাহার পরামর্শ না লইয়া তিনি গৃহস্থালীর কোন কাজই করেন না। এজন্য তাঁহার স্কন্ধের ভার যেন অনেকটা কমিয়াছে। দুই একদিন ইতস্ততঃ করিয়া কর্তা অবশেষে ভাবিলেন বিজয়া যেরূপ পরামর্শ দিবেন তদনুরূপ কাজ করিবেন। তদনুসারে একদিন মাধ্যাহ্নিক আহারের পর, নিজের শয়নগৃহে বিজয়াকে ডাকাইয়া, দুই ভ্রাতা ভগিনীতে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

তর্কভূষণ। বিজয়া! ভুবনকে নিতে ত লোক এল, কি করি বল দেখি। এত তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া কেন? আর কিছুদিন থাক্‌লে ভাল হতো না?

বিজয়া। সে ত আমরা বুঝি, তারা ত বোঝে না।

তর্কভূষণ। আমাদের সে কালে বেশ নিয়ম ছিল, পঠদ্দশাতে বিবাহ কর্‌বার রীতি ছিল না, সকলকে ব্রহ্মচর্যে থাক্‌তে হত। এখন আমরা লোকাচারের বশবর্তী হয়ে পড়েছি। লোকাচারের অনুরোধে বাল্যকালেই ছেলেদের বিবাহ দিতে হয়, তাই না হয় দেও, তাড়াতাড়ি বৌগুলিকে বাড়ীতে আনা কেন? বিশেষ ভুবন কখনও একটী দিনের জন্যে বাড়ী ছেড়ে থাকে নাই। আমি বৈবাহিক মহাশয়কে লিখ্‌লাম, কিন্তু কৈ তা ত শুন্‌লেন না।

বিজয়া। লোকের মুখে শুনি তোমার বেয়াইটী সাক্ষীগোপাল; গিন্নীটী নাকি বড় দুর্দান্ত, এটা গিন্নীরই কাজ।

তর্কভূষণ। এখন কি করা উচিত? এক একবার ভাব্‌ছি লোকটা ফিরিয়ে দি।

বিজয়া। তা হয় না, ভুবনের শাশুড়ী বড় সহজ লোক নন; তা হলে গোড়া হতেই একটা বিবাদ বাধ্‌লো। যদি গোড়া হতেই একটা মনান্তর আরম্ভ হয়, তা হলে ভুবনের আর কষ্টের অবধি থাক্‌বে না। আমাদের কি, আমরা ত দেখ্‌তে

শ্বশুরবাড়ীতে যাব না; কিন্তু ও বেচারির প্রাণটা যাবে।

তর্কভূষণ। ঠিক বলেছ, এ যাত্রা না পাঠালে একটা মনান্তর আরম্ভ হবে। দূর হোক, পাঠানই যাক্। কিন্তু তার মত আয়োজন ত কিছু করি নাই।

বিজয়া। আয়োজন করতে কদিন লাগে? তুমি একটা ভাল দিন দেখ, আয়োজনের সবই ত প্রায় ঘরে আছে; অবশিষ্ট যা দরকার যোগাড় করে দেওয়া যাচ্ছে।

দুই ভ্রাতা ভগিনীতে পরামর্শ করিয়া ভুবনের যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। উলোর লোককে ৪।৫ দিন বসাইয়া রাখা হইল। তর্কভূষণ মহাশয় পঞ্জিকা দেখিয়া একটী শুভদিন স্থির করিলেন। এ দিকে নূতন সংসারে প্রবেশ করিতে যে কিছু দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন হয়, তাহার সমুদায় সংগৃহীত হইল। তর্কভূষণ মহাশয় বিবাহের সময় যে বরসজ্জা দিয়াছিলেন তাহা ত স্বতন্ত্র; আবার নূতন করিয়া থালা, ঘটী, বাটী, গাড়ু, ডাবর, সিন্দুক, পেটরা, ইস্তক শিল, নোড়া যাঁতা পর্যন্ত সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করিলেন না। আর ত তাঁহাকে পতিগৃহে কন্যা প্রেরণ করিতে হইবে না! ভুবনকে দিয়াই শেষ! তদ্ভিন্ন তাঁহার মনে মনে একটী সংকল্প আছে, তাহা এখনও কাহাকেও ভাঙ্গিয়া বলেন নাই; সেটী এই, ভুবনকে সংসারধর্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া এবং গ্রামের দরিদ্র লোকদের হিতার্থে গ্রামের পার্শ্বে একটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া, তিনি কাশীবাসী হইবেন। সুতরাং ভুবনকে পতিগৃহে পাঠাইবার সময় মনের সাধ মিটাইয়া জিনিষ-পত্র দিবেন, তাহার মত আয়োজন করিতেছেন। আয়োজন করিতেছেন এবং মনে মনে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের সেই কবিতার শেষ চরণটী স্মরণ করিতেছেন,—"পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ।"

ক্রমে ভুবনের যাত্রার আয়োজন সাঙ্গ হইল। মায়ের কোল ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই চিন্তায় ভুবনেশ্বরী, লোক আসিবার দিন হইতে, কাঁদিতেছে। অন্নজল এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছে। বাড়ীর বৃদ্ধারা কত বুঝাইতেছেন! বলিতেছেন,—"মেয়েছেলে হলেই পরের ঘরে যেতে হয়। ওই দেখ্ অমুক শ্বশুর ঘর করে পুরোণো হয়ে এল, অমুক তোর সঙ্গে কাল খেলা করেছে, সে শ্বশুরঘর কর্‌তে গেল; ভয় কি আবার পূজার সময় আস্‌বি," ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কোনও উপদেশে, কোন দৃষ্টান্তে, ভুবনেশ্বরীর প্রাণে শান্তি আসিতেছে না। দর দর ধারে তাহার মুখে শতধারা বহিতেছে! তাহার মুখখানি বাসি ফুলের ন্যায় ম্লান হইয়া গিয়াছে। কয়েক দিন আর মায়ের অঞ্চল ছাড়িতেছে না। জননী যেখানে যান সেখানেই সঙ্গে আছে। গৃহিণী বুঝাইবেন কি, তনয়া-বিচ্ছেদ-শোকে তাঁহার প্রাণ অধীর হইয়া যাইতেছে। কোনও কাজেই যেন তাঁহার হাত উঠিতেছে না।

ক্রমে ভুবনের যাত্রার দিন উপস্থিত। ভুবনের ব্যাকুলতা ও রোদন দেখিয়া সকলের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তর্কভূষণ মহাশয় ত্বরা দিবার জন্য আসিলেন; ভুবন তাঁহার চরণে পড়িয়া অধিক কিছুই বলিতে পারিল না; কেবল "বাবা! বাবা! ও বাবা গো!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তনয়ার সেই ভাব দর্শনে তর্কভূষণ মহাশয়ের অন্তরে প্রবল শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল; কিন্তু "তারা দুর্গে! দুর্গতিহারিণি!" বলিয়া সে আবেগটা চাপিয়া ফেলিলেন; ভুবনকে তুলিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বার বার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন; এবং বলিলেন, "মা কেঁদ না, যাও, পূজার সময়ে তোমাকে আন্‌বো।"

ভুবন জননীর, বিজয়ার, বিধবাদিগের ও বধূদিগের চরণে পড়িয়া কতই কাঁদিল! তৎপরে কাঁদিতে কাঁদিতে পতিগৃহের অভিমুখে যাত্রা করিল; ৫।৭ জন ভারি সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী লইয়া সঙ্গে যাত্রা করিল; গৃহিণী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন! ভুবন চলিয়া গেল, তর্কভূষণ মহাশয়ের গৃহে বিষন্নতা পড়িয়া রহিল।

এদিকে উলোর বাড়ীতে, রামরতন মুখুয্যে মহাশয়ের ভবনে, সকলে নূতন বৌএর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ক্রমে নূতন বৌ আসিয়া উপস্থিত। মুখুয্যে ঠাকুরাণী দ্বার হইতে বৌকে আদর পূর্বক লইয়া গেলেন; কোলে বসাইলেন; অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্বক মুখ দেখিলেন; এক বৎসরে কিরূপ হইয়াছে দেখিলেন; রূপগুণের অনেক প্রশংসা করিলেন; সমাগতা প্রতিবেশিনী বৃদ্ধাদিগকে প্রণাম করাইলেন; এবং মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেবল দুই জনের সে আনন্দ ভাল লাগিল না। গৃহের প্রথম দুইটী বধূ দুই ভাবে এই আনন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। বড় বৌ মনে মনে হাসিয়া বলিল,—"ও আনন্দ কত দিন!" মেজবৌ শাশুড়ীর প্রিয়, তাঁহার অনুগ্রহ চিরদিন ভোগ করিবার জন্য সর্বদা আত্ম-গোপন করিয়া তাঁহার মন যোগাইয়া চলে, ও নানা প্রকারে তোষামোদ করে। সে দেখিল এতদিনের পর শাশুড়ীর স্নেহের একজন অংশী আসিয়া জুটিল। তাহার চক্ষে অদ্যকার দৃশ্যটা যেন ভাল লাগিতেছে না। তাহার যেন মনে হইতেছে, তাহার একটা শত্রু আসিয়া জুটিল। যাহা হউক, এ সকল ভাব শাশুড়ী কিছুই জানিলেন না। মুখুয্যে মহাশয়ের গৃহের কাজকর্ম পূর্ববৎ চলিল।

দুই দিনের মধ্যেই ভুবনেশ্বরী বুঝিতে পারিল, যে, যে গৃহে সে বর্দ্ধিত হইয়াছে, যে পরিবারের সুস্নিগ্ধ ছায়াতে চিরদিন বাস করিয়াছে, তাহার সহিত এ পরিবারের কোনও সাদৃশ্য নাই। তাহার আসার দুই দিনের মধ্যেই একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে ভুবনেশ্বরীর মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। একদিন প্রাতে বাজারের পয়সা দিবার সময় গৃহিণী মুখুয্যে মহাশয়কে, অতি সামান্য কারণে, কতকগুলি অযথা তিরস্কার ও অভদ্র কটূক্তি করিলেন। অন্য লোক হইলে ক্রোধে অগ্নিপ্রায় হইয়া উঠিত; মুখুয্যে মহাশয় একটু বিরক্ত হইয়া কেবলমাত্র বলিলেন, "আঃ কি কর, রাগ করবার কথাটা কি হলো?" ভুবনেশ্বরী সরলা বালিকা, সে কোনও দিন আপনার মাতাকে স্বীয় পতির প্রতি ওরূপ ব্যবহার করিতে দেখে নাই; সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বড়বৌকে বলিল,—"উনি ঠাকুরকে অমন কথা বল্লেন। আমার মা আমার বাবাকে কোনও দিন অমন কথা বলেন না।" তাহাতে বড়বৌ হাসিয়া বলিল,—"থাক বোন্! আরও কত দেখ্বে। সাম্লে চলো; বড় শক্ত জায়গায় পড়েছ।" আর অধিক বলিতে সাহস করিল না; কারণ মেজবৌ সেখানে ছিল। আর অধিক বলিবারই বা প্রয়োজন কি? শাশুড়ী স্নান করিয়া আসিবামাত্র মেজবৌ সেই কথাগুলি তাঁহার কর্ণে তুলিয়া দিল। তখন বড়বৌ রন্ধনশালাতে রন্ধন করিতেছিল। শাশুড়ী শুনিয়া তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরিবর্তন করিয়াই রন্ধনশালাতে উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন;—"ও অসতের ঝাড়, নতুন বৌটী এসেছে, অমনি তার মাথাটী খাবার জন্যে লেগেছ? তার কানে বিষমন্ত্র ঢাল্‌চ?" বড়বৌ যতদিন বালিকা ছিল ততদিন অনেক গঞ্জনা সহ্য করিয়াছে, এখন সে ছেলেপিলের মা, তাহার পতি উপার্জক, আর সে পূর্বের ন্যায় কথা সহ্য করে না; সে ফিরিয়া বলিল, "কি বিষমন্ত্র ঢাল্‌লাম?"

শ্বশ্রূ। ওই কাঁচ মেয়ে কাল এসেছে, ওকে ভয় দেখান হয়েছে "শক্ত জায়গা পড়েছ।"

বড়বৌ। শক্ত জায়গা নয়? ও তো অল্প বলেছি, রাক্ষসের মুখে পড়েছ বল্‌লে ঠিক হতো।

শাশুড়ী। কেন রে আবাগীর সন্তান! কি রাক্ষসের কাজটা করেছি? তোর বাপ ভেয়ের মাথা খেয়েছি, নয়? তোর সেই শাদা শশা বাপ্‌টার ও দুটো পাঁচ ভেয়ের মাথা কড়্‌মড়্‌ করে চিব্‌য়ে খেয়েছি, নয়?

বড়বৌ। কথায় কথায় বাপ ভাই তুলোনা বল্‌ছি, বাপ ভাই সকলের সমান। নিজের বাপ ভেয়ের মাথা খেয়ে বুঝি সন্তুষ্ট নও, তাই অন্যের বাপ ভেয়ের মাথা খেতে চাও?

শাশুড়ী। কি, এত বড় আস্পর্ধা! ঐ উনোনকাঁধাতে মুখটা ঘষে দেব জান না।

বড়বৌ। হুঃ, আর ঘষে দিতে হয় না, আর খুকীটী নেই যে উঠ্‌তে ঠোনা বস্‌তে ঠোনা দেবে; এ মেজবৌ পাওনি যে খোষামোদ করে করে বেড়াবে; গালি দেও, গালি খাবে।

শ্বশ্রূ দেখিলেন, গতিক ভাল নয়, আক্রমণ করিলে হাতাহাতির সম্ভাবনা, কাজেই ততদূর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। বলিলেন—"যা, তোরে আর পিণ্ডী রাঁধ্‌তে হবে না! এই ত ছেন্দাভক্তি, আবার পিণ্ডী রাঁধ্‌তে বসেছেন।"

বড়বৌ। বয়েই গেল! ছেন্দাভক্তির কাজ কর্‌লেই ছেন্দাভক্তি পায়।

গৃহিণী জ্যেষ্ঠা বধূর হাত হইতে ভাতের কাটিটী কাড়িয়া লইলেন। বৌটি বাহিরে আসিয়া মেজবৌকে দেখিয়া বলিল—"অমনি কথাটী কুট করে লাগিয়েছ কি লাভটা হলো?" এই বলিয়া নিজ গৃহে গিয়া নিজ সন্তানকে স্তন্য দান করিতে বসিল। ভুবনেশ্বরী একেবারে অবাক্! সে একবার মেজবৌকে বলিল,—"ছি ছি তোমার প্রকৃতি ত বড় মন্দ; তুমি কথাটা ঠাক্‌রুণের কাণে তুল্‌লে কেন?" মেজবৌ কিছু বলিল না; কেবল গোচোরের মত চাহিয়া রহিল। কিয়ৎপরে পরে ভুবন বড় বৌএর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। বড়বৌএর মন তখনও গরম। সে বলিল—"যাও তুমি বোন্‌! আমার কাছে এস না।" সে বেচারী অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া আসিল। একবার ভাবিল বলি, "আমি ত লাগাই নাই," আবার সে ইচ্ছাকে দমন করিল। আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য কিছু বলা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ক্রমে পাকশাক সমাধা হইল; সকলেই আহার করিল; বড়বৌ আহার করিল না। গৃহিণী তাহার অন্ন ব্যঞ্জন বাড়িয়া, চাপা দিয়া রাখিয়া, মুখে তামাকপোড়া গুল দিয়া, নিজ গৃহে গিয়া শয়ন করিলেন।

শাশুড়ী বৌএর যে বিবাদ একটু দেখা গেল, এরূপ ব্যাপার প্রায় প্রতিদিন হইত। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যাতে, গৃহিণীর ক্ষুরধারসমান রসনার আর বিশ্রাম ছিল না। সর্বদাই চলিতেছে! হয় কর্তার প্রতি, না হয় প্রতিবেশীর প্রতি, না হয় বধূদিগের প্রতি, সর্বদাই অগ্নি উদ্গিরণ করিতেছে।

ভুবনেশ্বরী এ গৃহে বড় ভয়ে ভয়ে বাস করিতে লাগিল। সে অসুখ হইলে বলে না; মুখটী মুদিয়া সকল কাজ করে; সর্বদা আজ্ঞাবহ থাকে; অথচ শ্বশ্রূর তোষামোদ করে না, বা মনস্তুষ্টি সাধনার্থে কিছু বলে না বা করে না। শ্বশ্রূ তাহার বড় একটা কিছু অপরাধ পান না। কিন্তু মেজবৌটী তাহারও নামে

লাগাইতে ছাড়ে না। শ্বশুর সে সকল কথাতে কর্ণপাত করেন না, বরং এক এক দিন বিরক্ত হইয়া বলেন—"যা, যা, তোর চর্‌কায় গিয়ে তুই তেল দে; অন্যে কে কি করে না করে তা তোকে দেখ্‌তে হবে না।"

এইরূপে দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। মেজবৌ দেখিল, ছোটবৌএর প্রশংসা শাশুড়ীর মুখে ধরে না; সর্বদা বলেন, "কেমন লোকের মেয়ে, হবে না? মুখে কথাটী নেই।" এই সকল প্রশংসাতে মেজবৌএর গায়ে যেন তপ্ত জলের ছড়া দেয়। অবশেষে মেজবৌ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিল। মেয়েটীর বয়ঃক্রম চতুর্দশ কি পঞ্চদশের অধিক হইবে না; কিন্তু ইতিমধ্যে দুষ্টামিতে পরিপক্ক হইয়াছে। চুরিবিদ্যাতে বেশ দক্ষ। ভুবনেশ্বরীর আসিবার কিছুদিন পূর্বে কয়েকবার শ্বশুরের ও বড়বৌএর শয্যার তল হইতে টাকা পয়সা চুরি করিয়াছিল। সে জন্য অনেক অনুসন্ধান হয়। কিন্তু মেজবৌ শাশুড়ীর প্রিয়পাত্র; কাহার সাধ্য তাহাকে সন্দেহ করে? সে সময়ে কিছু দিনের জন্য বাড়ীতে একটা ঝি ছিল, সকলের সন্দেহ তাহার উপরেই পড়িল; সুতরাং তাহাকে গালাগালি দিয়া, অপমান করিয়া, তাড়াইয়া দেওয়া হইল।

এবার মেজবৌ আর এক খেলা খেলিয়াছে। একদিন মুখুয্যে মহাশয় অসাবধানতা বশতঃ বাক্‌সের চাবিটি ফেলিয়া স্নান করিতে গিয়াছেন, ইতাবসরে মেজবৌ তাঁহার বাক্‌স খুলিয়া তিনটী টাকা চুরি করিল। এবার চুরি করিয়া আর নিজের বাক্‌সে রাখিল না; ভাবিল, সে চুরি ভুবনেশ্বরীর স্কন্ধে চাপাইয়া তাহাকে শ্বশুরের বিশ্বাস ও স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিবে। এই পরামর্শ করিয়া দুপুরবেলা আহারের পর, একটা কি দেখিবার ছল করিয়া, ভুবনেশ্বরীর নিকট হইতে তাহার বাক্‌সের চাবি চাহিয়া লইল। বাক্‌সটী খুলিয়া টাকা তিনটী রাখিয়া আবার চাবিটী ফিরাইয়া দিল। ভুবনের মনে কোনও সন্দেহ নাই; সুতরাং সমস্তদিনের মধ্যে আর বাক্‌স খোলে নাই। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে মুখুয্যে মহাশয় নিজের বাক্‌স খুলিয়া দেখেন, টাকা তিনটী নাই। অমনি বলিয়া উঠিলেন—"আমার বাক্‌স থেকে তিন্‌টে টাকা নিলে কে?" গৃহিণী প্রথমে বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ ওখানেই আছে।"

কর্তা। না গো, থাক্‌লে আর আমি বলি?

গৃহিণী। বাঃ, তোমার কাছে রৈল চাবি, টাকা নেবে কে?

কর্তা। না গো, স্নান কর্‌তে যাবার সময় চাবিটা ভুলে তক্তার উপরে ফেলে গিয়েছিলাম।

গৃহিণী। তাই যেন গেলে, নেবে কে? আর ত পুঁটীর মা নেই, যে, সন্দেহ করবে; তবে দেখ কিসে বুঝি খরচ করে ফেলেছ।

কর্তা। (কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবে) না না, খরচ করিনি! এই সকালে টাকা তিনটে দেখ্‌লাম, কোথায় গেল?

ভুবনেশ্বরী সরলা বালিকা, সে কিছুই জানে না; শ্বশ্রূকে কাণে কাণে বলিল, —"উনি বালিশের তলাতে মাঝে মাঝে টাকা পয়সা রাখেন, বালিশের তলাটা দেখ্‌তে বল দেখি।"

গৃহিণী। ওগো, তোমার বালিশের তলাটা দেখ দেখি।

কর্তা। (দেখিয়া) কৈ না, এখানেও নেই; বালিশের তলাতে থাক্‌বে কেন? আমার বেশ মনে আছে, বাক্‌সে ছিল।

ইতিমধ্যে ভুবনেশ্বরী অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া শ্বশুরের কাগজপত্রের হাত বাক্সটী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে গেল। ইত্যবসরে মেজবৌ শাশুড়ীর কানে কানে বলিল,—"আমি ছোট বৌএর বাক্স আজ খুলেছিলাম, তাতে তিনটে টাব দেখেছি।" শাশুড়ী চুপে চুপে বলিলেন,—"দূর, ও বড় ঘরের মেয়ে, ওর অম বুদ্ধি হবে কেন? তোর দেখ্বার ভুল হয়েছে?"

মেজবৌ। না গো, তোমার দিব্বি, আমি টাকা দেখেছি। তুমি বরং চাবি চেয়ে খুলে দেখ।

গৃহিণী ভাবিতে লাগিলেন, হঠাৎ কিরূপে সন্দেহটা করেন ও বাক্সের চাবি চান। অবশেষে একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তবে এই বৌ বেটীদের বাক্স আমা দেখ্তে হচ্চে।" প্রথমে মেজবৌএর বাক্স খুলিয়া দেখিলেন। ভুবনেশ্বর উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছে, তাহার চাবি চাহিলে দিবে; কারণ সে নিশ্চ জানে, তাহার বাক্সে গুটিকতক পয়সা ভিন্ন আর কিছুই নাই। অবশেষে শ্বশ্র যখন চাবি চাহিলেন, তখন সে ব্যগ্রতা সহকারে চাবি দিল, এবং শ্বশ্রূ যখ খুলিতেছেন, তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল;—"কি দেখ্বে, গোটাকতক পয়সা বই আর কিছু নাই।" গৃহিণী খুলিয়াই তিনটী টাকা দেখিলেন। দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া ভুবনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি গো?" ভুবনও অতিশয় বিস্মিত হইল; কিছুই বলিল না।

গৃহিণী। একি তোমার বাপের বাড়ীর টাকা?

ভুবন। (ধীর ভাবে) না, বাপের বাড়ীর কোনও টাকা ছিল না।

গৃহিণী। তবে তোমার বাক্সে এ টাকা কোথা হতে এল?

ভুবন। জানি না।

গৃহিণী। (কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া) তোমার বাক্স, তোমার হাতে চাবি, তুমি জান না, সে কি রকম?

ভুবনের একবার ইচ্ছা হইল, বলে, যে মেজবৌ তাহার চাবি নিয়ে বা খুলেছিল, সেত রাখিতে পারে; কিন্তু এমন কথা বলিতে বা ভাবিতে তাহার সাহ হইল না। সে নিশ্চয় জানিত, তাহার বাক্সে টাকা ছিল না, তথাপি টাকা কি প্রকারে আসিল? তবে কি ছিল অথচ সে জানিত না? তিনটী টাকা কি প্রকারে আসিল যাহা হারাইয়াছে, সেই টাকাই কেন তাহার বাক্সে পাওয়া গেল? তবে কি মেজবৌ এর কর্ম? না না, তাইবা কেন হবে? এইরূপ নানা চিন্তায় আন্দোলিত হই ভুবনেশ্বরী আর কিছুই বলিতে পারিল না।

গৃহিণী। কথা কচ্চো না যে? ওমা এইটুকু মেয়ের এত চালাকি! বাক্সে মধ্যে টাকাগুলি রেখে, শ্বশুরের মন রাখবার জন্যে কেমন পাঁচ জায়গায় খুঁজ্‌ছি দেখ! হা কপাল! আমি ভাবছিলাম, মেয়েটী ভাল, মুখটী বুজিয়ে থাকে; এ দেখি মুখ বুজিয়ে লঙ্কায় আগুন দিতে পারে! আমি বল্‌ছিলাম, বড়ঘরে মেয়ে, ওর কি এমন প্রবৃত্তি হয়? এ যে দেখি বড় ঘরের মেয়ের প্রবৃত্তি বেশ!

ভুবনের কথা কহিবার যে কিছু সম্ভাবনা ছিল, তাহা একবারেই গেল তাহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে কেহ কিছু অপমানে কথা বলিলে বা তাহার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিলে, সে একেবারে পাষাণের ম হইয়া যায়। তার পর, মার, কাট, রক্তপাত কর, অস্থিমাংস পিষিয়া দেও; না রা

া গঙ্গা। পিত্রালয়ে কেহ কিছু অপমান করিলে অনেক সময় এই ভাব দেখা যাইত। সে কখনও মিথ্যা বলিত না, কিন্তু আত্ম-পক্ষ-সমর্থনের জন্য একটী কথাও বলিত না, অপরাধ স্বীকারও করিত না। নশিপুরে থাকিতে একদিন শঙ্কর ক্রোধ করিয়া তাহাকে একটা ঘরে বন্ধ করিয়াছিলেন; সে সমস্ত দিন বন্ধ ছিল; একবার কাঁদিলও না, ডাকিলও না; দ্বার খুলিতে অনুরোধও করিল না। সন্ধ্যার সময় শঙ্কর দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর করবি?" উত্তর নাই, কেবল তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল; যেন পাষাণের মূর্তি! শঙ্কর বলিলেন, "বাপরে, ধন্যি মেয়ে!"

আজ আবার ভুবনেশ্বরী পাষাণের মূর্তি হইয়া গেল। গৃহিণী বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কোনও উত্তর নাই; উত্তর যাহা দিবার তাহা ত দিয়াছে—"জানি না." আবার কি বলিবে? অবশেষে কর্ত্রী অতিশয় বিরক্ত হইয়া অনেক গালাগালি দিতে দিতে বাহির হইয়া গেলেন। মেজবৌ তাহার ইষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে ভাবিয়া মনে মনে আনন্দ করিতে লাগিল। কিন্তু ভুবনের সাজা এখানেই শেষ হইল না। রাত্রে জ্ঞানেন্দ্র বাড়ী আসিলে গৃহিণী চুরির বিবরণ তাহাকে অবগত করিলেন। সে গোঁয়ার, অশিক্ষিত বালক, সে আবার বেচারিকে অনেক নিগ্রহ করিল। সে যদি মাতার কথাতে হঠাৎ বিশ্বাস না করিয়া একটু ভালবাসার সহিত বৃত্তান্তটা জানিবার জন্য চেষ্টা করিত, তাহা হইলে বোধ হয় দুটা একটা কথা পাইত; হয় ত মেজবৌএর চাবি লওয়ার ও বাক্স খোলার বৃত্তান্তটা শুনিতে পাইত, ও সমস্যার প্রকৃত উত্তর ধরিতে পারিত. কিন্তু তাহার হৃদয়ে ঐ বালিকাটীর প্রতি প্রেম থাকিলে ত সেরূপ করিবে? সে সে পথেই গেল না; একেবারে ভুবনকে দোষী করিয়া অনেক তিরস্কার আরম্ভ করিল। অবশেষে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভুবন তাহার প্রকৃতি অনুসারে নিরুত্তর। সকলেই বলে, মৌনং সম্মতি লক্ষণং, কিছু বলিবার নাই কাজেই মৌনী; চুরির ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ কি? জ্ঞানেন্দ্র পাষাণ-প্রতিমার সেই মৌনভাব দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া গেল; এবং তাহার গলা টিপিয়া, তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া, দ্বার বন্ধ করিল। অন্য বালিকা হইলে ক্রন্দন করিত, ভয় পাইত, শাশুড়ীর দ্বারে গিয়া ঠেলিত, অন্ততঃ জ্যেষ্ঠা বধূর ঘরে গিয়া ডাকিত, কিন্তু এ বালিকা সে শ্রেণীর নয়; কাঁদিল না, ডাকিল না, নড়িল না; সমস্ত রাত্রি দাবার এক পার্শ্বে অন্ধকারে বসিয়া রহিল; পরদিন কাহাকে কিছু বলিল না; কেহ কিছু জানিতেও পারিল না।

এই সময় হইতে ভুবনেশ্বরী শ্বশ্রূর বিষনয়নে পড়িয়া গেল। নড়িতে চড়িতে কাজের একটু ত্রুটি হইলেই গালাগালি খায়; এবং ঠোনাটা ঠানাটাও চলে; কিন্তু ভুবনের মুখেও রব নাই, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন নাই; সুতরাং পাড়ার কেহ জানিতে পারে না। সে মুখটি মুদিয়া, যাহা আদেশ হয়, পালন করিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন প্রতিদিন প্রায় রাত্রে জ্ঞানেন্দ্রের নিকট তিরস্কার সহ্য করে। জ্ঞানেন্দ্র বালক বটে, কিন্তু যখন শয়ন-ঘরে যায়, তখন আর বালক থাকে না; তখন কর্তাব্যক্তি হইয়া পড়ে; এবং মনে করে যে, মেয়ে মানুষকে শাসন না করিলে ভাল থাকে না; সুতরাং তখন সেই বালিকাকে তিরস্কার করে ও শাসন করে। ভুবনের মুখে রব নাই; ভিতরে সিংহীর বিক্রম আছে; কিন্তু মুখে পাষাণ চাপা। সে তিরস্কার, কানমলা, গলাধাক্কা প্রভৃতি সহ্য করিয়া থাকে; মনে মনে ভাবে স্ত্রীলোকের বিবাহ হওয়া ভাল নয়; এবং এবার পিত্রালয়ে গেলে আর আসিব না।

পূজার পূর্বে আর দুইবার টাকা পয়সা চুরি গেল। দ্বিতীয়বার শাশুড়ী ভুবনের বাক্স খুলিলেন, টাকা পাইলেন না; বলিলেন,—"একবার ঠকেচে আর কি রাখে?" এইবারেও ভুবনেশ্বরী পাষাণ প্রতিমা। এবারে শাশুড়ী ক্রোধ করিয়া তাহার ঘাড় ধরিয়া মাটীতে মুখ ঘষিয়া দিলেন; ভুবন কাঁদিল না; বা, উঃ আঃ করিল না। তৃতীয় বারের চুরির সময়ে ভুবন অনেক নিগ্রহ সহ্য করিল; জ্ঞানেন্দ্রের হস্তে প্রহার খাইল; কিন্তু নিরুত্তর। ভুবনের উপর দিয়া যে এত ব্যাপার যাইতেছে তাহা কেহ জানে না। পূজার সময় ভবেশ আসিয়া ভুবনকে বাড়ীতে লইয়া গেল। ভবেশ ভুবনের শাশুড়ীর নিকট হইতে ভুবনের চোর অপবাদের কথা শুনিয়া গেল; কিন্তু নশিপুরের কেহই তাহা বিশ্বাস করিল না। সকলেই বলিল ঐ মেজবৌটারই কর্ম্ম। ভিতরে আর যে সমুদায় নিগ্রহের দৃষ্টান্ত রহিল, তাহা তখন কাহাকেও বলিল না; কেবল গোপনে মাতাকে ও বিজয়াকে বলিয়াছিল।

৯

একজন দয়ালু ও পরোপকারী ব্যক্তি একবার তাঁহার বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, জগতে সর্বাপেক্ষা দুঃখী কে?" কেহ বলিলেন, "যাহার ভার্যা মনোমত নহে, সেই সর্বাপেক্ষা দুঃখী"; কেহ বলিলেন, "যে পুত্রকন্যার উদরে যথাসময়ে অন্ন দিতে পারে না, সেই সর্বাপেক্ষা দুঃখী;" কেহ বলিলেন, "যে পরের আশ্রিত ও পরমুখাপেক্ষী, সেই দুঃখী।" অবশেষে প্রশ্নকর্তা বলিলেন, "যাহার দয়া আছে, তিনি সর্বাপেক্ষা দুঃখী; কারণ সকলের দুঃখ তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়।" এ কথা সত্য। ইহার আর একটী নিদর্শন আবার উপস্থিত। নবে গোয়ালার মোকদ্দমার শেষ হইতে না হইতে, একদিন তর্কভূষণ মহাশয় সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে একাকী বসিয়া আছেন, সমন সময়ে কৈলাস চক্রবর্তী নামক একজন ব্রাহ্মণ আসিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় একাকী ছিলেন, কথা কহিবার একটী লোক পাইয়া প্রীত হইলেন; বলিলেন—"এস হে কৈলাস, এ কয় দিন দেখিনি যে!" কৈলাসের মুখ অতি বিষন্ন; যেন কোনও গুরুতর ক্লেশ মনের মধ্যে রহিয়াছে। তর্কভূষণ মহাশয় প্রথম প্রথম ততদূর লক্ষ্য করেন নাই; কিঞ্চিৎ পরেই বলিলেন,—"কেন হে, তোমার মুখটা যেন মলিন মলিন দেখ্‌ছি; ব্যাপারটা কি?"

কৈলাস। একটু নিরালয়ে কথা আছে।

তর্কভূষণ। এই ত নিরালয়, কেউ ত নাই; বল না; কেউ আসে যদি, বারণ করে দেব।

কৈলাস বলিবার উপক্রমেই কাঁদিয়া অধীর হইলেন; এবং আপনার দুই হস্তে মুখ আবরণ করিয়া বালকের ন্যায় ফুলিতে লাগিলেন। কর্তা প্রথমে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল মৌনী থাকিলেন; পরিশেষে স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া কৈলাসের স্কন্ধে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া মিষ্টবাক্যে অনেক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, "একি! হয়েছে কি? কাঁদ কেন, স্থির হও, স্থির হও।" কিয়ৎক্ষণ রোদনের পর কৈলাস বলিলেন—"কর্তা, আমার সর্বনাশ হয়েছে।"

তর্কভূষণ। সে কি, কি হয়েছে?

কৈলাস। মেয়েটা আমার মুখ ডুবিয়েছে! আর দেশে থাক্‌তে দিলে না। আবার ফুলিয়া ক্রন্দন)

তর্কভূষণ। রসো, কেঁদনা, আমি আগে বুঝি; তোমার সেই বিধবা মেয়ে নিস্তারিণী? তার বয়স হলো কত?

কৈলাস। আজ্ঞে, ঊনিশ বিশ বৎসর হবে।

তর্কভূষণ। তার এমন দুর্মতি হলো কেন?

কৈলাস। আজ্ঞে, কি করে জান্‌বো?

তর্কভূষণ। কার সঙ্গে?

কৈলাস। আজ্ঞে, জমিদার বাবুর বড় ছেলে জহরলালের সঙ্গে!

তর্কভূষণ। এই না শুন্‌লাম, কল্‌কেতার হাটখোলার দত্তদের বাড়ীতে তার দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা হচ্চে।

কৈলাস। আজ্ঞে হাঁ।

তর্কভূষণ। এরূপ ঘটনা ঘটলো কি করে? (কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবে) এ তোমার পরিবারের দোষ। মায়ে মেয়ে সাম্‌লাতে পারে না?

কৈলাস। আজ্ঞে, আমরা বুঝবো কেমন করে? আমরা মনে করতাম, আমাদের যদু তার একবয়সি, যদুর সঙ্গে বন্ধুতা আছে, তাই বুঝি আমাদের উপর এত টান; বাটীতে প্রায় আসে, যদুকে সর্বদা ডেকে নিয়ে যায়।

তর্কভূষণ। (অতিশয় বিরক্তির সহিত), ওঃ এত দূর গড়িয়েছিল! সংসারে এতদিন বাস কর্‌লে, বুড়ো হয়ে গেলে, এটা মনে যোগালো না, যে, তোমরা হলে গরিব, তারা হলো বড় মানুষ, তোমরা বামন পণ্ডিত মানুষ, তারা বিষয়ী লোক, তোমাদের সঙ্গে তাদের এত আত্মীয়তা কেন? আর তুমিই যেন আহাম্মোক, তোমার গিন্নীটী কিরূপ? তিনি কি বুঝতে পারলেন না?

কৈলাস। আজ্ঞে, দুষ্টলোকে কত মায়া ধরে, সব কি বোঝা যায়? ছিদেমের ভগ্নী কামিনী প্রায় প্রতিদিন বেড়াতে আস্‌তো; নিস্তারের চুল বেঁধে দিত; বল্‌তো,—"জেঠাই মা, নিস্তারকে একটু আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাই, সন্ধ্যে হলে গল্পগাছা করে আবার রেখে যাব"; বলে নিস্তারকে নিয়ে যেত।

তর্কভূষণ। (বিস্মিত ভাবে) তবেই বুঝ্‌তে পারা গেছে; আরে সে কামিনী যে একটা বিখ্যাত মেয়ে, সকলের মুখে তার নিন্দা শুনি। তোমাদের কানে কি সে সব কথা ওঠেনি? এরূপ সঙ্গে কি মেয়ে ছেড়ে দিতে হয়?

কৈলাস। আজ্ঞে, উঠেছিল বৈ কি? তবে কি করা যায়, জ্ঞাতি, এক পাড়াতে বাস, এক ঘর বল্‌লেই হয়, কি করে বারণ করা যায়।

তর্কভূষণ। হলোই বা জ্ঞাতি,—'না আমাদের নিস্তার যাবে না' বল্‌লে কি মাথাটা কেটে ফেল্‌তো? না হয় তাদের সঙ্গে একটু মনান্তর হতো, এ জ্বালাটা ত পোহাতে হতো না। আর বলবে কি, অসৎ সঙ্গের যা দোষ তাই ঘটেছে। তবে ত এ কথা গ্রামে রাষ্ট্র হলো বলে। আমার খুব সন্দেহ হচ্চে, তোমার স্ত্রীর জ্ঞাতসারে এ সব কাজ হয়েছে। গরিব হলে অনেক দুর্মতিই ঘটে থাকে! কিছু প্রাপ্তি টাপ্তির লোভে পড়েছিলে বুঝি।

কৈলাস। আজ্ঞে না, স্বরূপতঃ বল্‌ছি আমার পরিবার কিছু জান্‌তো না। তবে প্রাপ্তির কথা যদি বল্‌লেন, তবে একটা কথা বলা উচিত; ঐ জহরলাল

আমাদের যদুর সঙ্গে বন্ধুতার ছল করে আজ মাছটা, কাল দুকাঁদি কলা, পরশ ফলটা পাকড়্টা পাঠাত; আমরা ত ভিতরের কথা জান্তাম না, কাজেই নিতাম।

তর্কভূষণ। তবে আর বাকি কি ছিল? এতেও চক্ষু ফুট্লো না? (বিরক্তি সহিত) যাও যাও, মিছে কেন আর পরামর্শ নিতে এসেছ? যেমন কর্ম তেমনি ফল! যাও আম কাঁঠাল খাওগে, এবং কর্মফল ভোগ করগে।

তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া কৈলাস ক্ষণকাল নিস্তব্ধ। তর্কভূষণ মহাশয় এক নিমিষের মধ্যে শান্ত হইলেন। বড় শক্ত কথাটা বলিয়াছেন বলিয়া একটু দুঃখ হইল। আবার সস্নেহে কৈলাসের স্কন্ধে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোক জানাজানি হয়নি ত?"

কৈলাস। আজ্ঞে না; গৃহিণী জানেন, আমি জানি, আর আপনাকে বল্লাম।

তর্কভূষণ। এখন কি কর্বে মনে করছ?

কৈলাস। সেই পরামর্শ জান্তেই ত আপনার কাছে এসেছি। তবে গৃহিণী বলেন, দুরকম হতে পারে; এক মেয়েটাকে কাশীতে দিয়ে আসা, সেখানে ভিক্ষে শিক্ষে করে কোনও প্রকারে চালাবে; দ্বিতীয়, অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—সকলে এরূপ স্থলে যা করে।

তর্কভূষণ। ছি ছি! অমন কথা যদি মুখে উচ্চারণ কর, তবে আমার এখানে আর এস না। ওরূপ কিছু করেছ যদি শুন্তে পাই, এ জীবনে আর তোমার মুখ দর্শন কর্বো না। তোমার গিন্নীর এমন বুদ্ধি না হলে এ দশা হবে কেন পাপ দিয়ে পাপ ঢাকা! তারপর তোমার মেয়েটা দক্ষিণ পাড়ার সদীর মত দেশের একটা কলঙ্ক, ও দেশের ছেলে নষ্ট কর্বার একটা গুরুমশাই হয়ে থাক্। তুমি বুড়ো দশায় ঐহিক পারত্রিক উভয় সদ্গতি হতে বঞ্চিত হও। ওরূপ কথা আর দ্বিতীয়বার মুখে এন না।

কৈলাস। কাশীতে দিয়ে এলে হয় না?

তর্কভূষণ। কাশীতে কোথায় দিয়ে আসবে? সেখানে কি তোমাদের আত্মীয় কেউ আছে? তারা কি দয়া করে মেয়েটাকে জায়গা দেবে?

কৈলাস। তা ত কেউ নাই। কত কত বিধবা ত সেখানে পড়ে থাকে; কোথাও এক জায়গায় পড়ে থাক্বে, আর ভিক্ষে মেগে খাবে।

তর্কভূষণ। সোজা কথায় বল না কেন, বাজারে দাঁড়াবে।

কৈলাস। আজ্ঞে, তা বৈ কি?

তর্কভূষণ। তুমি মুখ দিয়ে এমন কথা বল্লে কি করে! তুমি কি ও মেয়েটার জন্মদাতা নও? ওকে কি কোলে পিঠে করে মানুষ করনি? এমন কথাটা বল কোন্ প্রাণে? তুমি জন্মদাতা পিতা হয়ে, মেয়েটাকে বাজারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আসবে? তোমার মেয়ে বাজারে ঘর কর্বে, রাস্তায় দাঁড়াবে, পিতা হয়ে সেটা প্রাণেই বা সবে কিরূপে? কানেই বা শুন্বে কিরূপে?

কৈলাস। আজ্ঞে, তা ত সত্যি! তবে কিনা সে বাজারে দাঁড়াতে আর বাকি কি রেখেছে?

তর্কভূষণ। এমন করে কথাগুলো বল্ছো, যেন আর কারু মেয়ে। তার অপরাধ কি? জান ত বাপু "বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।" সে অত অল্পমতি বালিকা, তাতে আবার তোমাদের মত অকর্মণ্য মা বাপ, দুষ্ট লোকের চক্রান্তে পড়্লে ওরূপ শিশুর ঠিক থাকা কি সহজ? কাজটা করেছে মহাপাপ

তাতে সন্দেহ নাই; তবে কিনা সাজাটা দেবার সময় একটু দয়ার চোখেও ত দেখতে হবে।

কৈলাস। তা বৈ কি? তবে মহাশয়ের পরামর্শ কি?

তর্কভূষণ। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) আমার পরামর্শ যদি শোন, তুমি ও তোমার গৃহিণী মেয়েটাকে নিয়ে তীর্থযাত্রাতে বাহির হও। বৌ বেটা ঘরে থাক। তীর্থ পর্যটনে অনেকের মন ফিরে যায়; মেয়েটারও মন ফিরে যেতে পারে। তারপর যথাসময়ে তার শরীরটা শুদ্ধ করে নেবার জন্য একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেওয়া যাবে।

কৈলাস। আর একটার ভাবনা যে আছে।

তর্কভূষণ। তাকে কোনও অন্ত্যজ জাতির লোকের হাতে দেওয়া যাবে, কিছু কিছু খরচ দিলেই পালন করবে।

কৈলাস। তা যেন বুঝ্‌লাম, খরচ দেবে কে? আমার দশা ত মশাইএর অবিদিত নেই।

তর্কভূষণ। সেই ত শক্ত কথা। তার একটা উপায় ভেবে বার্ কর্‌তে হবে।

কৈলাস। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা মেয়েটার শরীরশুদ্ধির কথা যে বল্‌লেন, সে শরীরশুদ্ধির ফল কি? তাকে নিয়ে কি আর চলা যাবে?

তর্কভূষণ। নাই বা চল্‌লে, ক্রিয়াকর্মের সময় তার হাতে ভাতের থালাটা নাই বা দিলে, রেঁধে দুমুটো তোমাদিগকে নাই বা দিল? পাপ হতে ত বাঁচল, চক্ষের উপরে ত রইল, সেই ঢের। তবে বোধ হয় এর পরে আর তাকে এখানে রাখা ভাল হবে না; তার পর বরং তাকে অন্য কোনও স্থানে কাহারও আশ্রয়ে দিয়ে এস। তাকে একটু আশ্রয় দিতে পারে, হাঁড়ি কলসির বাইরে রেখেও এক-মুটো ভাত দিয়ে পালন কর্‌তে পারে, এমন কি কোনও আত্মীয় নেই?

কৈলাস। কৈ কারুকে ত মনে হয় না।

তর্কভূষণ। যা হোক সেটা পরে ভেবো; ভাব্‌বার অনেক সময় আছে। এখন তীর্থযাত্রাটা যাতে হয়, তার যোগাড় কর।

কৈলাস। সে যে প্রচুর ব্যয়সাধ্য।

তর্কভূষণ। ঐ ত মুস্কিল! আমার শক্তি থাক্‌লে আমি এমন বিপদের সময় তোমার সাহায্য কর্‌তে পারতাম, কিন্তু সে শক্তি নাই; তবে সামান্য কিছু সাহায্য কর্‌তে পারি। (কিঞ্চিৎ চিন্তার পর) আচ্ছা, আজ তুমি যাও, আমি রাত্রে ভেবে দেখি কি করা যেতে পারে।

কৈলাস বিদায় হইলেন। তিনি অকূল নিরাশ-সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন, একটু আশা হইল, যে একটা গতি হইতে পারে। তীর্থদর্শনের সাধ অনেক দিন ছিল, এই উপলক্ষে সে সাধটাও পূর্ণ হইবে, ইহা ভাবিয়াও কিঞ্চিৎ আনন্দ হইল। কন্যাটী যে চির-পঙ্কে ডুবিল, সে জন্য যাতনাটা আর প্রবল রহিল না। কোন কোনও প্রকৃতির উপরে চিন্তা গাঢ়রূপে বসে না; বোধ হয় চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রকৃতিটা সেইরূপ হইবে। কন্যার চিন্তা যদি পূর্বাবধি গাঢ়রূপে বসিত, তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ ঘটনাটা ঘটিত না। কৈলাস প্রসন্নচিত্তে ঘরে যাইতেছেন; কিন্তু এদিকে তর্কভূষণ মহাশয়ের মন চিন্তার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

কর্তামহাশয় কোনও দিন আহার কালে পুত্রকন্যাদিগের সহিত গল্পগাছা বা আমোদ প্রমোদ করেন না; সেটা তাঁহার স্বভাব নয়। আজ আবার তাঁহার মুখ

বিশেষ ভাবে গাম্ভীর্যে পূর্ণ ও চিন্তান্বিত। আজ আর কেহ সাহস করিয়া একটীও কথা কহিতে পারিতেছে না। সকলেই নিঃশব্দে, নিস্তব্ধে আহার করিতেছে। এমন কি গৃহিণী, যিনি চিন্তার বড় ধার ধারেন না, এবং কর্তার সহিত কথা কহিতে সর্বাপেক্ষা সাহসী, তিনিও যেন আজ অধিক কথা কহিতে সাহসী হইতেছেন না। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা, তুমি কি ভাব্ছ?" কর্তা বলিলেন, "সকল কথাই কি বল্তে হবে?" আর গৃহিণীর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না। আহারান্তে তর্কভূষণ মহাশয় শয়নগৃহে গেলেন। কিন্তু রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। প্রাতে উঠিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী বিজয়াকে বলিলেন, "কাল কর্তা ভাল ঘুমান নাই। মধ্যে মধ্যে উঃ আঃ করেছেন, ঘুমের মধ্যে বলেছেন,—'আর দেশে থাক্তে দিলে না, পাপাচারে দেশ ডোবালে; কি পাষণ্ড, গরিব ব্রাহ্মণকে ধনে প্রাণে সারা করলে।'" কেহই কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; প্রাতে উঠিয়া কর্তা মহাশয় নিয়মিত সকল কার্য সমাধা করিলেন; মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। মাধ্যাহ্নিক আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে শঙ্করকে ছাত্রদিগকে পড়াইবার আদেশ করিয়া, চাদরখানি স্কন্ধে লইয়া বাহির হইলেন। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "একটু কাজে জমিদার বাবুদের বাড়ীতে একবার যাচ্চি।" এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এদিকে জমিদার বাবু, রামহরি মিত্র, আহারান্তে তাঁহার বাহির বাড়ীর খাস কামরাতে শয়ন করিয়াছিলেন। নিদ্রান্তে উঠিয়া হরে চাকরকে ডাকিতেছেন, "হরে, তামাক্ দেরে।" হরে তামাক লইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে খবর আসিল যে, তর্কভূষণ মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে নীচে উপস্থিত। এরূপ ঘটনা প্রায় হয় না; সে ভবনে তর্কভূষণ মহাশয়ের পদধূলি প্রায় পড়ে না। তিনি ত আর তোষামোদজীবী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহেন, যে ধনীদের গৃহে সর্বদা গতায়াত করিবেন। জমিদার বাবু তর্কভূষণ মহাশয়ের আগমনবার্তা শ্রবণে, ব্যস্তসমস্ত ভাবে হুঁকাতে দুই একটা টান দিয়া ও হুঁকাটা সরাইতে ইঙ্গিত করিয়া, কাপড় চোপড় সামলাইতে সামলাইতে তর্কভূষণ মহাশয়ের অভ্যর্থনার জন্য নীচে নামিয়া গেলেন, এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি লইয়া বলিলেন, "আজ আমার কি সৌভাগ্য, যে এ বাড়ীতে মহাশয়ের পদধূলি পাইলাম।"

তর্কভূষণ। (সর্বাঙ্গীন কুশলপ্রশ্নানন্তর)—তোমার সঙ্গে আমার গোপনে একটু বিশেষ কথা আছে।

রামহরি। যে আজ্ঞা, উপরে আসুন; আমার খাস কামরাতে আসুন।

এই বলিয়া তর্কভূষণ মহাশয়কে খাস কামরাতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; এবং ভৃত্যদিগকে বলিয়া দিলেন যে কেহ যেন বিনা হুকুমে উপরে না যায়।

উভয়ে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে, তর্কভূষণ মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "যে জন্য এসেছি, সে কথাটা একেবারেই উপস্থিত করা ভাল। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী অতি অসৎ; সে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্বনাশ করেছে।"

রামহরি। সে কিরূপ?

তর্কভূষণ। ও পাড়ার কৈলাস চক্রবর্তীকে জান?

রামহরি। আজ্ঞে হাঁ, জানি।

তর্কভূষণ। নিস্তারিণী নামে তার একটী বিধবা কন্যা আছে। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেই মেয়েটিকে চিরকলঙ্কে মগ্ন করেছে। এখন ব্রাহ্মণের জাতি কুল যায়.

|নে প্রাণে সারা হবার উপক্রম।

রামহরি। আমার পুত্র যে করেছে তার প্রমাণ?

তর্কভূষণ। প্রমাণ না থাক্‌লে আর আমি তোমার কাছে এসেছি? এমন জঘন্য ব্যাপারে কি হাত দিতে আছে? আমি কি এমন কাজে কখনও আস্‌তাম? ক করি, ব্রাহ্মণ আমার অতি অনুগত, বিশেষতঃ বিষয়টা গোপন থাকা উচিত |লেই নিজে আসা।

রামহরি। (একটু হাসিয়া) আজ কালকের ছেলেরা কোথায় কি না করে, আপনার আমার কি ও সব কথায় কান দেওয়া উচিত?

তর্কভূষণ। (বিরক্তি-কর্কশ স্বরে) সে কি রামহরি! তুমি বল কি? এটা কি হসে উড়িয়ে দিবার মত কথা? ওই জন্যই ত তোমাদের ঘরে ছেলেপিলে ভাল য় না। ব্রাহ্মণের কি সর্বনাশটা হতে চলেছে, একবার ভেবে দেখ দেখি।

রামহরি। মেনে নিলাম আমার ছেলের দ্বারা এই দুষ্কার্য হয়েছে, মেনে নলাম মহাশয় যা বল্‌ছেন সমুদায় সত্য, কিন্তু তা হলেও মশাইকে এত মাথা ঘাবাতে হবে না; কিছুই সর্বনাশ হবে না; ঘরে ঘরে কত বিধবার এরূপ দশা ঘট্‌চে, কারুর সর্বনাশ হয় না।

তর্কভূষণ। কি কথাটা বল্‌ছো, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

রামহরি। আপনি নিতান্ত নির্বিষয়ী লোক, সাধু পুরুষ, কেবল শাস্ত্র-চর্চাতেই থাকেন, আপনার এ সকল বিষয় না বোঝ্‌বারই কথা; আমরা দেখে দেখে বুড়ো হলাম! আমার তাৎপর্যটা এই, যদি কিছু গোলযোগ হয়ে থাকে, তার বাপ |া সেরে নেবে।

তর্কভূষণ। ছি ছি! এমন কথা বল্‌তেও তোমার লজ্জা হলো না?

রামহরি। হামেশা যা ঘট্‌চে, তা বল্‌তে লজ্জা কি?

তর্কভূষণ। এ স্থলে সেটী হচ্চে না। কৈলাস আমার পরামর্শ যদি না নিত, তাহলে কি হতো বল্‌তে পারি না; আমি সে পথ বন্ধ করেছি।

রামহরি। তবে মহাশয় কি পরামর্শ দিয়েছেন?

তর্কভূষণ মহাশয় কৈলাসকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, আনুপূর্বিক সমুদায় |র্ণন করিলেন।

রামহরি। উত্তম পরামর্শই দিয়েছেন। এখন সেই অনুসারে কার্য কর্‌তে বলুন।

তর্কভূষণ। এ সম্বন্ধে একটু কথা আছে।

রামহরি। কি কথা?

তর্কভূষণ। কৈলাস অতি দরিদ্র লোক, অতি কষ্টে তার দিন চলে; এত ব্যয় স কিরূপে কর্‌বে?

রামহরি। তবে কি মহাশয়ের ইচ্ছে আমি সে ব্যয়টা বহন করি?

তর্কভূষণ। কাজেই, তোমার ছেলেরই বহন করবার কথা। তা সে ত এখনও বিষয়ের অধিকারী হয় নি, সুতরাং তোমারই দেওয়া উচিত।

রামহরি। (উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া) এ মন্দ কথা নয়; বাড়ীর ছেলেরা কে কোথায় ইয়ারকী দিয়ে বেড়াবে, আর আমরা জরিমানা দিয়ে বেড়াব। আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত না হলে এমন বুদ্ধি যোগাত না।

তর্কভূষণ। (অতিশয় ক্রুদ্ধ ভাবে) বিধাতা জন্মজন্মান্তরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

করুন; তোমাদের মত বিষয়বুদ্ধি যেন না ঘটে। যে দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্তী হ একটা পরিবারকে জন্মের মত কলঙ্কে ডোবালে, সে আরামে বেড়াবে, আর সা ভুগ্‌বে অন্য লোকে! এই বুঝি তোমার বিচার? পরপ্রবঞ্চনা করে তোমা ধর্মাধর্ম-জ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে; তা না হলে এমন বিচার ঘটে না।

রামহরি। মহাশয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত, গুরুতুল্য ব্যক্তি, আপনার সঙ্গে আ তর্ক করা শোভা পায় না। স্পষ্ট কথা এই, আমি টাকা কড়ি কিছু দিতে পার্ না।

তর্কভূষণ। (উঠিয়া দণ্ডায়মান) তুমি যে এ কথা বল্‌বে, তা আমি জান্‌তা তোমরা বিষয়ী লোক কিনা, ধর্ম-জ্ঞানে তোমাদের টাকা বাহির হয় না। ছে বিয়ে আস্‌চে, কাল বাইনাচের জন্য হয় ত হাজার হাজার টাকা যাবে, এব মকদ্দমার দাবা খেলাতে হয় ত শত শত টাকা ব্যয় হবে, আর নিজের ছে পাপাচারে এক ব্রাহ্মণ পরিবার উৎসন্ন যায়, তাদের রক্ষার জন্য টাকা দিতে ই হয় না। আচ্ছা, আমি চল্‌লাম। আমি যে এজন্য এসেছিলাম, তা কারু বলো না।

রামহরি। মহাশয় ক্রোধ করে যাবেন না। একবার ভেবে দেখুন এ দণ্ডটা আমার দেওয়া উচিত?

তর্কভূষণ। (অতিশয় কোপন ভাবে) ওগো ভেবে দেখেছি গো দেখে তোমাদের কেমন স্বভাব, প্যায়দার লাঠির গুঁতা না হলে সিন্দুকের চাবি খো না। আচ্ছা, সেই প্যায়দার লাঠির গুঁতাই আস্‌বে।

এই বলিয়া তর্কভূষণ মহাশয় দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

প্যায়দার লাঠির গুঁতার উল্লেখ করাতে জমিদার বাবুর আত্মমর্যাদাতে আঘাত লাগিয়াছিল; তিনি ক্ষণকালের জন্য কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; তর্কভূ মহাশয়কে দুই কথা শুনাইয়া দিবেন ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কুপি ফণীর ন্যায় মনে মনে গর্জন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন, কিছুই বলিব অবসর পাইলেন না। বাবুটী একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্যায়দার লা গুঁতার অর্থ কি? তবে কি নালিস করিবার অভিপ্রায়? তাও কি হয়? লো এমন বিষয়ে কি নালিস করে? ও বৃথা ভয় দেখান। পিতা মাতা গোপ বিপদুদ্ধার করিয়া লইবে। ওরূপ সকলেই করে। অমনি স্মরণ হইল যে, কিছু পূর্বে তর্কভূষণ মহাশয় চিমে ঘোষের জরিমানা করাইয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ড লোক কুপিত হইলে জ্ঞান থাকে না। যদিই নালিস করে? কর্‌লেই বা কি উভয়ের সম্মতিতে কাজ! না না, খোরাকপোষাকের খরচ বোধ হয় ধরিয়া লই পারে। ছি! ছেলেটা কি কাণ্ড বাধাইল! একবার ইচ্ছা হইল তাহাকে ধরি জুতাপেটা করেন। অমনি মনে হইল, তিনিও যৌবনকালে এরূপ অনেক ইয়ারব দিয়াছেন। আবার ভাবিলেন, আচ্ছা দেখা যাউক না, কি ব্যাপারটা দাঁড়ায়। অম মনে হইল, যে বড়ঘরে ছেলেটার বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে, যদি এখন এক গোলযোগ উঠে, বিবাহটা ভাঙ্গিয়া যাইবে। কি করা যায়? দূর হোক, কি টাকা দিয়া মিটাইয়া ফেলা যাক্‌। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় জমিদার বাবু সেদিনকার অপরাহ্ণ ও রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই তর্কভূষণ মহাশয় কৈলাসকে ডাকাইলেন কৈলাস আসিলে বলিলেন, "কৈলাস! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ করে ভে

চন্তে উত্তর দেও। তোমার যে সর্বনাশ ঘট্‌বার ঘটেছে, মেয়েটার যে সর্বনাশ হবার হয়েছে; আজ না হোক কাল লোক-জানাজানি হবে; পাপ কখনও গোপন থাকে না; যদি একটু লোক-জানাজানির কষ্টটা সহিতে পার, তা হলে একবার ঐ দুর্বৃত্তদিগকে একটু শিক্ষা দেওয়া যায়।" এই বলিয়া রামহরি মিত্রের সহিত তাঁহার যে কথাবার্তা হইয়াছিল, আনুপূর্বিক সমুদায় বর্ণন করিলেন।

কৈলাস। মহাশয় আমার অভিভাবক, আপনি যা ভাল বোঝেন কর্‌বেন; তবে কনা তা হলে আমি আর গ্রামে থাক্‌তে পারবো না।

তর্কভূষণ। আরে সে কষ্ট ত আছেই। মেয়েটাকে অন্যস্থানে পাঠালে আর ক? কত লোকের মেয়ে ত বাজারে দাঁড়ায়, তারা কিরূপে গ্রামে থাকে?

কৈলাস। তা আমি আর কি বল্‌বো। মহাশয় যা ভাল বোঝেন কর্‌বেন।

এই বলিয়া কৈলাস চলিয়া গেলেন।

কৈলাস চলিয়া গেলে, কর্তা মহাশয় হরচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"হর, আজ রবিবার; কৃষ্ণনগরের উকীল ভুবন মিত্র বাড়ীতে এসেছে কিনা দেখে আয় ত। শুনেছি সে মধ্যে মধ্যে রবিবার বাড়ীতে আসে; যদি এসে থাকে, ডেকে নিয়ে আয়, নালিস্ বিশেষ কথা আছে।"

উকীল ভুবন মিত্র তর্কভূষণ মহাশয়ের বিষয়কর্মসংক্রান্ত সমুদায় মাম্‌লা মকদ্দমার তদারক করিতেন; সুতরাং আহ্বান মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্তা তাঁহাকে এক নির্জন ঘরে লইয়া নাম ধাম না দিয়া, বিষয়টী বুঝাইয়া দিলেন, এবং মকদ্দমা চলিতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন শুনিলেন যে নালিস চলিতে পারে, তখন প্রীত হইলেন।

ওদিকে জমিদার বাবু পূর্ব দিবসের কথোপকথনের পর সুস্থির নহেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের ক্রোধ দেখিয়া তাঁহার চিত্তে ভয় জন্মিয়াছে। তিনি গোপনে গোপনে সংবাদ লইতেছেন। যখন শুনিলেন উকীল ডাকান হইয়াছিল, তখন একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রথমে তর্কভূষণ মহাশয়কে ডাকাইয়া, কিছু টাকা দিয়া মিটাইয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিলেন। আহারান্তে অপরাহ্নে একজন ভৃত্য আসিয়া তর্কভূষণ মহাশয়কে বড় বাবুর প্রণাম জানাইয়া বলিল, যে একবার রাজবাড়ীতে পদধূলি দিলে বাবু বড় বাধিত হন। তর্কভূষণ মহাশয়ের মন তখনও গরম ছিল। তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "বল্ গিয়ে আমার অনেক কাজ, যাইবার অবসর নাই।"

জমিদার বাবু বুঝিলেন, গতিক্ ভাল নয়। ওদিকে তাঁহার পুত্রের বিবাহ সন্নিকট, গোলমাল নিবারণ করিতে হয় ত আর একদিনও বিলম্ব করা কর্তব্য নয়। অবশেষে নিরুপায় হইয়া এক ভৃত্যসমভিব্যাহারে সন্ধ্যার পর বাতি জ্বালিয়া নিজে তর্কভূষণ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলেন। তর্কভূষণ মহাশয় সমুচিত সৌজন্য সহকারে বাহিরের ঘরে বসিতে আসন দিয়া, অপর সকলকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন।

রামহরি। মহাশয় চলে আস্‌বার পর ভেবে দেখ্‌লাম যে, আমাদের কিছু দণ্ড দেওয়া কর্তব্য; কারণ ব্রাহ্মণ বাস্তবিক ধনে প্রাণে সারা হচ্চেন।

তর্কভূষণ। যা হোক্, এ শুভ বুদ্ধিটা যে তোমার ঘটেছে, ইহাই সুখের বিষয়।

রামহরি। মহাশয় আমাকে কত টাকা দেবার জন্য আদেশ করেন?

তর্কভূষণ। আমি এ বিষয়ে অনেক ভেবে দেখেছি; তোমার সম্মুখে একা প্রকাণ্ড ব্যয় আস্‌ছে; অপরদিকে মেয়েটীরও রক্ষার উপায় হওয়া চাই; সক দিক দেখে আমি স্থির করেছি, যে উহাদের তীর্থযাত্রার জন্য পাঁচশত টাকা দেও এবং উহাদের প্রতিপালনের জন্য দেড় হাজার টাকা দেও। যদিও দেড় হাজার টাব অল্প হলো, তথাপি ঐ টাকা তাহারা সুদে দিয়ে কোনও প্রকারে চালাতে পারবে

রামহরির এত টাকা দেবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বুঝিলেন, যে, ব্রাহ্ম ইহার কমে সন্তুষ্ট হইবার লোক নহেন। মনে মনে ভাবিলেন, দূর হোক্ ছেলেটা বিবাহে কত হাজার হাজার টাকা যাবে, এ নয় তার একটা ব্যয় মনে করা গেল (প্রকাশ্যে) "যে আজ্ঞা, আপনি যখন আদেশ কর্‌ছেন, তখন তাহাই দেওয়া যাবে কল্য প্রাতে আমার লোক এসে মহাশয়ের হাতে ঐ টাকা দিয়ে যাবে। মহাশ একটু রসিদ লিখে দিবেন।"—এই বলিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া বিদা হইলেন।

পূর্বরাত্রে তর্কভূষণ মহাশয়ের নিদ্রা হয় নাই, কিন্তু অদ্য তিনি নিদ্রা গেলেন। প্রাতে উঠিয়া কৈলাসকে বলিলেন,—"তীর্থযাত্রার আয়োজন কর আবশ্যকমত টাকা আমার নিকট হতে লয়ে যেও।" তাহাকে ঐ দুই হাজার টাকা কথা বলিলেন না; কারণ, ভাবিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, টাকার সন্ধান পাইলেই এট ওটী করিয়া খরচ করিয়া ফেলিবে। তিনি গোপনে ঐ সমুদায় টাকা কৈলাসে নামে একজন বিশ্বাসী মহাজনের নিকট জমা দিয়া রাখিলেন। মনে মনে রহিল তীর্থযাত্রা হইতে আসিলে কৈলাসকে বলিবেন ও নিস্তারিণীর দেড় হাজার টাক তাহাকে দিবেন।

কৈলাস যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত আপনাদের হঠাৎ তীর্থযাত্রার প্রকৃ কারণ গোপন রাখিয়া, তীর্থযাত্রার সমুদায় আয়োজন করিতে লাগিলেন। পু ও বধূকে যথাযোগ্য উপদেশ দিলেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যা অধিক হয় নাই; এ পুত্র ও দুই কন্যা, তন্মধ্যে নিস্তারিণী সর্বকনিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠা কন্যা পতিগৃহে গৃহধর্মে রত আছে। শুভদিনে নিস্তারিণীকে লইয়া তাঁহারা তীর্থযাত্রাে বহির্গত হইলেন। তর্কভূষণ মহাশয় কৈলাসের হাতে ২০০ দুই শত টাকা দিয় বলিলেন,—"পথে অধিক টাকা সঙ্গে থাকা ভাল নয়, আবশ্যক হইলে লিখি হুণ্ডী করিয়া পাঠান যাইবে।"

কৈলাস চক্রবর্তী সপরিবারে তীর্থ-যাত্রাতে বহির্গত হওয়ার প্রায় দশ দি পরে এক দিন রাত্রি ৯টার সময়ে গ্রামে এই জনরব রাষ্ট্র হইল, যে জমিদার বাবু জ্যেষ্ঠ পুত্র জহরলালের মৃত দেহ কৈবর্তপাড়ায় বাগানের পাশে, রাস্তার উপরে পাওয়া গিয়াছে। মথুর কৈবর্ত বাড়ীতে আসিবার সময় দেখিতে পায়, ও জমিদার বাবুকে খবর দেয়। বাবু লোকজন সঙ্গে স্বয়ং আসিয়া ঐ দেহ তুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছেন। কে এ কাজ করিয়াছে, তাহার কিছুই উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই এই সংবাদ গ্রামে প্রচার হইলে, যাহারা তখনও জাগ্রত ছিল, তাহারা সকলেই এ প্রকার ভীতি অনুভব করিতে লাগিল। কি ভয়ঙ্কর কথা! গ্রামের জমিদারে ছেলেকে মারিয়া ফেলিয়া গেল, কে এমন কাজ করিল জানিতে পারা গেল না এই উপলক্ষে নানা প্রকার জল্পনা ও সমালোচনা চলিতে লাগিল। কেহ ব বলিল,—"আজ কালকার ছেলেরা মদের গ্লাস ধর্‌তে শিখেছে; কুসঙ্গীর অপ্রতুল নাই, মাতালে মাতালে ঝগড়া হয়ে মারামারি হয়েছে বোধ হয়;" কেহ ব

বলিল, "কোথায় কার বাড়ীতে বোধ হয় যাতায়াত করতো, একলা পেয়ে সাজা দিয়েছে;" কেহ কেহ বলিল,—"হাঁসের দল ত ইহার তলে নেই?" শুনিয়া অপরে বলিল,—"তা হতেও পারে।"

এদিকে জমিদার রামহরি মিত্র মহাশয়ের অবস্থা কিরূপ তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার কৃতী পুত্র জহরলালের মৃত দেহ পথের পার্শ্বে পাওয়া গিয়াছে, তখন—"অ্যাঁ বল কি?" বলিয়া কিছুক্ষণ আর মুখে কথা সরে না। যে পুত্রকে তিনি শিক্ষিত ও কৃতী করিয়া বিষয় রক্ষার জন্য আনিয়াছেন, যাহার হস্তে অচির কালের মধ্যেই সমুদায় কার্যভার ন্যস্ত হইবে, যাহার স্কন্ধে সমুদায় ভার অর্পণ করিয়া তিনি বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত নিদ্রাসুখ অনুভব করিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন, আর দুই দিন পরেই যাহাকে লইয়া বিবাহ দিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে, সেই কুলের প্রদীপ পুত্রের অকাল-মৃত্যু! ইহাতে বিষয়ী লোকের মন কি প্রকার হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি অবিলম্বে লোকজনসহ কৈবর্তপাড়ার দিকে ধাবিত হইলেন। গিয়া দেখেন, পাড়ার কতকগুলি লোক আলো জ্বালিয়া জহরলালকে ঘিরিয়া রহিয়াছে; মুখে জলের ছাট্ দিতে দিতে তাহার চেতনার সঞ্চার হইয়াছে; সে চক্ষু খুলিয়া চাহিয়াছে; কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। দেখিয়া জমিদার বাবুর দেহে প্রাণ আসিল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে পাল্‌কীতে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাওয়া হইল: এবং একঘণ্টা অতিবাহিত হইতে না হইতেই ডাক্তার ও ঔষধের সাহায্যে জহরলাল উঠিয়া বসিল ও কথা কহিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কে যে তাহাকে প্রহার করিয়াছে, তাহার কিছুই বলিতে পারিল না। এই মাত্র বলিল, সে একাকী আসিতেছিল, হঠাৎ কয়েকজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া তাহার গলে বস্ত্র দিয়া ও মুখে কাপড় বাঁধিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। সে তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চেষ্টা করাতে, গলার কাপড় এমন করিয়া কষিয়া ধরিল, যে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল; এই মাত্র তাহার স্মরণ আছে, আর অধিক মনে নাই। ডাক্তার বাবু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কোনও অঙ্গের কোনও গুরুতর হানি হয় নাই। দুই তিন দিন পরেই কলিকাতা যাত্রা করা যাইবে। তখন জমিদার বাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন; এবং স্বীয় শয়ন গৃহে গিয়া কে এ প্রকার কাজ করিল তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, কৈলাস চক্রবর্তীর কাজ; আবার স্মরণ হইল, সে ব্রাহ্মণ সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিয়াছে। আবার ভাবিলেন, তাহার পুত্রের কাজ, পুনরায় মনে করিলেন, ইহা একাকী তাহার কর্ম নহে, দলে অন্য লোক নিশ্চয়ই আছে। শেষে স্থির করিলেন, আর কাহারও কাজ নহে, ঐ বিশ্বনাথ তর্কভূষণের কাজ। ব্রাহ্মণ বড়ই গর্বিত, কোমরে টাকার জোরও আছে, বাড়ীতে যমদূতের মত কতকগুলো ছাত্রও আছে, সেই ব্রাহ্মণই নিজের পুত্র ও ছাত্রদিগের দ্বারা এই কাজ করিয়াছে। আচ্ছা, বিবাহটা হয়ে যাক্, একবার দেখ্‌বো কত ধানে কত চাউল! ঐ ভিটেতে ঘুঘু না চরাই ত আমার নাম রামহরি মিত্র নয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাবু নিদ্রাগত হইলেন। ওদিকে তর্কভূষণ মহাশয় সে রাত্রে ইহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানেন না। প্রাতে উঠিয়া সমুদায় বিবরণ শুনিয়া ধীরভাবে বলিলেন,—"পাপের শাস্তি হাতে হাতে, দরিদ্রের উপর অত্যাচার কর্‌লে ধর্মে সবে কেন?" রামহরি মিত্র দুই দিবস পরে স্বীয় পুত্রকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া বিবাহ দিয়া আনিলেন।

প্রকৃতি যাহাদিগকে সুকণ্ঠ দিয়াছেন, এবং তাহার পরিচয় যাহারা পাইয়াছে, তাহাদের পক্ষে গাইতে না পারা একটা বিশেষ ক্লেশ। পূর্বেই বলিয়াছি, তর্কভূষণ মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা ৺তারাদাস বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় একজন শাক্ত সাধক ও সুগায়ক লোক ছিলেন। অনেক দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কালী-মন্দির হইতে তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত শ্রুত হইত। ঐ সকল সঙ্গীত তাঁহার সাধনের অঙ্গস্বরূপ ছিল। তাঁহার স্বরচিত অনেক সঙ্গীত এই গ্রামে, বিশেষতঃ এই পরিবার-মধ্যে প্রচলিত আছে। তাহার একটী নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এই সঙ্গীতটী শঙ্কর মধ্যে মধ্যে গাইয়া লোককে শুনাইয়া থাকেন।

সঙ্গীত।

দুর্গতিহারিণি! দুর্গে! তার এ দীনে;
ভকতি-প্রণতি-স্তুতি-মতি-গতি-বিহীনে।
ক্ষেমঙ্কর ক্ষেমঙ্করি আদ্যাশক্তি পরেশ্বরি,
চরণ-সরোজ-রজ দেও পাপী মলিনে।
শৈশব, যৌবন, জরা বিফলে যে যায় তারা,
না ভজিনু না পূজিনু ও চরণ-নলিনে।
তারাদাসে ও শ্রীপদে, বিনয়ে পড়িয়ে কাঁদে,
দেখগো শঙ্করি! যেন ভবার্ণবে ডুবিনে।

বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের সুকণ্ঠ এই পরিবারে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সকলি বৃথা! এক হরচন্দ্র ব্যতীত আর কাহারও সে চর্চা নাই। এই পরিবারের শিশু কন্যাগুলি যখন কোন যাত্রা বা রামায়ণাদি গান শুনিতে যায়, তখন হয়ত কোন গানের একটা কলি একবার শুনিয়াই এমনি শিখিয়া আসে, যে বাড়ীতে আসিয়া অবিকল নকল করিয়া ও অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচিয়া দেখায়। তর্কভূষণ মহাশয় কতবার সেইরূপ গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া কৌতুক করিয়াছেন। কিন্তু যতদিন তাহাদের লজ্জা না থাকে ততদিন নাচিয়া গাইয়া বেড়ায়; একটু বড় হইলেই বৃদ্ধা রমণীরা "দূর হ পোড়ার মুখী" বলিয়া লজ্জা আনিয়া দেন; অমনি সে সঙ্গীতশক্তি লুকাইয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, শঙ্কর ও গৌরীপতি উভয়েই বাল্যকালে বেশ গাইতে পারিতেন; কিন্তু অনেক দিন হইল সে পাট সাঙ্গ হইয়াছে। কত বৎসর হইল আর তাঁহারা মুখ খোলেন নাই। তাঁহাদের যে সে শক্তি আছে, তাহার কিছুই প্রমাণ নাই। তবে শঙ্কর মধ্যে মধ্যে যখন সমাগত লোকদিগের অনুরোধে পিতামহ মহাশয়ের স্বরচিত দুই একটী সঙ্গীত গাইয়া শুনাইয়া থাকেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি দেখিয়া লোকে আশ্চর্যান্বিত হয়। ভবেশ বালক, তাহার এখনও জ্যেষ্ঠদিগের ন্যায় বিজ্ঞতা জন্মে নাই; সুতরাং সে সঙ্গীতপ্রবৃত্তিকে একেবারে সংযত করিয়া রাখিতে পারে না। বাড়ীতে কর্তার ও জ্যেষ্ঠদিগের ভয়ে হুঁ করিবার সাধ্য নাই; সুতরাং স্কুলে টেবিল চাপড়াইয়া সমাধ্যায়ীদিগের নিকট গাইয়া থাকে। কিন্তু গৃহে আত্মীয় স্বজনের নিকটে গাইলে গানগুলি যেরূপ নির্দোষ হইত, সে সকল গান সেরূপ নির্দোষ থাকে না।

হরচন্দ্র নিষ্কর্মা লোক, তিনি এ বিষয়ে কিছু অগ্রসর! তিনি কেবল সুগায়ক নহেন, গোপনে একজন ওস্তাদের নিকট বেশ বাজাইতেও শিখিয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্গীতপ্রিয়তার জন্য তিনি অনেক নিষিদ্ধ কার্যও করিয়া থাকেন। যে সকল দলের প্রতি তর্কভূষণ মহাশয়ের অতিশয় ঘৃণা, তিনি আমোদপ্রিয়তার অনুরোধে গোপনে সে সকল দলেও মিশিয়া থাকেন। চিমু ঘোষ এবং জহরলাল মিত্রের বিবরণ সকলেই কিছু কিছু জানিয়াছেন; হরচন্দ্র গোপনে তাহাদেরও সঙ্গে মিশিতে ত্রুটি করেন না। তবে এ কথাটা বলা আবশ্যক যে, অদ্যাপি তিনি কোনও প্রকার গুরুতর পাপে পতিত হন নাই। তিনি সুরাপায়ীদিগের মধ্যে থাকেন, কিন্তু সুরা স্পর্শ করেন না; কেবলমাত্র তামাক খাইতে শিখিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহার কোনও প্রকার নেশা নাই। সপ্তাহের অধিকাংশ দিন রাত্রে হরচন্দ্র বাড়ীর লোকের সঙ্গে আহারে যুটিতে পারেন না। তিনি সেই যে বৈকালে বাহির হন, একেবারে রাত্রি ৯।১০টা, কোনও দিন বা ১১টার সময় গৃহে ফিরিয়া আসেন। কর্তা এক একদিন জিজ্ঞাসা করেন, "কৈ হর কোথায়?" গৃহিণী বলেন, "সে পরে খাবে; এখন তোমরা খাও।" কর্তা আর সে বিষয়ে অধিক প্রশ্ন করেন না। কারণ পুত্রেরা প্রায় স্বতন্ত্র ঘরে আহার করিয়া থাকে। হরচন্দ্রের আর একটা বাতিক আছে। তিনি দাবা খেলিতে অতিশয় ভালবাসেন। প্রায় প্রত্যহ বৈকালে পাড়ার একটী নিমস্তক বালকের বাড়ীতে দাবা খেলিতে যান। তিনি এমনি পাকা খেলোয়াড়, যে বৃদ্ধেরাও অনেক সময় তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া তাঁহার সঙ্গে খেলিয়া থাকেন। দাবা খেলা সাঙ্গ হইলে, সন্ধ্যার পর হরচন্দ্র আর এক পাড়ায় ঐরূপ আর এক নিমস্তক বাড়ীতে গান বাজনার জন্য গমন করেন। ঐ গৃহের অভিভাবক তাঁহার সমবয়স্ক এক যুবক। তাহাকে নিবারণ করিবার কেহ নাই; এক বৃদ্ধা বিধবা মাতা; তিনি নিবারণ করিয়া রাখিতে পারেন না। গান বাজনার সখটা খুব আছে। বাহিরের ঘরে বিবিধ বাদ্য-যন্ত্র সর্বদা পড়িয়া আছে; এবং প্রাতঃকাল নাই, মধ্যাহ্ন নাই, সর্বদাই আমোদপ্রিয়-দলের কেহ না কেহ আসিয়া সেগুলি চাপ্‌ড়াইতেছে। চিমু ঘোষ ও জহরলাল এই আমোদ-প্রিয় দলের অগ্রণী; সুতরাং এই ভবনে সর্বদা তাহাদেরও শুভাগমন হইয়া থাকে। হরচন্দ্র লুকাইয়া মধ্যে মধ্যে জহরলালের বৈঠকখানাতেও গিয়া থাকেন।

এইরূপ গ্রামের আমোদ-প্রিয় দলের সহিত হরচন্দ্রের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। এই দল মধ্যে মধ্যে পার্শ্ববর্তী গ্রাম-সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া আমোদ করিতে যায়। তখন হরচন্দ্রকে তাহাদের সহচর হইবার জন্য নানাপ্রকার ছল ও প্রতারণা উদ্ভাবন করিতে হয়। অনেক কৌশলে বাড়ীর লোককে প্রতারণা করিয়া, এক রাত্রির জন্য বিদায় লইয়া যান, আবার পরদিন প্রাতেই ফিরিয়া আসেন; সুতরাং বিশেষ কিছু অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। শঙ্কর বড় চতুর লোক, তিনি কিছুদিন হইতে এইরূপ প্রতারণার কিছু কিছু প্রমাণ পাইয়াছেন; এবং কর্তাকে না জানাইয়া গোপনে হরচন্দ্রকে কয়েকবার সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হরচন্দ্র কোন ক্রমেই সঙ্গীদের অনুরোধ ছাড়াইতে পারেন না। কর্তা এত সংবাদ কিছুই জানেন না, কিন্তু শিবচন্দ্র, শঙ্কর, বিজয়া প্রভৃতি পরিবারস্থ অপর সকলেই এজন্য বিশেষ দুঃখিত। পরিবারের লোকে তাঁহার উপরে বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছে না, ইহা মনে করিয়া হরচন্দ্র সময়ে সময়ে লজ্জিত ও দুঃখিত হয়; এবং এক একবার অনুতাপের উদয় হয়; ও তৎসঙ্গে কুসঙ্গীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্পও হৃদয়ে প্রবল হয়, কিন্তু কার্যকালে অভ্যাস-দোষটাই প্রবল থাকিয়া যায়।

এবারে শীতের অন্তে গ্রামের আমোদ-প্রিয় দল স্থির করিল, যে সিংহযোড়ে প্রসিদ্ধ মুস্তফী বাবুদিগের ভবনে চৈত্র মাসের রাস দেখিতে যাইবে। সিংহযোড় গ্রাম নাশিপুর হইতে প্রায় বিশ পঁচিশ ক্রোশ অন্তরে। ইচ্ছামতী নদী দিয়া নৌকাতে গেলে প্রায় দুই দিন লাগে। তাহাদের পরামর্শ এই যে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া যাইবে, পথে নৌকাতে আমোদ চলিবে; তৎপরে সিংহযোড়ে গিয়া বাবুদের এক বাগানে থাকিবে; জহরলাল অগ্রে পত্র দ্বারা সিংহযোড়ের বাবুদের সহিত সে প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছে। চিমু ঘোষ কলিকাতা হইতে আসিয়া জুটিবে তাহারা পাঁচ সাত দিন আমোদ-প্রমোদে কাটাইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু হরচন্দ্র সঙ্গী না হইলে তাহাদের সকল পরামর্শই বৃথা হয়; কারণ তাহা না হইলে তাহাদের আমোদ জমিবে না। হরচন্দ্র প্রথমে অস্বীকার করিলেন। তিনি অনেকবার বাড়ীর লোককে প্রতারণা করিয়াছেন; এবারে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইবে, তাহার উপযুক্ত একটা ছল উদ্ভাবন করাই কঠিন বাড়ীতে কি বলিয়া যাইবেন, তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে যোগাইতেছে না। আমোদপ্রিয় দল তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রকৃতি ও তাঁহার পারিবারিক বন্দোবস্তের কথা বিশেষ জানে না, এবং সন্তানেরা তাঁহাকে কি প্রকার ভয় ও ভক্তি করে, তাহাও সম্পূর্ণ অবগত নহে; সুতরাং তাহারা হরচন্দ্রের ইতস্ততঃ দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে; বলিতেছে—"ছল আবার কি, বাড়ীতে বল যে আমি সিংহযোড়ে রাস দেখ্‌তে যাই।" এ পরামর্শ অনুসারে কার্য করা হরচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নহে।

দৈবের কি ঘটনা! যখন হরচন্দ্রের মন এইরূপে দোলায়িত, তখন তাঁহার শ্বশুরালয় হইতে পত্র আসিল যে, বৈশাখের প্রারম্ভেই তাঁহার একটী শ্যালীর বিবাহ। বৈশাখের ১লা কি ২রা তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে লইবার জন্য লোক আসিবে এবং সেই সঙ্গে হরচন্দ্রকেও যাইতে হইবে। হরচন্দ্র বিধি সদয় বলিয়া আনন্দে করতালি দিয়া উঠিলেন। তাঁহার শ্বশুরালয় সিংহযোড় হইতে তিন চারি ক্রোশ অন্তরে। এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি স্থির করিলেন যে, বাড়ীতে এই কথা বলিয়া যাইবেন যে, সিংহযোড়ের রাস দেখিয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিবেন; ভিতরের কথাটা গোপন থাকিবে। তর্কভূষণ মহাশয় ভিতরকার কথা কিছুই জানেন না সুতরাং হরচন্দ্র যখন প্রস্তাব করিলেন যে, এই উপলক্ষে তাঁহার সিংহযোড়ের রাস দেখিবার ইচ্ছা, অতএব তিনি কয়েক দিন পূর্বে যাত্রা করিয়া রাস দেখিয়া শ্বশুরালয়ে যাইবেন, তখন তিনি তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণতা বশতঃ সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যথাসময়ে হরচন্দ্র গ্রাম হইতে যাত্রা করিলেন।

প্রথমে শঙ্করের মনেও কোনও সন্দেহ হয় নাই; তিনি সরল ভাবেই ভাবিয়াছিলেন, যে শ্যালীর বিবাহে শ্বশুরালয়ে যাওয়াই হরচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য বাড়ীতে কি বলিয়া যাইবেন, তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে যোগাইতেছে না। আমোদ-প্রিয় দলও সিংহযোড়ের রাস দেখিতে বাহির হইয়াছে, তখন তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ শঙ্কার ও সেই সঙ্গে হরচন্দ্রের প্রতি ক্রোধেরও উদয় হইল। কিন্তু সে কথা তিনি কাহারও নিকট কিছু ভাঙ্গিলেন না। কেবল মাত্র বিজয়াকে একবার বলিলেন, "ছোট পিসি হর যে রাস দেখ্‌তে গেল, এটা ভাল হলো না; শুনছি হতভাগাগুলো না কি সেই সঙ্গে গিয়েছে।" বিজয়া শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন; কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

ওদিকে যুবকদল এই পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছে যে, গ্রাম হইতে বাহির হই

সময়ে সকলে একত্রে যুটিবে না। একজন অগ্রে গিয়া গ্রামের বাহিরে একখান নৌকা করিয়া রাখিবে, সেখানে সকলে নানা দিক দিয়া আসিয়া যুটিবে। চিমু ঘোষ কলিকাতা হইতে আসিয়া পথে তাহাদের সঙ্গ লইবে। তদনুসারেই কার্য হইল। বন্ধনমুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় যুবকদলের আনন্দের সীমা নাই। নৌকাতে এক বেলার পথ একদিনে যাওয়া হইতেছে! দিন রাত্রি কেবল গান বাজনা, হাস্য পরিহাস চলিয়াছে। চিমু ঘোষ বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁয়া ছিঁড়িয়া বাচ্ছা হইয়া এই দলে মিশিয়াছে। সে ও জহরলাল বলিল, শাদা চোখে আমোদ করিতে পারিবে না! কিন্তু হরচন্দ্র আসিবার অগ্রে সকলকে সত্য-বন্ধ করিয়া আনিয়াছিলেন, যে, পথে মাতলামি করা হবে না; সুতরাং চিমু ও জহরলাল যখন পূর্বোক্ত প্রস্তাব করিল, তখন অপর সকলে সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিল। কিন্তু চিমু শুনিবার লোক নয়; সে বলিল, "রেখে দেও তোমাদের প্রতিজ্ঞা, এরূপ কথা দেওয়াই ত অন্যায়। তাই বলে কি আমোদটা মাটি কর্‌বো? আমি বাপু কথা দিই নাই, আমার উপর দাবী দাওয়া নাই।" এই বলিয়া নিজের ব্যাগ হইতে সুরার বোতল ও গ্লাসটা বাহির করিয়া ঢালিয়া পান করিতে প্রবৃত্ত হইল। হরচন্দ্র মাঝিকে নৌকা ধরিতে আদেশ করিয়া, লম্ফ দিয়া তীরে উঠিলেন: এবং বলিলেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না; আমি একলাই যাব।" আর একজন ক্রোধ করিয়া চিমুর বোতলটা জলে ফেলিয়া দিল;—"তিনশ বার বারণ কর্‌লাম, একটা দিন ঐ ছাই না খেলেই নয়।" চিমু বলিল, "হতভাগা বেটা বামন! আমার বোতল ফেলে দিলি যে।" এবং এই বলিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ-যুবককে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। সেও ছাড়িবে কেন; দুই জনে হাতাহাতি। অপরেরা উঠিয়া থামাইতে ব্যস্ত; ওদিকে মাঝি চেঁচাইতছে, নৌকা ডুবিয়া যায়! সকলে পড়িয়া দুইজনকে থামাইয়া দিল। হরচন্দ্র কিছুক্ষণ আর নৌকাতে উঠিলেন না; তীরে তীরে পদব্রজে চলিলেন। নৌকাস্থ অপরাপর যুবকগণ অনেক সাধ্য সাধনা করাতে কিয়ৎক্ষণ পরে আবার নৌকাতে আসিলেন। ক্রমে আমোদ-প্রিয় দল সিংহযোড়ে গিয়া উপস্থিত।

জহরলাল একজন জমিদারের সন্তান ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, সুতরাং পূর্ব হইতেই তাহার ও তাহার বন্ধুগণের জন্য একটী বাগান বাড়ীতে দোতলায় দুইটী বৈঠক-খানা ঘর নির্দিষ্ট হইয়াছিল. সকলে তাহাতেই আশ্রয় পাইল। হরচন্দ্র সিংহযোড়ে পোঁছিয়া এক কুটুম্বের বাড়ীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে মুস্তফী বাবুদের বাড়ীতে রাসের আমোদটা ভরপুর রকম চলিয়াছে। যাত্রা. কবি, রামায়ণ গান, বাইনাচ, কিছুই আর বাকি নাই। বাবুদের বাড়ীর পশ্চাতে এক প্রকাণ্ড দীঘি; তাহাতে প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্বে নৌকাতে ময়ূর-পঙ্খী ও খেমটার নাচ হইয়া থাকে। সে যে কি জঘন্য, কি কুৎসিত, কি ব্রীড়াজনক ব্যাপার, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে ধারণা হয় না। সে সময়ে যে নৃত্য ও যে সঙ্গীত হয়, তাহার বর্ণনা করা দূরে থাক, স্মরণেও লজ্জার উদয় হয়। তাহা এমনি অশ্রাব্য, যে পতি-পত্নীতে এক সঙ্গে শুনিতে লজ্জা পায়। অথচ স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক, পিতা ও পুত্র, মাতা ও সন্তান, এবং কুলের কুলবধূ প্রভৃতি সহস্র সহস্র লোকে প্রতিদিন এই দৃশ্য দেখিতেছে ও শুনিতেছে।

নশিপুরের আমোদ-প্রিয় দল রোজ এদিকে আসে না; তাহারা রামায়ণ গানের ধারেও যায় না; যাত্রাস্থলে দুই একবার বসে; কিন্তু তাহারা প্রধানতঃ আর এক কার্যে ব্যস্ত আছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে চারিটী প্রসিদ্ধ বাই আনা

হইয়াছে। অপর একটী বাগানে তাহাদের বাসা। চিমু ঘোষ প্রভৃতি তাহাদের পরিচর্যার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। সে স্ত্রীলোকগুলির আদর কি! তর্কভূষণ মহাশয় শিষ্যবাড়ীতে কখনও এত আদর পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ! সেখানকার আসর সর্বদাই গরম। অবশ্য, হরচন্দ্রের প্রতি সুবিচার করিয়া এ কথাটা বলিতে হইবে, যে তিনি ইহার ভিতরে নাই। তিনি রাস দেখিয়া বেড়াইতেছেন, রামায়ণ গান ও কবি শুনিতেছেন, যে দুই চারিজন নূতন লোকের সহিত আলাপ হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করিতেছেন।

বাবুদের বাড়ীতে দুই দিন বাইনাচ হইয়া গেল। দ্বিতীয় দিবস চিমু ঘোষ ও জহরলাল উদ্যোগী হইয়া মুস্তফী বাবুকে বলিল, "আমাদের সঙ্গে একজন ভাল বাজিয়ে লোক আছেন, তিনি অদ্যকার আসরে বাজাইবেন।" মুস্তফী বাবু অতীব সন্তুষ্ট হইয়া সে কথা প্রচার করিয়া দিলেন। চিমু ও জহরলাল আশা করিয়াছিল যে, হরচন্দ্রকে সে আসরে বাজাইতে সম্মত করিতে পারিবে। কিন্তু হরচন্দ্র কোন প্রকারেই সম্মত হইলেন না। চিমু ও জহরলাল অনেক পীড়াপীড়ির পর অকৃতকার্য হইয়া বলিল, "আচ্ছা, আজ আমাদিগকে ভদ্রলোকের কাছে অপ্রস্তুত করিলে, কাল আমাদের বৈঠকখানাতে বাইজীদের গান ও নাচ হবার কথা হচ্চে, তাতে তোমাকে বাজাতে হবে, তখন না বল্‌তে পারবে না।" হরচন্দ্র মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন তাহাতেও না বলিবেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না।

পরদিন বৈকালে নশিপুরের দলের বৈঠকখানাতে বাইদের আসর হইল। আজ বহুজনসমাগম নয়, কতিপয় গণ্য মান্য সঙ্গীত-বিদ্যায় রসজ্ঞ ব্যক্তির সমাগম। কেবল চিমু ও জহরলাল নয়, দলস্থ লোকেরা সকলেই হরচন্দ্রকে ধরিয়া বসিল, বাজাইতেই হইবে। হরচন্দ্র একবার ভাবিলেন, "বারাঙ্গনার সঙ্গে বাজান, ছিঃ! তর্কভূষণের বংশের ছেলের কি এই কাজ? বিশেষতঃ শ্বশুরালয়ের এত নিকটে; না বাজাব না।" আবার ভাবিলেন, "সাধ করে বাজ্‌নাটা শিখলাম, এই ত সে বিদ্যাটা দেখাবার উপযুক্ত সময়।" আবার ভাবিলেন—"না, না, বাপ্‌রে এ কথা যদি বাবার কানে উঠে?" পুনরায় মনে করিলেন, "কে বা দেখ্‌তে এসেছে, কারই বা এত গরজ পড়েছে, যে সংবাদটা আবার দিতে যাবে?" এইরূপ পাঁচ সাত প্রকার চিন্তাতে তাঁহার প্রথম চিন্তাটা চাপা পড়িয়া গেল। তিনি সম্পূর্ণ কর্তব্য নির্ধারণ করিতে না করিতে, যুবকদল তাঁহাকে ঠেলিয়া বসাইয়া, তাঁহার হাতে পাখোয়াজ দিয়া আরম্ভ করাইয়া দিল।

হরচন্দ্র প্রথম প্রথম লজ্জাতে একটু সংকোচের সহিত বাজাইতে লাগিলেন; কিন্তু অবশেষে নারীকণ্ঠের তানলয়শুদ্ধ হিন্দী সঙ্গীত, ও সভাস্থগণের আনন্দ-সূচক সাধুবাদ যখন আসরকে জমাইয়া তুলিল, তখন তিনি আত্মহারা হইয়া সেই সুধা-হ্রদে মগ্ন হইয়া গেলেন! বাইগণ তাঁহার বিদ্যার দৌড় দেখিবার জন্য আপনাদের বিদ্যা-সাধ্য ব্যয় করিতে ত্রুটী করিল না, কিন্তু হরচন্দ্র সমুদায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চারিদিক হইতে শত ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইলেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, মানুষটা কে? সঙ্গীদের অনেকে হরচন্দ্রের ভাব জানিত: তাহারা কেবলমাত্র বলিল, "আমাদের গ্রামের একটী লোক।" কিন্তু চিমু ঘোষ অসাবধানতা-বশতঃই হউক, আর তর্কভূষণ মহাশয়কে অপমানিত করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, বলিল, "নশিপুর গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ তর্কভূষণের চতুর্থ পুত্র। উঁহার নাম হরচন্দ্র।"

যাঃ! সর্বনাশ হইয়া গেল; হরচন্দ্র যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই বুঝি ঘটিল। একথা বুঝি নশিপুরে চলিল। সভা ভাঙ্গিয়া গেলে হরচন্দ্রকে বিষন্ন দেখিয়া জহরলাল বলিল, "তুমি যেমন পাগল, একথা আবার নশিপুরে বল্‌তে গেল কে?" কিন্তু কিছুতেই হরচন্দ্রের মুখ প্রসন্ন হইল না। তাঁহার যেন মনে হইতে লাগিল, যে, দেশ ব্যাপিয়া যে পিতার যশ, তাঁহাকে আজ তিনি লোকসমাজে হীন করিয়া গেলেন। সে দিন রাত্রে অনুতাপযন্ত্রণায় তাঁহার নিদ্রা হইল না। শয্যাতে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া রাত্রি কাটাইলেন। অনুতাপের মুহূর্তে কত কথাই মনে হইতে লাগিল। কুসঙ্গের অনেক দোষ, কেন বা ছাই গাইতে বাজাইতে শিখিয়াছিলাম, সেইজন্যেই ত এত জ্বালা। লেখা পড়া কিছু শিখলাম না, তাই না হোক, ভদ্র-লোকের ছেলে, বাপের নামটা আছে, তার মত কাজ কি এই করিলাম। ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি পোহাইয়া গেল। হরচন্দ্র প্রত্যূষে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, যে সে প্রকার অনুরোধ আর রক্ষা করিবেন না।

হায়! মানবের পতনের গূঢ়তত্ত্ব যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা ইহা জানিয়াছেন, যে সকল শৃঙ্খল অপেক্ষা আসক্তি ও অভ্যাসের শৃঙ্খল সর্বাপেক্ষা দুশ্ছেদ্য। যে পাপের সহিত মিষ্টতার যোগ আছে, যাহা আমাদিগকে সুখী করিয়া পতিত করে, তাহার হস্তকে অতিক্রম করা অতীব দুষ্কর। ইহার উপরে যদি সে পাপ অভ্যস্ত হয়, সে সুখ যদি বার বার ভোগ করিয়া থাকি, তাহা হইলে ত কথাই নাই। তখন যদি তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য বার বারও চেষ্টা করি, দেখিতে পাই, বালুকারাশি-নির্মিত সেতুর ন্যায় কোন প্রতিজ্ঞাই স্থির থাকে না। বার বার প্রতিজ্ঞা, বার বার ভঙ্গ! বার বার উত্থান, বার বার পতন! মন যাতনা পায়, ক্রন্দন করে, অনুতপ্ত হয়, তথাপি পতঙ্গের ন্যায় পুরাতন অনলেই পতিত হয়।

হরচন্দ্র প্রত্যূষে প্রতিজ্ঞা করিয়া উঠিলেন যে, ও প্রকার অনুরোধ আর রক্ষা করিবেন না, কিন্তু সেদিনকার সূর্য অস্তাচলশিখরে যাইতে না যাইতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। সেদিন বাইদিগের নিজ বাসাতে গীতবাদ্যের আসর হইল। বাইগণ পূর্বদিনের বাজনাতে এত প্রীত হইয়াছিল, যে সেদিন আপনারাই নিজেদের বাসায় গীতবাদ্যের আয়োজন করিল। তাহাদের অনুরোধক্রমে চিমু যখন আসিয়া আবার হরচন্দ্রকে বাজাইবার জন্য অনুরোধ করিল, তখন হরচন্দ্র প্রথমে অস্বীকৃত হইলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন, যে বাইগণ তাঁহার বাজনাতে মুগ্ধ হইয়া এইরূপ স্থির করিয়াছে, তখন প্রশংসা-প্রিয়তার গূঢ় শক্তিতে আপত্তিটাকে অনেক পরিমাণে মন্দীভূত করিয়া ফেলিল। পূর্বদিনের সেই আসর ও তাহার উত্তেজনা, বামাকণ্ঠের সেই চিত্ত-দ্রবকারী সঙ্গীত, সমবেত ব্যক্তিগণের সেই প্রশংসা-ধ্বনি সমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। এইরূপ দোলায়মান-চিত্তে অবশেষে মৌনাত্মক সম্মতি প্রদান করিলেন।

চিমু চতুর ও যুবক মজাইবার বিদ্যাতে পরিপক্ক লোক। সে ইহার অধিক আর কিছু চায় না। সে ঐ প্রকার সম্মতির লক্ষণ দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইল; বলিয়া গেল, "কাল রাত্রে যারা ছিল, তারা সকলেও আজ থাকিবে না; গুটিকত বাছা বাছা লোক; একথা প্রকাশ হবার কোনও ভয় নাই।"

সন্ধ্যাকালে চিমু ও জহরলাল হরচন্দ্রকে ধরিয়া বাইদিগের বাড়ীতে লইয়া গেল। বাইগণ হরচন্দ্রকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া আসরের মধ্যে বসাইল; এবং পূর্ব-দিনের বিবরণ বলিয়া নবসমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত পরিচয় করিয়া দিল।

যথাসময়ে নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। প্রথমে হরচন্দ্রের মনে যে কিছু সংকোচ ছিল, পূর্বদিনের ন্যায় বাজাইতে বাজাইতে সেটুকু চলিয়া গেল। অদ্যও তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হইলেন।

রাত্রে শয়ন করিবার সময় আবার হরচন্দ্রের মনে অনুতাপের উদয় হইল। কিন্তু মনে হইল, সেদিনকার কথা অতি অল্প লোকেই জানে। আর তাঁহার অপরাধই বা কি এত গুরুতর? তিনি কেবল বাজাইয়াছেন, এই মাত্র, কোনও অসাধু আচরণে ত লিপ্ত হন নাই। ইহাতে কেহ যদি তাঁহার প্রতি বিরক্ত হয়, তবে তিনি নাচার। একটু আমোদ প্রমোদ করাতেই কি এত অপরাধ? ইত্যাদি। মনে মনে এরূপ বিচার করিবার সময় হরচন্দ্র বোধ হয় অনুভব করিতে পারিলেন না, যে এই আত্ম-প্রবঞ্চনার পথ অতি পিচ্ছিল! পতনের অগ্রে লোকে আপনার অপরাধকে এইরূপেই লঘু করিয়া থাকে। যাহা হৌক অদ্য রাত্রে অনুতাপের বেগটা পূর্বদিনের ন্যায় প্রবল রহিল না।

পরদিন প্রাতে চিমু ও জহরলাল পরামর্শ করিল, যে সেদিন রাত্রে বাইদিগকে তাহাদের বৈঠকখানাতে আনিয়া আমোদ করিতে হইবে। সেখানে নশিপুরের দলটী ব্যতীত বাহিরের লোক কেহ থাকিবে না। কারণ, বাহিরের লোক থাকিলে অসংকোচে আমোদ করিতে পারা যায় না। তদনুসারে বাইদিগের সহিত সেইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

অপরাহ্নে এই কথা হরচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। তিনি একবার মনে করিলেন, সে দিন আর বাজাইবেন না। আবার ভাবিলেন, তৎপর দিবস ত তাঁহার শ্বশুরালয়ে যাইবার কথা আছে; আর এক রাত্রি বই ত নয়। যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ অদ্যকার রাত্রে বাহিরের লোক কেহ থাকিবে না। এই সকল ভাবিয়া বাজাইবার বিষয়ে তাঁহার মনে আর আপত্তি রহিল না।

সন্ধ্যার পরে বাইদিগের দুইজন নশিপুরের বৈঠকখানাতে আসিল। পাছে বাহিরের কোনও লোক আসে, এজন্য চিমু বৈঠকখানা বাড়ীর প্রবেশের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল। ক্রমে নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। হরচন্দ্র বাজাইতেছেন; কিন্তু অদ্যকার মজলিসে নৃত্যগীতের আয়োজন করা বৃথা! চিমু ও জহরলালের উদ্দেশ্য আমোদ করা, অর্থাৎ মাতলামি করা; সুতরাং নৃত্যগীতে তাহাদের মন নাই। সন্ধ্যা না হইতেই তাহারা একটু একটু সুরা পান করিতেছে; এবং বাইদ্বয় আসিবামাত্র তাহাদিগকে সুরা পান করাইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরেই সুরার মাত্রা বাড়িয়া গীতবাদ্য থামিয়া গেল; এবং তৎস্থানে সুরা ও তদুপযোগী খাদ্যদ্রব্য আসরে অবতীর্ণ হইল। যতই সুরার মাত্রা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই আমোদ প্রমোদ আর এক আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিল! অবশেষে এমন সকল অশ্রাব্য, অকথ্য, অচিন্ত্য ও নীচজনোচিত হাস্য-পরিহাস, শ্লেষোক্তি ও আমোদ প্রমোদ চলিতে লাগিল, যে হরচন্দ্র আর সে মজলিসে তিষ্ঠিতে পারিলেন না; সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও একটী যুবক বাহির হইয়া আসিল। তাঁহারা উভয়ে সমস্ত রাত্রি বাগানে বেড়াইয়া এবং চিমু ও জহরলালের নিন্দা করিয়া কাটাইলেন। আজ আবার হরচন্দ্রের হৃদয়ে অনুতাপের অগ্নি প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি এই আমোদ-প্রিয় দলের সহিত অনেক মজলিসে থাকিয়াছেন। কিন্তু এমন জঘন্য ব্যাপার কখনও দেখেন নাই। তাঁহার বোধ হইল যে, সেই দিন তিনি নিজ পিতার নাম বাস্তবিক পঙ্কে ডুবাইলেন।

গভীর মনস্তাপে শেষ রাত্রিটুকু কাটিয়া গেল। রজনী প্রভাত না হইতে তিনি সঙ্গী যুবকটীকে বলিলেন, "আর আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিব না; সকলকে বলিও, আমি শ্বশুরালয়ে চলিলাম।" এই বলিয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেলেন।

১১

হরচন্দ্র যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি শ্বশুরালয় হইতে গৃহে ফিরিবার পূর্বেই সিংহযোড়ের রাসের আমোদের বিবরণ নশিপুরে পেঁাছিয়াছে। বাকি যাহা ছিল, তাহা চিমু ঘোষ ও জহরলাল গ্রামে আসিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। এখন সে সকল কথা বালক বৃদ্ধ সকলেরই মুখে। তর্কভূষণ মহাশয়ের পরিবারস্থ সকলেই শুনিয়াছেন; শঙ্কর শুনিয়া লজ্জা, ক্ষোভ ও ক্রোধে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন; বিজয়া মর্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছেন; গৃহিণী নিজ অদৃষ্টকে অনেক নিন্দা করিয়াছেন। কেবল তর্কভূষণ মহাশয় শুনিতে বাকি আছেন; কেহই তাঁহাকে শুনাইতে সাহসী হয় নাই। তর্কভূষণ মহাশয়ের সংকল্পানুসারে বৈশাখের প্রথম হইতেই কালী-বাড়ীতে কথকতা বসিয়াছে। কর্তা এই সকল ব্যাপারেই আছেন। হরচন্দ্রের গৃহে ফিরিবার দিন সন্নিকট।

হরচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া কি দেখিলেন ও কি শুনিলেন, তাহা বর্ণন করিবার পূর্বে আর একটী বিষয় বর্ণনীয় আছে। বিগত দুই বৎসর কালের মধ্যে বিজয়ার শরীর ও মনের উপর দিয়া যে পরিবর্তন-স্রোত বহিয়া গিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক। ১৮৫২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের কথকতার সময়ে তাঁহার মনে যে চিন্তা-তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহা ত্বরায় নিবৃত্ত হয় নাই। তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরে দুইটী প্রতিজ্ঞার উদয় হইল। প্রথম, তিনি ভাবিলেন যে, আর অপর সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় অন্ধভাবে ধর্মের সেবা করিবেন না; একবার তলাইয়া দেখিবেন, ধর্মের তত্ত্ব কোন্ গুহাতে নিহিত আছে। দ্বিতীয়, তিনি মনে করিলেন যে, আরও কঠোরতর তপস্যাতে আপনাকে নিক্ষেপ করিবেন। কারণ, তাঁহার বিশ্বাস, যে যদি দেবতা থাকেন, তিনি যে প্রকারেই হউন, অর্থাৎ তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠের আরাধিতা তারাই হউন, আর তাঁহার পতির নির্দিষ্ট পরব্রহ্মই হউন, তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যাইবেই যাইবে। এ প্রতিজ্ঞা সাধকশ্রেষ্ঠ তারাদাস বিদ্যাবাচস্পতির কন্যারই উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? প্রথম প্রতিজ্ঞানুসারে ঈশ্বর ও পরকাল বিষয়ে তলাইয়া দেখিতে গিয়াই, তিনি অকূল সমুদ্রে পতিত হইলেন। কিন্তু ভয় পাইলেন না; বরং চিন্তা, পাঠ ও আলোচনার দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। বুঝিতে পারিলেন, যে স্বীয় পতির নিকটে তিনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব নহে; তাহা পরের ক্ষেত্র হইতে সিঞ্চন করিয়া আনা জলের ন্যায়; তাহার স্নিগ্ধকারিতা অল্পক্ষণস্থায়ী; বিচারের উত্তাপেই তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। তখন তিনি নিজে পাঠ ও চিন্তা আরম্ভ করিলেন। গিরিশচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাদের পাঠ্য গ্রন্থে ঈশ্বর ও পরকাল বিষয়ে যাহা আছে, তাহা শুনিলেন। তৎপরে এ সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু দেখিতে পান, তাহা আগ্রহসহকারে পাঠ করেন। এতদ্ভিন্ন

নিজেও অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন গৃহকার্যে ব্যস্ত থাকিতে হইত; নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিবার সময় পাইতেন না। এই কারণে, তৃতীয় প্রহর রাত্রে উঠিয়া চিন্তা ও ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিবার নিয়ম প্রবর্তিত করিলেন। একে একাহার ও ঘন ঘন উপবাস, তাহার উপরে রাত্রি-জাগরণ, তাঁহার শরীর দিন দিন কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল; মানসিক সংগ্রামে মুখের প্রসন্নতা চলিয়া গেল; এবং তাঁহার প্রকৃতির গাম্ভীর্য যেন পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইল।

পরিবারস্থ সকলেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন। গৃহিণী সর্বদা বলিতে লাগিলেন, "বিজয়ীর কি হয়েছে কে জানে; খায় না দায় না, ভাল করে হেসে কথা কয় না; শরীরটা একেবারে পাত করবার জন্যে যেন লেগেছে!" তর্কভূষণ মহাশয় ভগিনীর কঠোর তপস্যা দর্শনে একটু চিন্তিত হইলেন; কিন্তু মনে মনে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসর, গ্রীষ্মকালে গিরিশচন্দ্র আবার কতকগুলি ইংরাজী বই আনিয়া ঈশ্বর ও পরকাল বিষয়ে অনেক কথা পড়িয়া শুনাইলেন। বিজয়া তখনও যেন দাঁড়াইবার ভূমি পাইলেন না। তাহার অনেক কথা যেন ঢেঁকির কচ্‌কচি বলিয়া বোধ হইল! তাঁহার হৃদয়ের শূন্যতা গেল না। তাঁহার ব্যাকুলতা এবং তপস্যার কঠোরতা দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে গ্রীষ্মাবকাশের পরেই গোবিন্দ তাঁহার জন্য, শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েক স্কন্ধ, গীতা ও মহানির্বাণ তন্ত্র এই তিনখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইল। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেমন আমিষখণ্ডের উপরে পড়ে, বিজয়া উক্ত গ্রন্থত্রয়কে সেই ভাবে গ্রহণ করিলেন। গভীর রাত্রে অভিনিবেশপূর্বক অনুবাদগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। চিন্তা ও প্রার্থনা সহকারে পাঠ করিতে করিতে করিতে যেন ঘনান্ধকারের মধ্যে আলোকের রেখা দেখিতে পাইলেন। তিনটী বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল।

প্রথমতঃ, ইহা তাঁহার প্রতীতি হইল যে, তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদর "তারা" নামে যাঁহাকে লক্ষ্য করেন, ভাগবতে যাঁহাকে "কৃষ্ণ" শব্দে অভিহিত করেন, এবং তাঁহার পরলোকগত পতি যাঁহাকে "পরব্রহ্ম" রূপে অর্চনা করিতেন, তাহা একই বস্তু। এই পরম বস্তু বা পরম পুরুষই সার, জগৎ তাঁহার আবরণ মাত্র; এবং সমুদায় প্রকৃতি ও মানব-জীবন তাঁহারই লীলা-ক্ষেত্র।

দ্বিতীয়তঃ, বিশুদ্ধ প্রীতি বা ভক্তি দ্বারাই এই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। "হে ভারত, সর্বভাবের সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হও"। গীতার এই উপদেশ তাঁহার চক্ষে সকল উপদেশের সার বলিয়া বোধ হইল।

তৃতীয়তঃ, সেই পরম পুরুষকে লাভ করিবার জন্য তপস্যা বা আত্মপ্রভাব অপেক্ষা, ভগবৎ-কৃপা বা দেব-প্রসাদের উপরে নির্ভর করাই শ্রেয়। কারণ, আত্ম-প্রভাবে অহঙ্কারের উৎপত্তি; দেব-প্রসাদে স্বর্গীয় বিনয়ের আবির্ভাব।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বিজয়া শাক্তগৃহে বাস করিয়াও কিয়ৎপরিমাণে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। এই ভাবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরে শান্তি ফিরিয়া আসিল। দরিদ্র গুপ্তধন আবিষ্কার করিলে যেরূপ আনন্দিত হয়, তিনিও সেই প্রকার আনন্দিত হইলেন। ধর্মসম্প্রদায় সকলের পরস্পর বিবাদ যেন তাঁহার দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তিনি সকলের মধ্যে এক অপূর্ব সামঞ্জস্য দর্শন করিতে লাগিলেন; এবং নিজে সর্বান্তঃকরণের

সহিত সেই পরম পুরুষের কৃপার উপরে নির্ভর করিতে লাগিলেন। এই নির্ভরের ভাব তাঁহার জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বহিরাকৃতিতেও পরিবর্তন লক্ষিত হইল। অন্তরে প্রেমের স্ফূর্তি হওয়াতে তাঁহার নিরবদ্য গৌরকান্তির উপরে কি এক পবিত্র আভা পড়িল, যাহাতে তাঁহাকে যেন কোনও উন্নততর লোকের অধিবাসী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে বৈশাখে হরচন্দ্র অনুতপ্ত চিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন, সে বৈশাখে বিজয়া এই নব আলোকের মধ্যে বাস করিতেছেন।

হরচন্দ্র এখনও নশিপুরে ফিরেন নাই। শঙ্কর রাসের আমোদের বিবরণ শ্রবণ করা অবধি অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া আছেন; এবং কর্তা শুনিলে কি বলিবেন, মনে মনে কেবল এই আশঙ্কা করিতেছেন। তিনি পূর্বের ন্যায় লোকের সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা কহিতেছেন না; এবং সকল কাজই যেন একটু অন্যমনস্ক ভাবে করিতেছেন। কর্তা মহাশয় এই ভাব লক্ষ্য করিয়া এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "শঙ্কর! তোমাকে কয়েকদিন হতে কিছু বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন?" শঙ্কর উত্তর করিলেন, "একটা অশুভ সংবাদ পেয়ে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন আছি।" কর্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অশুভ সংবাদ?" শঙ্কর বলিলেন, "সেটা আপনার শুনে কাজ নাই।"

কর্তা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন না। ভাবিলেন, এমন কিছু গোপনীয় কথা হইবে, যাহা তাঁহাকে বলিবার নয়। এই কথোপকথনের দুই তিন দিন পরে, একদিন অপরাহ্ণে তর্কভূষণ মহাশয় কথকতার আসরে একজন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের মুখে সিংহযোড়ের আমোদের বিবরণ শুনিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হরচন্দ্র সে সঙ্গে ছিল ও বাইনাচে প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া বাজাইয়াছে।" শুনিয়া তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। প্রথমে ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "না, তা কি হয়; হর এমন কাজ কর্‌বে কেন?" সংবাদদাতা বলিলেন, "সেই চিমে ঘোষ ও জহরলাল গ্রামে এসে যাকে তাকে এই সব কথা বল্‌ছে। গ্রামের বালক বৃদ্ধ যুবা সকলের মুখে এই কথা শুন্‌বেন।"

শুনিতে শুনিতে তর্কভূষণ মহাশয়ের হৃদয় ভূগর্ভবর্তী আগ্নেয় গিরির দ্রব-ধাতু-পুঞ্জের ন্যায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। হরচন্দ্র যে সিংহযোড়ের রাস দেখিব বলিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি জানেন। সে কি এমনি প্রতারক! শঙ্কর অদূরে বসিয়া এই সমুদায় কথোপকথন শ্রবণ করিতেছেন, এবং ভাবিতেছিলেন, এই বারেই বিপদ বাধিল। ইতিমধ্যে তর্কভূষণ মহাশয় ডাকিলেন, "শঙ্কর"! শঙ্কর সবিনয়ে নিকটস্থ হইলেন। তর্কভূষণ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে হরের বিষয়ে কি শুনিতেছি, তুমি কি কিছু জান?" শঙ্কর আর গোপন রাখিতে পারিলেন না; বলিলেন, "আপনি যা শুনেছেন সত্য! আমি দুই তিন জায়গা হতে পত্র পেয়েছি, সকলেই এক কথা বলেন। সে দিন যে আপনি আমাকে এক অশুভ সংবাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর আমি বলেছিলাম এ সংবাদ আপনার শুনে কাজ নাই; সে এই সংবাদ।"

তর্কভূষণ মহাশয়ের স্বভাবটা এইরূপ ছিল, যে অল্প ক্রোধের কারণ হইলে অনেক সময়ে তিরস্কার করিতেন, গালি দিতেন, ও কর্কশ কথা বলিতেন, কিন্তু ক্রোধটা যখন অতি গভীর হইত, তখন একেবারে মৌনী হইয়া যাইতেন; এবং প্রসুপ্তমীন হ্রদের ন্যায় ঘোর গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেন। তখন তাঁহার দিকে

তাকাইতেও কাহারও সাহস হইত না। আজও সেই ব্যাপার হইল। তিনি কথকতা স্থান হইতে উঠিয়া আপনার বিশ্রামগৃহে একাকী গিয়া বসিলেন; এবং কথকত ভাঙ্গিবামাত্র কালীমন্দিরে বহুক্ষণ সন্ধ্যাবন্দনাতে যাপন করিয়া, অন্তঃপুে আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "আমি আজ আহার করব না। আমাকে কে ডাকিও না। হর যদি রাত্রে আসে, আমার সম্মুখে আসিতে বারণ করিয়া দিও।"

অন্তঃপুরে মহিলারা অগ্রেই কর্তার ক্রোধের সংবাদ পাইয়াছিলেন, সুতরা সকলেই নিস্তব্ধ। এমন কি, গৃহিণীও সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না একবার কি দুইবার বলিয়াছিলেন, "ভাতটা খেলে হতো না।" কিন্তু বিরা দেখিয়া সে অনুরোধ ত্যাগ করিয়াছেন।

তর্কভূষণ মহাশয়ের পরিবার মধ্যে এইরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন ভাব দুই তিন দি চলিয়াছে। আমোদ প্রমোদের সাড়া শব্দ নাই! শিশুরাও যেন কর্তার ক্রোধের ভ প্রাণ খুলিয়া খেলা করিতে পারিতেছে না! যখন তর্কভূষণ মহাশয় বাড়ীর মধে থাকেন, তখন বধূগণ পায়ের মল টানিয়া তুলিয়া গতায়াত করেন, যেন মলের শ করিতেও শঙ্কিত! সকলের মন ত্রাস-যুক্ত, কি হয় কি হয়! এমন সময়ে একদি সংবাদ আসিল যে, সেইদিন অপরাহ্নে হরচন্দ্র বাড়ীতে পেশীছিবেন। অমনি শঙ্ক পথে পথে পাহারা দিবার জন্য লোক বসাইয়া দিলেন; যেন হরচন্দ্র হঠাৎ কর্তা সম্মুখে আসিয়া না পড়ে। বাড়ীতে আসিবার যত পথ ছিল, সকল পথে লোক রহিল। অপরাহ্নে হরচন্দ্র বাড়ীর সন্নিধানে উপস্থিত। অমনি একজন লোক কর্তার ক্রোধের কথা তাঁহাকে অবগত করিল। হরচন্দ্রের পা আর উঠে না। একবা মনে করিলেন, "যে গৃহকে কলঙ্কিত করিয়াছি, তাহাতে আর প্রবেশ করিব না।" কিন্তু অবশেষে সকলের পরামর্শে খিড়কীর দ্বার দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন দেখিলেন, সকলেরই মুখ ভার; কেহই তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না কেবল শিবচন্দ্র ও শঙ্করের শিশু সন্তানেরা "ন কাকা এসেছে, ন কাকা এসেছে" বলিয়া একবার একটু কোলাহল করিবার উপক্রম করিল; তাহাও ত্বরায় নিবার করা হইল।

হরচন্দ্রের আগমনের সংবাদ পাইয়া শঙ্কর অন্তঃপুরে আসিলেন; এবং ক্রোধে অগ্নি-প্রায় হইয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। হরচন্দ্রের মুখে একটীও কথা নাই। তিনি আপনার ঘরের মেজেতে বসিয়া বাম করতলে গণ্ডস্থল রাখিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাটিতে আঁক কাটিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিতেছেন। অনেক ভর্ৎসনার পর শঙ্কর বলিলেন, "উত্তর দিস্‌নে যে?"

হর। মেজ-দা! উত্তর দিবার থাক্‌লে দিতাম; তুমি যা বল্‌চো তার চেয়ে বেশী বলা উচিত; আমার আর কিছু বল্‌বার নাই।

শঙ্কর। তবে এমন কাজ কর্‌লি কেন?

হর। কি আর বল্‌বো, সঙ্গ-দোষে।

শঙ্কর। তোকে দু'শবার বলেছি, সাবধান করেছি, তা কোন ক্রমেই শুনিস্‌ না যত অসৎ লোকের সঙ্গেই বেড়াস্‌; আমাদের বংশে জন্মে তোর এরূপ মতি হয় কি রূপে? তুই কার ছেলে তাকি তোর মনে থাকে না?

হর। মনে থাক্‌লে আর এরূপ করতে পারি?

শঙ্কর। শুন্‌তে লজ্জা হয়, বল্‌তে লজ্জা হয়, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে

বাজারের কতকগুলো স্ত্রীলোকের সঙ্গে ইয়ারকী দেওয়া—ছি! ছি! ছি! তুই গলায় দড়ি দিয়ে মর্।

হর। মেজ-দা! আমি তাদের সঙ্গে ইয়ারকী দিই নাই; আমি কেবল বাজিয়েছি।

শঙ্কর। ইয়ারকী আবার কাকে বলে? তারা কি তোর সঙ্গে মেশবার উপযুক্ত লোক? সে জায়গাটা আমাদের কুটুম্বস্থল, লোকে কি মনে কর্লে? বাবার নামটা একেবারে ডুবিয়ে এলি।

হর। আমি আর কি বল্বো, বাবার নামটা ডুবিয়ে এসেছি, তাতে কি আর সন্দেহ আছে?

শঙ্কর। এখন কি হবে? বাবা ত শুনেছেন।

হর। বাবা যে সাজা দেবেন মাথা পেতে নেব; আমি তাঁর কুলাঙ্গার সন্তানের কাজ করেছি; এখন যদি বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেন্, দূর হয়ে যাব; সেই আমার উপযুক্ত সাজা।

শঙ্কর দেখিলেন, হরচন্দ্র যথার্থ অনুতপ্ত; এ অবস্থায় তাহাকে আর অধিক তিরস্কার করা কর্তব্য নয়। বলিয়া গেলেন, "একটু সাবধানে থাকিস্. বাবার সম্মুখে হঠাৎ যাস্নে।"

বিজয়া নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। হরচন্দ্র তাঁহার অপেক্ষা তিন বৎসরের ছোট; তাঁহাকে তিনি বালক-কাল হইতে ভালবাসেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্রের কথা শুনিয়া কিছু দিন হইতে তাঁহার প্রতি অতিশয় অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার চক্ষে জল দেখিয়া ও তাঁহার প্রকৃত অনুতাপের লক্ষণ দেখিয়া যেন তাঁহার প্রতি দ্বিগুণ স্নেহ উপস্থিত হইল; তিনি হরচন্দ্রের তক্তপোষে বসিয়া অনেকক্ষণ নানা কথা কহিয়া তাঁহাকে একটু শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গৃহিণী আসিয়া কতক তিরস্কার, কতক স্নেহ, কতক দুঃখ, মিশাইয়া অনেক কথা বলিলেন। হরচন্দ্র কেবল কাঁদিলেন, কোনও উত্তর করিলেন না।

হরচন্দ্রের বাটীতে আগমনের কথা কর্তা মহাশয় বোধ হয় গৃহিণীর মুখে শুনিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে তাহার কিছুই প্রমাণ পাওয়া গেল না। পূর্বের ন্যায় সকল কাজ করিতে লাগিলেন; গৃহের পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধান, পাঠনা, অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্যা, সমাগত প্রতিবেশীদিগের সহিত আলাপ, আহার, বিশ্রাম, সকলি পূর্ববৎ চলিল; কেবল তাঁহার মুখের উপরে একটু বিষাদের মেঘ পড়িয়া রহিল। হরচন্দ্রের দুর্দশার কথা আর কি বলিব! ঐ মেঘটুকু তাঁহার পক্ষে দুঃসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। ইহা অপেক্ষা পিতা কেন তাঁহাকে খড়ম-পেটা করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন না! তিনি দিন-রাত্রি নেত্রজলে ভাসিতে লাগিলেন। এমন সময়ে স্ত্রীপুত্র নিকটে নাই। তাঁহার পত্নী আরও কয়েক মাস পিত্রালয়ে থাকিবেন; সুতরাং হরচন্দ্র এক্ষণে ঘোর একাকী। তিনি বাড়ীর বাহির হন না; গ্রামের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না; সর্বদাই নিজ শয়ন-গৃহে বসিয়া থাকেন। অপরাহ্নে একবার গিয়া কথকতার নিকটে বসেন, তাহাও গোপন ভাবে। যখন কথকঠাকুর ভগবানের করুণার বিষয় বর্ণন করেন, তখন তাঁহার নয়নে দর দর ধারা বহিতে থাকে।

বিজয়াকে গৃহকার্যে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিতে হয়, সুতরাং দিনের বেলা

তিনি অধিকক্ষণ হরচন্দ্রের নিকটে বসিতে পান না। তথাপি সকল কাজের মধে এক একবার আসিয়া তাঁহার সহিত দুই চারিটী কথা কহিয়া যান, ও সর্বদাই তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করেন। তিনি আর একটা কাজ করিয়াছেন ভাগবত ও গীতার মধ্যে যে যে স্থান তাঁহার নিজের ভাল লাগিয়াছিল, সেই সকল স্থল হরচন্দ্রকে পড়িতে দিয়াছেন। হরচন্দ্র সমস্ত দিন মনোযোগ সহকারে সেই সকল স্থল পাঠ করেন; সন্ধ্যার পর বিজয়ার অবসর হইলেই দুইজনে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্যন্ত সেই সকল বিষয়ে নানাপ্রকার কথাবার্তা হয়। সময়ে সময়ে দেখিয়াছি কোনও গ্রন্থ পাঠ করিয়া সমাপ্ত করিলে তাহার একটী কি দুইটী বিশেষ উক্তি আমাদের স্মৃতিতে বিশেষরূপে লাগিয়া থাকে। তৎপরে কিছুদিন সেই উক্তিগুলি আমাদের মনে ঘুরিতে থাকে; আমরা যেখানে যাই, যাহা করি, মধ্যে মধ্যে সেই শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া থাকি। হরচন্দ্রেরও সেই দশা ঘটিল। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকটী তাঁহার স্মৃতিতে লাগিয়া রহিল;—

বদন্তি তত্ত্বত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অর্থ- দ্‌গণ সেই অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া জানেন ইনিই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয় থাকেন।”

হরচন্দ্র সংস্কৃতে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠদিগের ন্যায় ব্যুৎপন্ন না হইলেও ব্যাকরণ ও কাব্যের যতদূর পড়িয়াছিলেন, তাহাতে সামান্য সংস্কৃতের অর্থ-গ্রহণের শক্তি জন্মিয়াছিল; অতএব বিজয়ার ন্যায় কেবলমাত্র অনুবাদ তাঁহার ভরসা নহে তিনি পূর্বোক্ত শ্লোকটী কণ্ঠস্থ করিলেন। যখন তখন উহা উচ্চারণ করেন; এবং আপনার মনে মনে বলেন, “ঠিক, ঠিক, এই ত কথা।” বস্তু ত একই, নামভেদ মাত্র; লোকে না জানিয়া ক্ষুদ্র করিয়া ফেলে ও বিবাদে সময় পর্যবসান করে।

ইহা শুনিয়া সকলেই বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন, যে যেমন টিকা বি গুলের আগুন অজ্ঞাতসারে একটী হইতে আর একটীতে লাগিয়া যায়, তেমনি বিজয়ার হৃদয়ের বিশ্বাসের অগ্নি ইতিমধ্যেই হরচন্দ্রের হৃদয়ে লাগিয়া গিয়াছে কেনই বা লাগিবে না? বিজয়া প্রতিদিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে ও রাত্রি ১১টা ১২টা পর্যন্ত হরচন্দ্রের সহিত যাপন করেন। দুইজনে কেবল ঐ কথা। স্বর্ণ রৌপ্যাদি কঠিন ধাতু সকল অনলের উত্তাপে যখন দ্রবীভূত হয়, তখনি তাহাদিগকে পিটিয়া মনোমত করিয়া গড়িতে পারা যায়। তেমনি মানব-মন অনুতাপানলে যখন তরলতা-প্রাপ্ত, তখনি তাহাকে গড়িতে পারা যায়। সুতরাং বিজয়ার হৃদয়ের ভাব অতি সহজেই হরচন্দ্রের অন্তরে মুদ্রিত হইয়া গেল। তিনি বিজয়ার সহিত একভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। আধ্যাত্মিক সাহচর্যের এমনি গুণ যে অন্তরে অন্তরে বিজয়ার প্রতি হরচন্দ্রের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে ঐ নারীমূর্তি তাঁহার উদ্ধার সাধনের জন্য প্রেরিত দেবকন্যাস্বরূপ বিজয়ারও হৃদয়ের গভীর স্নেহ হরচন্দ্রের উপরে ন্যস্ত হইল। পূর্বে তিনি অপরাপর ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে যেরূপ সাধারণ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, তেমনি তাঁহাকেও দেখিতেন। মধ্যে তাঁহার স্বভাব চরিত্রের বিষয় শুনিয়া বরং অশ্রদ্ধাই জন্মিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার অকৃত্রিম অনুতাপ ও নবজীবনের সঞ্চার দেখিয়া

তাঁহার উপরে প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিল; এবং সেই ভালবাসা, চিন্তা ও ভাবের বিনিময় দ্বারা, দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। রাত্রে তাঁহারা উভয়ে যখন ধর্ম-তত্ত্বের আলোচনাতে ও শাস্ত্রচর্চাতে নিযুক্ত থাকেন, তখন কোথা দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যায় তাহা বুঝিতেও পারেন না।

ভাগবতের পূর্বোক্ত শ্লোকটীর ন্যায় গীতার কয়েকটী শ্লোকও হরচন্দ্রের স্মৃতিতে লাগিয়া গেল। যথা :—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শাশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

অর্থ :—"মানুষ যদি দুরাচারদিগের অগ্রগণ্য ব্যক্তিও হয়, তথাপি যদি আমাকে অনন্যমনা হইয়া ভজনা করে, তবে সেই একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া জানিও; কারণ সে ত্বরায় ধর্মাত্মা হয়; এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে অর্জুন! নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।" গীতা, ৯ম অধ্যায় ৩০।৩১ শ্লোক।

হরচন্দ্র আপনার মনে মনে এই শ্লোকদ্বয় যখন উচ্চারণ করিতেন, তখন চক্ষের জল রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার বোধ হইত স্বয়ং ভগবান তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞা জানাইতেছেন। তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া বলিতেন, "ভগবান! তোমার ভক্ত কখনও বিনাশ পাইবে না? তবে কৃপা কর যেন আমি অনন্যগতি হইয়া তোমাকে ভজনা করিতে পারি।"

এইরূপে কথকতা শ্রবণ, ভাগবত ও গীতা পাঠ, এবং সর্বোপরি বিজয়ার পবিত্র সাহচর্য, এই ত্রিবিধ কারণে এক মাস অতীত না হইতেই হরচন্দ্রের মনে গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। পূর্বের হরচন্দ্র আর রহিল না। তিনি যতই একান্ত মনে ঈশ্বর-চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অন্তরে বল, আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি অগ্রে আপনার উন্নতি বিষয়ে এক প্রকার নিরাশ হইয়াছিলেন; এক মাসের মধ্যেই সে নিরাশা বিদূরিত হইয়া আত্মোন্নতির প্রবল আকাঙ্ক্ষা আগুনের ন্যায় হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। বিজয়া এই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রে হরচন্দ্র বিজয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ছোট পিসি! তুমি আমাকে কি পরামর্শ দেও?"

বিজয়া। প্রথম পরামর্শ—তোমাকে কুসঙ্গগুলি বিষের ন্যায় বর্জন কর্‌তে হবে!

হরচন্দ্র। সে ত করেছি। আর কি সে পথে যাই? তৎপরে কি করা কর্তব্য?

বিজয়া। তৎপরে, আত্মোন্নতির জন্য চেষ্টা কর্‌তে হবে। লেখা পড়া যে ছেড়ে দিয়েছ, তা দিলে চল্‌বে না। তোমার ত খাবার পরবার ভাবনা নেই; আবার পড়া-শুনা আরম্ভ কর।

হরচন্দ্র। এত বয়সে কি আর লেখাপড়া হবে?

বিজয়া। কেন হবে না? যত্নের অসাধ্য কি আছে? রামমোহন রায় ২২ বৎসর বয়সের সময় ঘরে বসে ইংরাজী পড়তে আরম্ভ করে নিজের চেষ্টায় এমন ইংরাজী শিখেছিলেন যে, তাঁর ইংরাজী লেখা দেখে এখন বড় বড় ইংরাজীওয়ালাদের তাক্ লেগে যায়।

ইংরাজীর নাম শুনিয়াই হরচন্দ্রের মনের একটা গূঢ় সংকল্প প্রকাশ হইয়া

পড়িল। তিনি বলিলেন,—"ছোট পিসি! ইংরাজী পড়ার কথা যদি বল্‌লে, তবে আমার একটা মনের কথা বলি। আমি ভেবেছি, ইংরাজী শিখে, ও হাতের লেখাটা তৈরী করে একটা কাজকর্মের চেষ্টা দেখ্‌বো; কারণ সংস্কৃত শিখে বামন-পণ্ডিতি কর্ম করাতে বিশেষ উন্নতির আশা নাই। একটা কাজও করতে হবে, আলস্যে বসে থাক্‌লে ত চল্‌বে না।"

বিজয়া। তোমার যে এমন সুমতি হয়েছে, এটা বড় সুখের বিষয়। কিন্তু তাহলে তোমাকে খুব পরিশ্রম কর্‌তে হবে, এবং মন প্রাণ দিয়ে লাগ্‌তে হবে।

হরচন্দ্র। এত অসুবিধার ভিতর গাওনা বাজনা যদি শিখ্‌তে পেরে থাকি, ইংরাজীটা আর শিখে নিতে পারবো না? তবে কিনা বাড়ীতে থাক্‌লে শেখা হবে না; আমাকে কল্‌কেতায় বড়দার বাসাতে গিয়ে থাক্‌তে হবে।

বিজয়া। বেশ কথা, তোমার এ পরামর্শ আমার বড় ভাল লাগ্‌ছে। আমি দাদাকে বলে তোমায় কল্‌কেতায় যাবার যোগাড় করে দিচ্ছি। যাও তুমি কল্‌কেতায় যাও; ভগবান তোমার শুভ সঙ্কল্প সাধনের সহায় হউন।

হরচন্দ্র। কিন্তু ছোট পিসি! তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে; তোমার মুখের উৎসাহ-বাণী না শুন্‌লে আমি এ দুষ্কর ব্রত রাখ্‌তে পারবো না। তোমার মত আমাকে কেউ ভালবাস্‌বে না। (এই কথা বলিতে হরচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল।)

বিজয়া। আমার যাওয়া কি করে ঘটে?

হরচন্দ্র। কেন, কঠিনটা কি? সে ত ভালই হবে, ইন্দু, বিন্দু সেখানকার স্কুলে পড়বে; আর তুমি বাড়ীর গিন্নী থাক্‌লে বড়দা নির্ভাবনাতেই থাক্‌বেন। থাক্‌বার জায়গার ত অপ্রতুল নাই; না হয় পঞ্চু ও গোবিন্দ বাহিরের ঘরে থাক্‌বে।

ইন্দু ও বিন্দুর কলিকাতার স্কুলে পড়ার প্রস্তাবে বিজয়ার মন এক নূতন চিন্তাপথে ধাবিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাহা হইলে মন্দ হয় না। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কি? জ্যেষ্ঠের কি সে বিষয়ে সম্মতি হইবে? তাঁহার চিন্তার শেষ হইতে না হইতে হরচন্দ্র সরিয়া আসিয়া বিজয়ার হস্তদ্বয় নিজ করপুটের মধ্যে লইয়া বলিলেন,—"ছোট পিসি! আমার মাথার দিব্যি; বল যাবে? তোমার দুটী পায়ে পড়ি; তুমি কাছে না থাক্‌লে কি জানি কোন্ বিপদে পড়ে যাই।"

বিজয়া। ও কি হর! মাথার দিব্যি দেও কেন? আমার কি যেতে অনিচ্ছা? আমি কেবল ভাব্‌ছিলাম আমার উপরে সকল ভার, আমি গেলে চলে না; সে বিষয়ে দাদারও মত হবে না।

হর। তুমি যদি আমার খাবার বিষয়ে মতটা কর্‌তে পার, আমি তোমায় যাবার বিষয়ে মতটা করে নেব। তুমি গেলে এ বাড়ী বিশৃঙ্খল হবে জানি; তা বলে কি করবে? তুমি যতদিন এসনি ততদিন কি চলে নি? সেই রকম চল্‌বে। আমার খাতিরে তোমাকে যেতে হবে।

বিজয়া মনে মনে ভাবিলেন,—"কেবল যে তোমার খাতিরে যাইব তাহা নয়, আমারও খাতির আছে।" বাস্তবিক হরচন্দ্রের প্রতি বিজয়ার এমন একটু প্রীতি জন্মিয়াছে, যে তাহাকে একাকী যাইতে দিতে আর ইচ্ছা করে না। এই একমাস কালের মধ্যে তিনি চিন্তা ও ভাবের বিনিময় করিয়া যে সুখ পাইয়াছেন, দুই বৎসরে তাহা পান নাই। হরচন্দ্র এখন তাঁর সম-ভাবাপন্ন এবং ওদিকে প্রায় সমবয়স্ক। এরূপ ব্যক্তির সংসর্গ হইতে বঞ্চিত হওয়া অতীব ক্লেশকর। বিজয়া

ভাবিলেন, হরচন্দ্রকে ত যাইতে বলিতেছি, কিন্তু ও গেলে আমি কিরূপে থাকিব? কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন, "তোমার যে ভারি সাহস দেখ্‌ছি। তুমি আমার যাবার বিষয়ে দাদার মত করে নেবে! তিনি কি তোমার কথা শুন্‌বেন? বিশেষ, এখন তোমার উপরে চটে আছেন।"

হর। তুমি দেখো, তুমি তবে বাবাকে চেন না; বাবা বিজ্ঞ মানুষ, এমন কথা বল্‌বো যে একেবারে তলিয়ে বুঝতে পারবেন, ও মত দেবেন! তিনি হাজার চটুন, অল্প বাপেই ছেলে মেয়েকে এত ভালবাসে। তিনি আমার কথা নিশ্চয়ই রাখ্‌বেন।

বিজয়া। আমার যাওয়াটা বড় সহজ কথা নয়; আমি ভেবে দেখ্‌ব। এ বিষয়ে অনেক ভাব্‌বার আছে।

এই কথোপকথনের পর বিজয়া নির্জনে অনেক ভাবিয়া দেখিলেন। দুই দিন পরে একদিন প্রাতে হরচন্দ্রকে বলিলেন, "আমি ঠিক করেছি, আজ দাদাকে তোমার বিষয় বল্‌বো।" সেই দিন মধ্যাহ্নে আহারান্তে তর্কভূষণ মহাশয় নিজ শয়নগৃহে বিশ্রাম করিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে বিজয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তর্কভূষণ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিজয়া, কোনও কথা আছে নাকি?"

বিজয়া। এক মাসের অধিক কাল হয়ে গেল, হর বড় ক্লেশ পাচ্চে; বাড়ীর বাহির হয় না; কেবল ঘরে বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকে, মধ্যে মধ্যে কাঁদে; তোমার সম্মুখে আস্‌তে সাহস করে না। তুমি মাপ না কর্‌লে ত সে বাঁচে না।

তর্কভূষণ। আর মাপ কি? কাজটা অতি গর্হিত করেছিল, শুনেছি সেজন্য অনুতপ্ত হয়েছে। জগদম্বা তাকে সুমতি দিয়েছেন, সৌভাগ্যের বিষয়; চুকেই গেছে; এখন ভাল হয়ে চলুক।

বিজয়া। তার মনে ত একটা প্রতিজ্ঞা হয়েছে, যে সে কল্‌কেতায় বড় কর্তার কাছে গিয়ে থাক্‌বে ও যেরূপে হোক্‌ আপনার অবস্থার উন্নতি কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে।

তর্কভূষণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) পড়া শুনা কিছুই কর্‌লে না, অবস্থার উন্নতি করবে কি করে?

বিজয়া। সে ঘরে পড়ে একটু ইংরেজী শিখে নিয়ে, হাতের লেখাটা তৈয়ার করে, একটা কাজকর্ম যোগাড় করে নেবে।

তর্কভূষণ। নিজে কিছু কর্‌বার বুদ্ধি যে হয়েছে এটা শুভ বুদ্ধি বল্‌তে হবে। তবে এ বয়সে আর কি ঘরে বসে লেখা পড়া হওয়া সম্ভব? সংস্কৃত বিদ্যা আমাদের কুল-ক্রমাগত; তাই ভাল করে শিখ্‌লে না, ইংরাজী ত বিদেশীর ভাষা।

বিজয়া। সে ত বলে পারবে।

তর্কভূষণ। তারপর আর একটা কথা আছে। দেশে আমাদের চোখের উপরে থাকে; তাতেই ওর কুসঙ্গ যোটে; আর কল্‌কেতা ত সর্বনেশে স্থান, সেখানে ওকে দেখ্‌বে কে? আবার কি শিবকে একটা বিপদে ফেল্‌বে?

বিজয়া। বল যদি, তাকে ডাকি। তার মুখেই কেন শোন না?

তর্কভূষণ। আচ্ছা ডাক।

বিজয়া হরচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। হরচন্দ্র আসিয়াই সর্বাগ্রে পিতার চরণদ্বয়ের উপরে মস্তক রাখিয়া অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিলেন। অবশেষে বিজয়া ধরিয়া তুলিলেন। ক্রমে একটু শান্ত হইলে, তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রমুখাৎ তাঁহার প্রস্তাব শ্রবণ করিলেন, এবং তাঁহার অকপট অনুতাপ ও আত্মোন্নতির জন্য

একান্ত ব্যগ্রতা দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। সন্তান-বৎসল পিতা এক মুহূর্তের জন্য সর্বশেষোল্লিখিত দুশ্চিন্তার বিষয়টী ভুলিয়া গেলেন; সম্মতি দিবার সময়ে মনে হইল না সহরের প্রলোভনের মধ্যে কে তাহাকে দেখিবে! বলিলেন,—"তা যেতে চাও, যেও।" হরচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, নিজের যাওয়া বিষয়ে সম্মতি হইল, তখন বলিলেন,—"কিন্তু আমার যদিও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয়েছে, যে আপনার নামকে আর কলঙ্কিত করবো না, তথাপি সহর বড় ভয়ানক স্থান, চতুর্দিকে প্রলোভন, যদি দয়া করে ছোট পিসীকে যেতে দেন, তা হলে আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারবেন যে, আমাকে দেখ্‌বার একজন লোক আছেন।" হরচন্দ্রের এই কথাতে তর্কভূষণ মহাশয় আরও প্রীত হইলেন। ইহা তাঁহারই হৃদয়ের চিন্তার অনুরূপ কথা। কিন্তু বিজয়াকে দূরে প্রেরণ করা একটা নূতন বিষয়! এ বিষয়ে অনেক ভাবিবার আছে; সুতরাং তিনি একেবারে উত্তর দিতে পারিলেন না। বলিলেন—"সেটা ভেবে দেখ্‌তে হবে।" কিন্তু মনে মনে অনুভব করিলেন, তাঁহার সন্তানদের উপরে বিজয়ার যে শক্তি, তাহাতে হরচন্দ্রকে এ অবস্থায় কেহ যদি ঠিক রাখিতে পারে, তবে সে এক বিজয়া। ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে গেলেন।

বিজয়ার কলিকাতাতে গিয়া থাকিবার প্রশ্নটা হরচন্দ্র যত সহজ বিবেচনা করিয়াছিলেন তত সহজ নহে। তাঁহার এক দেবর কলিকাতাতে রহিয়াছেন। বিজয়া কলিকাতাতে থাকিবেন অথচ তাঁহার নিকটে থাকিবেন না, ইহা কিরূপ দেখায়? তৎপরে বিজয়া পুত্রকন্যাসহ থাকিতে গেলে শিবচন্দ্র সে ভার বহন করিতে পারিবেন কি না? যদি নশিপুর হইতে শিবচন্দ্রের সাহায্যের জন্য অর্থ প্রেরণ করিতে হয়, কি পরিমাণে প্রেরণ করিতে হইবে? যদি বিজয়াকে কলিকাতাতে গিয়া থাকিতে হয়, তবে জ্যেষ্ঠা বধূকেও সেই সঙ্গে প্রেরণ করা কর্তব্য; ইত্যাদি অনেক কথা ভাবিবার আছে। তর্কভূষণ মহাশয় কয়েকদিন মনে মনে সেই সকল প্রশ্নের আলোচনা করিলেন। কয়েকদিন চিন্তার পর স্থির হইল যে, গ্রীষ্মের ছুটীর পর, জ্যেষ্ঠা বধূ, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ, বিজয়া, ইন্দু, বিন্দু, হরচন্দ্র ও ভবেশ কলিকাতার বাড়ীতে গিয়া থাকিবেন। ভবেশের আর আনন্দের সীমা নাই; বিজয়ার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া যে কতবার আদর করিল, তাহা বলা যায় না; কারণ তাহার যাওয়ার বিষয়টা বিজয়াই উপস্থিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার ভাল স্কুলে পড়িবে এই তাহার মহা আনন্দ। তর্কভূষণ মহাশয় পত্রদ্বারা শিবচন্দ্রের সহিত সমুদায় বন্দোবস্ত সুস্থির করিয়া রাখিলেন।

১২

গ্রীষ্মের অবকাশ শেষ হইলেই পুত্রকন্যাসহ জ্যেষ্ঠা বধূ, ইন্দুভূষণ ও বিন্ধ্যবাসিনীসহ বিজয়া, হরচন্দ্র ও ভবেশ, কলিকাতার হাতীবাগানে, শিবচন্দ্রের বাসা বাটীতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। অবশ্য বলা বাহুল্য, যে তাঁহারা আসাতে বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বাটীর পুরাতন ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতে হইল। দুই একটী আশ্রিত উপরি লোককে বাধ্য হইয়া অন্যত্র থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইল; এবং গোবিন্দ ও পঞ্চু বাড়ীর ভিতর হইতে তাড়িত হইয়া বাহিরের

ঘর আশ্রয় করিল। যথাসময়ে ভবেশ, ইন্দুভূষণ ও বিন্ধ্যবাসিনীকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল; এবং এই নূতন গৃহস্থের গৃহস্থালি নূতন ভাবেই আরম্ভ হইল।

সকলেরই চিত্ত প্রসন্ন দেখা যাইতেছে। জ্যেষ্ঠা বধূ, নশিপুরে পাঁচ জনের একজন ছিলেন, অনেক পরিমাণে কর্তা ও কর্ত্রীর অধীন থাকিতেন। এখানে তিনি গৃহের কর্ত্রী, আপনার মনোমত সমুদায় কাজ করিতে পারেন। ইহা একটা সামান্য সুখের বিষয় নহে; সুতরাং তিনি প্রসন্ন। দ্বিতীয়, ভবেশের মন প্রসন্ন। সে কলিকাতাতে আসিয়াছে, ভাল স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, আজ মনুমেণ্ট, কাল কেল্লা, পরশু যাদুঘর, কত কি নূতন নূতন বিষয় দেখিতেছে; তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইবে না কেন? তৃতীয়, বিজয়ার মন প্রসন্ন। কলিকাতাতে আসিয়া তাঁহার নিজের জ্ঞানোন্নতির ও পুত্রকন্যার সুশিক্ষার আশা হইয়াছে। চতুর্থ, গোবিন্দ ও পঞ্চুর মন প্রসন্ন; তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার, সাহায্য করিবার ও ভালবাসিবার একজন লোক আসিয়াছেন। পঞ্চম, বিদ্যারত্ন মহাশয়ও নিতান্ত অপ্রসন্ন নহেন। যদিও শিশুগুলি আসাতে তাঁহার হাতীবাগানের বাড়ীর বহুদিনের নিস্তব্ধতা ভগ্ন হইয়াছে, সেজন্য তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত; তথাপি স্ত্রী পুত্র পার্শ্বে আসিলে কোন্ ধার্মিক গৃহস্থ না সুখী হন? সুতরাং তাঁহারও সুখ অনিবার্য। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুখী হরচন্দ্র। অনুতাপাগ্নি এখনও তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিতেছে; এবং সেই অগ্নি এক দুর্দমনীয় আত্মোন্নতির বাসনার আকার ধারণ করিয়াছে। উন্নতির উপায় হাতের নিকট আসিয়াছে, এজন্য তিনি প্রসন্ন। অতএব প্রসন্নচিত্তেই হাতীবাগানের বাড়ীর সমুদায় কাজকর্ম আরম্ভ হইল। বিজয়াকে এখানে আসিয়া আর ভাঁড়ারের ভার লইতে হয় নাই; কর্ত্রীর হস্তেই সে ভার রহিল; সুতরাং বিজয়া নিজ সন্তানদিগের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিবার অনেক সময় পাইতেছেন। পঞ্চু, ইন্দুভূষণ ভবেশ ও হরচন্দ্রকে ইংরাজী পড়াইতে লাগিলেন, এবং গোবিন্দ বিন্ধ্যবাসিনীকে পড়া বলিয়া দিবার ভার লইল। হরচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। সঙ্গীতশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার যে অভিনিবেশ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হইয়াছিল, ইংরাজীশিক্ষা বিষয়েও সেই অভিনিবেশ দেখা গেল। বালকেরা সচরাচর দশ দিনে যাহা পড়ে, তিনি একদিনে তাহা পড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন।

পঞ্চুর বিষয় এখন একটু বলা আবশ্যক হইতেছে। পঞ্চু গিরিশচন্দ্রের মাতৃষ্বসার পুত্র, সম্পূর্ণ নাম পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। দরিদ্রের সন্তান, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ভবনে থাকিয়া কোনও প্রকারে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন। বালককালে তিনি ডফ সাহেবের স্কুলে পড়িতেন। সেই সময়ে মিশনারি সাহেবেরা তাঁহাকে খ্রীষ্টান করিবার জন্য বিধিমতে লাগিয়াছিলেন। ১৮৪৫ সালে তাঁহার সমাধ্যায়ী ও সুহৃদ্ গুরুদাস মৈত্র যখন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন, পঞ্চুর বয়ঃক্রম তখন ১৬ কি ১৭। তখন বাস্তবিক সহরে জনরব উঠিয়াছিল, যে পঞ্চুও সেই সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম আশ্রয় করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক সে জনরব অমূলক। পঞ্চু কোনও দিন খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। তবে যীশুর চরিত্রের প্রতি ও বাইবেল গ্রন্থের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি, এই মাত্র। ইহার অতিরিক্ত আর একটু আছে। সে সময়ের অপরাপর শিক্ষিত যুবকের ন্যায় পঞ্চুও বিশ্বাস করেন, এদেশে ভাল কিছুই নাই এবং পশ্চিম হইতে যাহা কিছু আসে সকলি ভাল। ৩।৪ বৎসর হইল, পঞ্চু ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিতে যাইতেছেন। পঞ্চুর একটু বিশেষ শক্তি

আছে; তিনি মানুষের মন বদ্‌লাইয়া দিতে পারেন। গোবিন্দকে প্রায় নিজভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। যেখানে পণ্ডু সেই খানেই গোবিন্দ। এমন কি এক জনকে দেখিলেই অপরকে মনে হয়। পণ্ডু নিজে যাহা বিশ্বাস করেন তাহা প্রচার না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার সহিত সকল মতে মিলুক না মিলুক, সকলেই অনুভব করে, যে মানুষটা অতিশয় বিশ্বাসী, শ্রদ্ধাবান, আস্তিক, সরল ও পবিত্র-চেতা। এই জন্য যে ব্যক্তি দুই দিন তাঁহার সঙ্গে মেশে, সেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। পণ্ডুর একটা বিশেষ গুণ এই, তিনি বিদ্বেষ-বুদ্ধি কাহাকে বলে জানেন না; শিশুর ন্যায় ক্ষমাশীল ও সরল-চিত্ত। আজ যে ঘোর শত্রু ও মহা অনিষ্টকারী, কল্য সে ব্যক্তির বিপদের সময় পণ্ডু প্রাণ-মন দিয়া তাহার সাহায্য করিতে পারেন। এমন পর-দুঃখকাতর লোক প্রায় দেখা যায় না। ঈশ্বরের প্রতিও তাঁহার প্রগাঢ় প্রেম। ভক্তিভাবে কেহ ঈশ্বরের নাম করিলেই তাঁহার চক্ষে জলধারা বহে। তাঁহার গাইবার শক্তি নাই; কিন্তু তাঁহার কণ্ঠে ঈশ্বর-বিষয়ক সঙ্গীত অতি মধুর লাগে। ভক্তির এমনি গুণ!

বিজয়া হাতীবাগানের বাসাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, এই যুবকদলের উপরে তাঁহার শক্তি বিস্তৃত হইতে লাগিল। হরচন্দ্রের ত কথাই নাই, বিজয়ার পরামর্শ ভিন্ন তিনি কোনও কাজ করেন না; কোনও স্থানে যান না। পণ্ডু এবং গোবিন্দও তাঁহাকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। যে কিছু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, পণ্ডু আনিয়া উপস্থিত করেন এবং বিজয়া ও হরচন্দ্র মনোযোগ পূর্বক তাহা পাঠ করেন; এবং প্রায় প্রত্যহ সায়ংকালে সেই সকল বিষয়ে কথোপকথন হয়।

এইরূপে সাহিত্যালোচনা ও জ্ঞান-চর্চার দ্বারা সকলেরই জ্ঞানপিপাসা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে পণ্ডু বিজয়াকে স্বীয়ভাবাপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু বিজয়া স্বাধীন প্রকৃতির স্ত্রীলোক, সংসারে অনেক আঘাত পাইয়াছেন, অনেক চিন্তা ও সংগ্রাম করিয়াছেন, এবং সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া দৃঢ় ও স্বাবলম্বনশালিনী হইয়াছেন; তিনি স্রোতে ভাসিবার, বা কথাতে ভুলিবার, বা কাহারও পশ্চাতে দৌড়িবার লোক নহেন। তাঁহার হৃদয় বিনয়ে পরিপূর্ণ কিন্তু তাহা বলিয়া বিচারশক্তি ম্লান নহে। বরং তিনিই পণ্ডুকে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

এ পর্যন্ত সকলে বিজয়ার বিষয়ে যাহা জানিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার একটু অসাধারণত্ব দেখিতে পাইতেছেন। বাস্তবিক তাঁহার একটু অসাধারণত্ব আছে। বিশ্বনাথ তর্কভূষণকে কি অসাধারণ লোক বোধ হয় নাই? এরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেশে কয়জন পাওয়া যায়? সেই ভ্রাতার ভগিনী, সুতরাং বিজয়ারও অসাধারণত্ব স্বাভাবিক। সে সময়ে যে কতিপয় মহিলা সুশিক্ষিতা বলিয়া গণ্য ছিলেন, বিজয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাহাতে আবার তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা সহায়, সুতরাং তাঁহাতে যাহা দেখা যাইতেছে, অপর সাধারণ স্ত্রীলোকে তাহা দেখা যায় না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাইবেলের প্রতি পণ্ডুর অগাধ ভক্তি। তিনি মধ্যে মধ্যে বিজয়াকে বলেন,—"আপনি ধর্ম বিষয়ে এত চিন্তা করেন, এত বই পড়েন, বাইবেলখানা একবার পড়ুন না। বাইবেলের প্রতি লোকের যে বিদ্বেষ আছে, আপনার তা থাকা উচিত নয়।" বারবার এইরূপ অনুরোধ করাতে একদিন বিজয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, একখানা বাঙলা বাইবেল আমাকে এনে দিও, আমি পড়ে দেখ্‌ব।" তদনুসারে পণ্ডু একবার একখানা বাঙলা বাইবেল আনিয়া দিলেন।

বিজয়া মনোযোগ পূর্বক সমুদায় পাঠ করিলেন। যীশুর চরিত্র দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইলেন; কিন্তু অলৌকিক ক্রিয়া সকল এবং অপরাপর অনেক কথা তাঁহার তৃপ্তিপ্রদ হইল না। একদিন সায়ংকালে পণ্ডু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাইবেল পড়িয়া আপনার কেমন লাগিল?"

বিজয়া। ভালই, ইহাতে অনেক সদুপদেশ আছে।

পণ্ডু। যীশুর চরিত্র কিরূপ দেখিলেন?

বিজয়া। অতি উৎকৃষ্ট; কিন্তু আমাদের পুরাণের ন্যায় ইহাতে অনেক আষাঢ়ে গল্প আছে।

পণ্ডু। ওগুলো ছেড়ে দিন; ওগুলো বোঝা যায় না। কিন্তু ধর্মের আদর্শটা কেমন? অতি উচ্চ বোধ হয় না?

বিজয়া। এমত মহৎ বিষয়ে আমাদের কথা কহিতেই নাই; বিশেষ সাধু মহাত্মাদের চরিত আলোচনা ভয়ে ভয়েই করিতে হয়; কিন্তু ধর্মের আদর্শের কথাটা যখন বল্‌লে, তখন বাধ্য হয়ে বল্‌তে হচ্চে, আদর্শটা বড় উচ্চ বোধ হলো না।

পণ্ডু। কেন, উচ্চ নয়?

বিজয়া। আমি ত ভাগবতে ও গীতাতে ইহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ দেখ্‌তে পাই।

পণ্ডু। সে কি! বাইবেলের কাছে কি আপনার ভাগবত কি গীতা লাগে?

বিজয়া। আমি ত দেখ্‌লাম বাইবেলে যে ভক্তির উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা সকাম ভক্তি।

পণ্ডু। আপনি কোথায় সকাম ভক্তি দেখ্‌লেন?

বিজয়া। সর্বত্রই, কেন যীশুরই উক্তির ভিতরে।

পণ্ডু। কৈ কোন্ জায়গায় বলুন দেখি?

বিজয়া। রসো, তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

এই বলিয়া বিজয়া বাঙলা বাইবেল আনিয়া কতকগুলি স্থান পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন।

পণ্ডু পূর্বে এত অনুধাবন করিয়া পড়েন নাই। এখন দেখিলেন যে, এজগতে একগুণ দিলে স্বর্গে দশগুণ পাইবে, এরূপ ভাবটা অনেক স্থলেই রহিয়াছে। পাঠ সাঙ্গ হইলে বিজয়া বলিলেন, "তুমি কেন ভেবে দেখ না, এখানে একগুণ দিলে আর একস্থানে দশগুণ পাবে, এটা কি ধর্ম, না, বাণিজ্য-ব্যাপার? বিশুদ্ধ প্রেম ভিন্ন কি ধর্ম হয়?"

পণ্ডু। ওগুলো সে সময়কার অজ্ঞ মানুষদের প্রবৃত্তি লওয়াবার জন্য বলা হয়েছিল।

হর। এখন যদি কেউ বলে যে আমাদের প্রাচীন ধর্মে যে স্বর্গ নরক, বা দণ্ড পুরস্কারের কথা আছে, সে সব তামসিক লোকেদের প্রবৃত্তি লওয়াবার জন্য, তা হলে অমনি লাফিয়ে উঠ কেন? দুই ত একই কথা।

পণ্ডু। আমাদের স্বর্গ আর বাইবেলের স্বর্গ কি এক?

হর। এক বৈ কি? আমাদের স্বর্গে না হয় দুটো বিদ্যাধরী আছে; তাদের স্বর্গে না হয় কতকগুলো পরী আছে; ঊনিশ-বিশ করে আর ফল কি?

বিজয়া। স্বর্গের জন্য ধর্ম, এই ভাবটাই ভাল নয়। দেখ দেখি এ বিষয়ে ভাগবত ও গীতার উপদেশ কি চমৎকার!

এই বলিয়া বিজয়া গীতা আনিলেন। হরচন্দ্র নিম্নলিখিত দুই শ্লোক ও তাহার অর্থ পড়িয়া শুনাইলেন :—

কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

অর্থ—যাহারা কামাত্মা ও স্বর্গবাসলোলুপ, তাহারাই জন্মকর্মফলপ্রদ এবং ভোগৈশ্বর্যের সাধনীভূত বহুল ক্রিয়াতে রত হয়; যাহাদের চিত্ত ভোগৈশ্বর্যে রত ও তদ্দ্বারা অপহৃত, তাহাদের যোগে বা ধর্মে একাগ্র বুদ্ধি হয় না।

বিজয়া। কেমন কথা? ঠিক কি না? তোমরা স্বর্গকে যেমন সুন্দর করেই চিত্রিত কর না কেন, যে স্বর্গ চায় সে ধর্ম চায় না; সে না জানিয়া ভোগৈশ্বর্য চাহিতেছে।

পণ্টু। সে ত ঠিক কথা; ঈশ্বরকে আর-কিছুর জন্য ভালবাসিলে সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়। এ ত সহজ কথা! বাঃ, গীতাতে এমন ভাল কথা আছে? ওঃ! ঐ জন্যই বুঝি নবীন সংস্কৃত পড়্তে এত ভালবাসে?

হর। কেন থাক্বে না? তোমরা ত ঘরে কি আছে তা দেখ্বে না, কেবল পশ্চিম দিকেই মুখ ফিরিয়ে আছ।

পণ্টু। আমাকে তবে গীতা একবার পড়ে দেখ্তে হচ্চে।

বিজয়া। বেশ কথা, পড়ে দেখ।

অদ্য সায়ংকালে যেরূপ কথোপকথন দেখা গেল, প্রায় প্রত্যহই এই প্রকার ধর্ম, নীতি ও সমাজসংক্রান্ত বিষয়ে কথোপকথন হইত। বিদ্যারত্ন মহাশয় অনেক বিষয়ে তাঁহার পিতার অপেক্ষা অনুদার লোক, কিন্তু দোষই বলুন আর গুণই বলুন, তাঁহার একটা স্বভাব আছে। তিনি গৃহের তত্ত্বাবধান বিষয়ে অতি উদাসীন। কে কি করিতেছে, সেদিকে তাঁহার বড় একটা দৃষ্টি নাই। বিশেষতঃ, তিনি গৃহে অল্প সময়ই থাকেন। প্রাতে গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়া যান, স্নানান্তে রাজবাড়ী হইয়া পূজাদি সারিয়া প্রায় ১২টার সময় গৃহে প্রত্যাগত হন। আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া কিয়ৎকাল দুই একজন ছাত্রকে একটু পড়াইয়া রাজবাড়ীতে গমন করেন। অনেক দিন সায়ংসন্ধ্যা সেইখানেই সমাধা করেন। তৎপরে রাত্রি প্রায় ৯টা ৯॥০টার সময়ে আসিয়া আহারান্তে শয়ন করেন। সুতরাং ভবনের মধ্যে যে নূতন চিন্তা ও ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তিনি অনেক দিন লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। কেবল তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্র অনুভব করিতে লাগিলেন, যে গৃহের মধ্যে যেন কি একটা হাওয়া বহিতেছে; এবং পরিবারস্থ সকলকেই যেন উদার-ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছে। গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, কালে ইহার ফল না জানি কিরূপ দাঁড়ায়।

বিজয়া কলিকাতায় আসিয়া কয়েকবার তাঁহার কনিষ্ঠ দেবরের গৃহে গিয়াছিলেন। তাঁহার দেবরের ভবনের সংলগ্ন বাড়ীতে মৃত নরোত্তম ঘোষের পরিবারগণ বাস করেন। ঐ নরোত্তম ঘোষের প্রথম পুত্রের নাম ব্রজরাজ ঘোষ। তাঁহাদেরই ভবনে পূর্বোল্লিখিত নবরত্ন সভার অধিবেশন হয়। বিজয়া পণ্টুর মুখে ঐ সভার বিবরণ অগ্রেই শুনিয়াছিলেন। একবার দেবরের ভবনে অবস্থানকালে ব্রজরাজের ভগিনী কৃষ্ণকামিনী ও তাঁহার মাতৃস্বসা মাতঙ্গিনীর সহিত তাঁহার

পরিচয় হয়। দেখিলেন, উভয়েই লেখা পড়া জানেন, এবং উভয়েই নবরত্ন সভার গোঁড়া। সেইবারেই তিনি উক্ত সভার সভাপতি নবীনচন্দ্র বসুকেও দূরে হইতে দেখিয়াছিলেন। তিনি হাতীবাগানে ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চুকে বলিলেন, "কৃষ্ণকামিনী মেয়েটী ভাল বটে, বিনম্র, ধীরবুদ্ধিমতী ও ভদ্র, দেখ্‌লেই বোধ হয় ভিতরে সার বস্তু কিছু আছে। কিন্তু বাপু! তোমার মাতঙ্গিনীটী কোনও কর্মের মেয়ে নয়; ব্যাপিকা, হাল্‌কা ও অসার; ওটী যেন মাকাল ফল, বাহিরে রূপটা খুব আছে, ভিতরটা তেমন নয়। হাঁ, নবীন বাবুকে দেখ্‌লে বোধ হয় বটে মানুষটার মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব আছে; আকৃতিতে যেমন সুপুরুষ, প্রকৃতিতেও বোধ হয় তেমনি সৎ লোক হবেন।"

পঞ্চু। নবীন ত একটা দেবতা!

এইরূপে জ্ঞানচর্চা, শাস্ত্রালোচনা ও সৎপ্রসঙ্গে হাতীবাগানের যুবকদলের দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। ১৮৫৪ সাল অতীত হইয়া ১৮৫৫ সালের কিয়দংশ অতীত হইল। এই দেড় বৎসরের মধ্যে হরচন্দ্র কি আশ্চর্য উন্নতি লাভ করিলেন। অধ্যবসায়ের কি গুণ! স্বাবলম্বনের কি মহীয়সী শক্তি! সচরাচর বালকেরা ৫।৬ বৎসরে যতদূর শিক্ষা করে, হরচন্দ্র দেড় বৎসরে ততদূর শিখিয়া ফেলিলেন। হাতের লেখা এক প্রকার গুছাইয়া লইলেন। কেবল তাহা নহে, অঙ্কবিদ্যাতে আশ্চর্য দক্ষতা দেখাইতে লাগিলেন। সংগীত-বিদ্যার সহিত অঙ্কবিদ্যার কি কোনও গূঢ় জ্ঞাতিসম্বন্ধ আছে? জানি না; হরচন্দ্রের যে অঙ্কবিদ্যাতে এত প্রতিভা খুলিবে তাহা কে অগ্রে জানিত? উক্ত বিদ্যার দ্বার একবার তাঁহার সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইবামাত্র, তিনি এক এক দিনে এক একটা বিষয় শিখিয়া ফেলিতে লাগিলেন। বিজয়ারও উন্নতি স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারা গেল। একদিকে যেমন ধর্মগ্রন্থপাঠ ও চিন্তার দ্বারা তাঁহার অন্তরের ভক্তিভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল, অপর দিকে তেমনি সর্বদা জ্ঞানালোচনা দ্বারা চিত্তের প্রশস্ততা ও জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইরূপে একপ্রকার সুখেই দিন কাটিয়া যাইতেছে এমন সময়ে বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। খ্যাতনামা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক পুস্তক প্রচার করিলেন। মধ্যরাত্রে সুষুপ্ত পল্লীর মধ্যে প্রকাণ্ড কামানের গোলা পড়িলে, লোকে যেমন চমকিয়া উঠে, ও দিশাহারা হয়, তেমনি ঐ পুস্তক নিদ্রিত বঙ্গবাসীর চিন্তাক্ষেত্রে পতিত হইল! যে-দেশে বিধবাদিগের প্রতি এত কঠিন শাসন, যে-দেশে কিছুদিন পূর্বে বিধবাদিগকে মৃত পতির সহিত জ্বলন্ত চিতানলে নিক্ষেপ করা হইত; যে-দেশে একাদশীর দিন প্রাণ গেলেও বিধবাদিগকে একবিন্দু জল পান করিতে দেয় না, সে-দেশের বিধবাদিগের পুনর্বিবাহের প্রস্তাব! এ সৃষ্টি ছাড়া কথা কোথা হইতে আসিল! কে এ বিদ্যাসাগর? এ কিরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত? এ ব্যক্তি এতদিন কোথায় লুকাইয়া ছিল? সংবাদ পত্রে, পথে, ঘাটে, যথায় তথায় এইরূপ চর্চা চলিল। ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের টোল চতুষ্পাঠীতে এই বিচার বিশেষরূপে উঠিল। কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বচন উধৃত করিয়া, শাস্ত্রানুগত মীমাংসার দ্বারাই, বিধবার পুনর্বিবাহ স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নশিপুরে তর্কভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে এই প্রসঙ্গ উঠিলে, তিনি যে যে বচন উধৃত হইয়াছে ও যেরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহা ধীরভাবে শুনিয়া বলিলেন, "যে সকল বচন উধৃত করেছেন তা

ঠিক; আর যে মীমাংসা করেছেন, তাও প্রশংসনীয়। মানুষটী বড় বুদ্ধিমান দেখছি; কিন্তু এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিচারে ফল কি? কোন্ কাজটা আমরা শাস্ত্রানুসারে করি? এ সকল বিষয়ে দেশাচারই বলবৎ। বিশেষতঃ বিধবাদের অন্তরে এরূপ প্রবৃত্তির উদয় না করে বৈরাগ্যের উপদেশ দেওয়াই ত ভাল; তাহারা ব্রহ্মচর্য ও কুলধর্ম লয়ে থাকে ইহাই ত ধর্ম-সঙ্গত।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কিন্তু অন্য প্রকার ভাব ধারণ করিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ব্রাহ্মণাধম, অকাল-কুষ্মাণ্ড, ভ্রষ্টাচার, নাস্তিক প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিলেন; এবং গিরিশচন্দ্রকে বলিয়া দিলেন ঐ পুস্তক যেন কেহ বাড়ীতে না আনে।

বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক পুস্তক প্রচার হইবামাত্র পণ্ডু বিধবা-বিবাহের একজন প্রধান পাণ্ডা হইয়া উঠিলেন; এবং প্রতিদিন সায়ংকালে বিজয়ার সহিত ঐ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিলেন। একদিন বিজয়া পণ্ডুকে বলিলেন, "তোমার কথা শুন্‌লে বোধ হয় যে বিধবার পক্ষে বিবাহ করাটা যেন পরম ধর্ম!"

পণ্ডু। ধর্ম বৈ কি? দেশাচারের যে অত্যাচার, তাতে দৃষ্টান্ত দেখান ত উচিত।

বিজয়া। (হাসিয়া) দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে বিবাহ? এ কথা মন্দ নয়। বিবাহ করা না করা মানুষের ইচ্ছাধীন। বিধবারা বিবাহ না করে বৈরাগ্যধর্ম ও ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে থাকে, সেই ত ভাল। দেশে বিবাহের কি অপ্রতুল আছে? বিবাহ কর্‌বার লোক ঢের আছে। বিধবাগণ পর-সেবাতেই থাকুক।

পণ্ডু। আপনি এমন কথা বললেন? এ দেশের কোটি কোটি বিধবা কি দুঃখে দিন যাপন করছে, একবার ভাবলেন না।

বিজয়া। দুঃখ দুঃখ করে রব তুল্‌লে হবে না, বিবাহ না করাটাই কি এত দুঃখ? বিধবারা বিবাহ কর্‌তে পারে না, এটা দুঃখের কারণ নয়; কিন্তু অধিকাংশ বিধবার কর্‌বার কিছুই নেই, সর্বদা পরমুখাপেক্ষী ও পরাধীন হয়ে থাক্‌তে হয়, এটাই দুঃখের বিষয়। যারা আত্মীয় স্বজনের সেবাতে নিযুক্ত আছে, কর্‌বার কাজ যথেষ্ট আছে, আদর যত্ন আছে, তাদের বিবাহের দরকার কি? তোমরা স্ত্রীলোককে এত হীন মনে কর কেন যে তারা বিবাহের অভাবে দুঃখে মরে যায়? আত্ম-সুখান্বেষণ অপেক্ষা পরসেবা কি ভাল নয়?

পণ্ডু। তা সত্য হলেও একটা ভাবতে হবে; আপনা হতে পরের সেবা করা এক কথা, আর হাত পা বেঁধে করান আর এক কথা।

বিজয়া। হাত পা আবার কে কার বাঁধলো?

পণ্ডু। বিধবাকে জোর করে ব্রহ্মচর্য করালে কি হাত পা বাঁধা হলো না? আপনা হতে ব্রহ্মচর্য করা ভাল, না জোর করে করান ভাল?

বিজয়া। এ কথাটা ঠিক বটে, জোর করে ব্রহ্মচর্য করা ভাল নয়। আমার বোধ হয় এমন নিয়ম থাকা উচিত কোনও বিধবা ইচ্ছা করলে বিবাহ করতে পারবে কিন্তু তা বলে বিধবার পুনর্বিবাহটাকে একটা ধর্মকর্মের মধ্যে করে তোলা ভাল নয়; বরং যাতে বিধবাদের বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্যের প্রবৃত্তি বাড়ে এমন উপদেশ দেওয়াই ভাল।

পণ্ডু। আপনি যা বল্‌লেন বিদ্যাসাগর তাই করবার চেষ্টা করছেন; ঐ রকম আইন করবার চেষ্টায় আছেন।

বিজয়া। সে ভাল। আমার কিন্তু বিধবাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য দেখ্‌তে ভাল লাগে; ইচ্ছা হয়, বিধবাদের জন্যে এমন একটা জায়গা করি, যেখানে তারা কিছু কিছু লেখা পড়া শিখ্‌তে পারে ও পাঁচ রকম কাজ শিখে, করে খেতে পারে।

পণ্ডু। ও বাবা! সে এখনও অনেক দিনের কথা।

এই কথোপকথনের পর দিনেই পণ্ডু একখানা বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক পুস্তক আনিয়া বিজয়াকে পড়িতে দিলেন। তিনি জানিতেন না যে বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত পুস্তক বাড়ীতে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাহা হোক পুস্তকখানি যখন আসে, তখন বড় বৌ সেখানে ছিলেন। তিনি রাত্রে সরলভাবেই স্বীয় পতিকে ঐ পুস্তকের কথা বলিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় যখন শুনিলেন যে পণ্ডু ঐ সর্বনেশে পুস্তক আনিয়াছে ও বিজয়াকে পড়িতে দিয়াছে, তখন তাঁহার এতই ক্রোধের আবির্ভাব হইল যে একবার মনে করিলেন সেই রাত্রেই উঠিয়া গিয়া পণ্ডুকে তাড়াইয়া দেন; কিন্তু সে রাত্রে কিছুই বলিলেন না। কোনও প্রকারে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই প্রথম কর্ম পণ্ডু ও গোবিন্দকে তাড়াইয়া দেওয়া। প্রাতে উঠিয়া দুইজনকে ডাকিয়া বলিলেন, "এখানে জায়গার বড় অপ্রতুল; অতিথি অভ্যাগত আসিলে থাক্‌বার বড় অসুবিধা হয়, অতএব তোমরা দুদিনের মধ্যে একটা জায়গা দেখে নেও। এখানে থাক্‌বার সুবিধা হবে না।" কাহারই বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তকই এই অনর্থের মূল। বিদ্যারত্ন মহাশয় বাহিরে গেলেই বিজয়া হাসিয়া বড় বৌকে বলিলেন, "বড় কর্তার এত রাগ কেন? তাঁর কি ভয় হয় পাছে আমার মন বিগড়ে যায়?" হাসিলেন বটে, কিন্তু আত্ম-মর্যাদাতে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিল; এবং পণ্ডু ও গোবিন্দ চলিয়া যাইবে ইহা ভাবিয়া মনে ক্লেশ হইল।

পণ্ডু ও গোবিন্দ অন্য স্থানে বাসা করিল বটে, কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আসিত। পণ্ডু, হরচন্দ্র ইন্দুভূষণ ও ভবেশকে ইংরাজী পড়া বলিয়া দিত, গোবিন্দ বিন্ধ্যবাসিনীকে পড়াইত, এবং পূর্ববৎ নানাবিষয়ে কথোপকথন চলিত। বিদ্যারত্ন মহাশয় পণ্ডু ও গোবিন্দকে তাড়াইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, জানিতেন না যে তাহারা প্রতিদিন আসে। ১৮৫৬ সালের বৈশাখের প্রারম্ভে আবার তাহাদিগকে বাটীতে আসিতে পর্যন্ত নিষেধ করিলেন। ইহার ফল এই হইল যে বিজয়া তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে ঘন ঘন দেবরের বাটীতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে নরোত্তম ঘোষের পরিবারদিগের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা জন্মিয়া গেল; এবং নবরত্ন সভার উৎসাহী সভ্যাদিগের সহিতও একটা সম্পর্ক দাঁড়াইল। বিদ্যারত্ন মহাশয় পণ্ডু ও গোবিন্দকে তাড়াইবার হেতু প্রদর্শন করিয়া নশিপুরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বিজয়ার নামেও কিঞ্চিৎ অভিযোগ ছিল। সেই পত্র পাওয়া অবধি তর্কভূষণ মহাশয় চিন্তিত রহিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই কি ঘটিল?

১৩

১৮৪৫ সালে হিন্দু কালেজের প্রথম শ্রেণীতে নবীনচন্দ্র বসু নামে একটী যুবক পড়িত। ঐ যুবকটী শোভাবাজারনিবাসী, সুপ্রীমকোর্টের প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত হলধর বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। নবীনের কিছু অসাধারণত্ব আছে, তাহা ক্রমেই প্রকাশিত হইবে। নবীন স্বভাবতঃ চিন্তাশীল, বিনয়ী, সৎ ও আত্মোন্নতিতে মনোযোগী। স্বশ্রেণীস্থ ও সমবয়স্ক যুবকদিগের নাস্তিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, সুরা-পানাসক্তি তাঁহার ভাল লাগে না; একারণ নবীন একপ্রকার সমবয়স্কদিগের সঙ্গে মেশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা যখন আমোদ প্রমোদ করে, তখন তিনি এক কোণে বসিয়া নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। সেই সময়েই উক্ত কালেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ব্রজরাজ ঘোষ ও সুরেন্দ্রলাল গুপ্ত নামে দুইটী বালক পাঠ করিত। তাহারা উভয়ে বয়সে নবীনের অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের ছোট। এই দুইটী বালক সর্বদা এক সঙ্গে বেড়াইত, যেন হরিহরাত্মা। ঘটনাক্রমে নবীনের সহিত ইহাদের পরিচয় হওয়াতে নবীন দেখিলেন, ইহারাও তাঁহার সমভাবাপন্ন; ইহারাও শিক্ষিত যুবকগণের উচ্ছৃঙ্খলতা ভালবাসে না; এবং সেইজন্যই দুই জনে একত্রে দূরে দূরে বেড়ায়। তিনজনে স্বভাবতঃ বন্ধুতা জন্মিল। নবীনের মনে তখন আত্মোন্নতির বাসনা আগুনের মত জ্বলিতেছিল। তিনি সে অগ্নি অপর যুবক-দ্বয়ের হৃদয়ে লাগাইয়া দিলেন। তিন জনে স্থির করিলেন যে, প্রতিদিন কালেজের ছুটীর পর, কালেজের ঘরে এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা বসিয়া সাধু ও মহাজনগণের জীবনচরিত গ্রন্থ সকল পড়িবেন। এইরূপ পাঠ কিছুদিন চলিল। ক্রমে কালেজ হইতে আসিতে বিলম্ব হয় বলিয়া তাঁহাদের অভিবাকগণ বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং প্রতিদিন কালেজের ছুটীর পর বাসা পরিত্যাগ করিয়া, সপ্তাহে তিন দিন ব্রজরাজদিগের ভবনে, সন্ধ্যার সময় এক ঘণ্টা করিয়া পড়িবার নিয়ম করা হইল। প্রত্যেকে কালেজের ছুটীর পর বাড়ীতে গিয়া পরিশ্রমান্তে বায়ুসেবনের জন্য বাহির হইয়া, ব্রজরাজদিগের বাটীতে আসিয়া যুটিতেন; এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল একত্রে কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন।

অধ্যয়ন ও প্রাণ খুলিয়া আলোচনা করিতে করিতে এই যুবকত্রয়ের মধ্যে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হইল। তাহারা পরস্পরের সহিত সুমিষ্ট বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হইল। প্রথমতঃ, তাহাদের অন্তরে ধর্ম ও নীতির প্রতি আস্থা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই সময়কার শিক্ষিত যুবক মাত্রেই ইংরাজী ভাষার গোঁড়া ছিল। তাহারা ইংরাজীতে পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিত, ইংরাজীতে চিঠি পত্র লিখিত; ইংরাজী সাহিত্য পড়িতে ভালবাসিত; এবং তৎসঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগবিহীন ছিল। কিন্তু এই তিন জন যুবক ইংরাজীর ন্যায় বাঙ্গলা সাহিত্যেরও অনুরাগী। সে সময়ে যে কিছু উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল, ইহারা সে সকলই মনোযোগ পূর্বক পড়িয়াছিল, এবং পরস্পরে কথোপকথন করিবার ও চিঠি পত্র লিখিবার সময় বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করিত। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য ইংরাজীশিক্ষিত যুবকদিগের অনেকে সুরাপানের পক্ষপাতী, ইহারা সুরাপানের ঘোর বিরোধী; তাহারা অনেকে নাস্তিক, ইহারা আস্তিক। এতদ্ব্যতীত অপরাপর বিষয়ে তদানীন্তন শিক্ষিত দলের সহিত ইহাদের সম্পূর্ণ মিল ছিল; অর্থাৎ তাহাদের ন্যায় ইহারাও প্রাচীন ধর্ম ও প্রাচীন

রীতিনীতির প্রতি আস্থাহীন এবং ইহারাও সমাজসংস্কারপ্রয়াসী; অর্থাৎ পৌত্তলিকতা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির বিরোধী এবং স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, ব্রজরাজের কনিষ্ঠ সহোদর মথুরেশ ঘোষ ও তাঁহার সুহৃদ্ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় আসিয়া, ইহাদের সঙ্গে যোগ দিল। এই পাঁচ জনে কিছুদিন একত্রে পাঠ, ও আলোচনাদি চলিল। তখনও কোনও প্রকার বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রণয়ন করা হয় নাই। কে সভাপতি, কে সম্পাদক, সভার উদ্দেশ্য কি, কে সভ্য হইবার উপযুক্ত, ইহার কিছুই স্থির হয় নাই। দল বাড়াইবার জন্য ইহাদের কিছুই ব্যগ্রতা ছিল না; বরং পূর্বাবধি নবীনের মনে দল না বাড়াইবার দিকেই ইচ্ছা ছিল। আত্মোন্নতিই ইহাদের উদ্দেশ্য, সুতরাং সংখ্যাবৃদ্ধিতে সে কার্যের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। এজন্য আপনাদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য ইহাদের উৎসাহ ছিল না। ১৮৫০ সালে আপনা আপনি ইহাদের সংখ্যা ৯ জন হইল; তখন সভার নাম "আত্মোন্নতিবিধায়িনী" করা হইল; এবং কর্মচারী নিয়োগ আবশ্যক হইল। তদনুসারে নবীনচন্দ্র বসু সভাপতি, এবং ব্রজরাজ ঘোষ সম্পাদক হইলেন। সপ্তাহে তিন দিন সম্মিলিত হইবার নিয়ম রহিত করিয়া প্রতি শনিবার সন্ধ্যার পর সম্মিলিত হইবার নিয়ম করা হইল। এক শনিবার কোনও গ্রন্থ পাঠ করা হইত, এবং তৎপরবর্তী শনিবার একজন সভ্য বাঙ্গলাতে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া আনিতেন, তাহা পাঠ ও তদ্বিষয়ে আলোচনা হইত। নবীন নিয়ম করিলেন যে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া কার্যারম্ভ হইবে। তদনুসারে হয় পঞ্চু মুখে একটু প্রার্থনা করিয়া কার্যারম্ভ করিতেন, না হয় একটী লিখিত প্রার্থনা সকলে ভক্তিভাবে পাঠ করিয়া কার্যারম্ভ করিতেন। ১৮৫৪ পর্যন্ত ইহাদের সভ্যসংখ্যা ৯ জন ছিল; ইহারা নূতন লোক লইতে চান নাই। উক্ত বর্ষে স্থির হইল যে, নয় জনের অধিক সভ্য লওয়া হইবে।

সেই সঙ্গে সঙ্গেই আরও কয়েকটী নিয়ম প্রবর্তিত হইল। প্রথম, সর্ববাদি-সম্মত না হইলে কেহ সভার সভ্য হইতে পারিবে না; দ্বিতীয়, যিনি সভ্য হইতে চাহিবেন, তাঁহাকে 'জীবনে কখনও সুরাপান করিব না', বলিয়া একটী প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে; তৃতীয়, প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, সভাতে যাহা কর্তব্য বলিয়া স্থির হইবে, তাহা প্রাণপণে পালন করিবার চেষ্টা করিব। সভাস্থ কাহারও আপত্তি না থাকিলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে সভার আলোচনাতে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হইবে, কিন্তু তাঁহারা আলোচনাতে যোগ দিতে পারিবেন না। এইরূপ নিয়ম হওয়ার পর আরও কয়েকটী উৎসাহী যুবক ইহাদের সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইল।

ইহাদের সভ্যসংখ্যা বাড়িল বটে, কিন্তু ব্রজরাজের মাতা ইহাদের সভার যে নবরত্ন নাম দিয়াছিলেন, সেই নবরত্ন নামটা রহিয়া গেল। সচরাচর সভা কথাটা উচ্চারণ করিলে মনের সমক্ষে যেরূপ ছবিটা উপস্থিত হয়, ইহাদের সভা সেরূপ নহে। অর্থাৎ এখানে বক্তৃতা ও বাদানুবাদ হয় না; অথবা সভার কার্যবিবরণ লিখিয়া সংবাদপত্রে মুদ্রিত করা হয় না; কিন্তু ইহাতে যাহা হয় তাহা কোনও সভাতে হয় না। এখানে আত্মোন্নতির প্রবল আকাঙ্ক্ষা অগ্নির মত প্রাণে প্রজ্বলিত হয়; চরিত্র গঠনের প্রবৃত্তি প্রবল হয়; চরিত্র গঠনের সহায়তা হয়; স্বার্থনাশের বাসনা উদ্দীপ্ত হয়; জ্ঞান মার্জিত ও উন্নত হয়; সভ্যদিগের মধ্যে এক অদ্ভুত ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয়; এবং সর্বোপরি ঈশ্বর-প্রীতি ও মানব-প্রীতির অদ্ভুত উদ্দীপনা

হইয়া থাকে। এখানে প্রেমিক হৃদয়ের সহিত প্রেমিক হৃদয়ের সংস্পর্শ; জ্ঞান-স্পৃহার দ্বারা জ্ঞান-স্পৃহার উদ্রেক; চরিত্রের সংস্পর্শে চরিত্রের উৎকর্ষ এবং ভক্তের সংস্রবে ভক্তির বৃদ্ধি! ইহাদের সংবাদ দেশের লোক কেহ জানে না; কিন্তু কলিকাতার এক নিভৃত কোণে বসিয়া ইহারা এক অদ্ভুত শক্তি জাগাইতেছে! এক অপূর্ব সাধনাতে নিযুক্ত হইয়াছে! তাহার ফল ক্রমেই দৃষ্ট হইবে।

সভাসংসৃষ্ট সকল ব্যক্তির বিশেষ পরিচয় দিবার অবসর নাই; কাহারও কাহারও পরিচয় ক্রমে জানা যাইবে। এক্ষণে কেবল এই সভার সভাপতি ও ইহার আত্মা ও প্রাণ স্বরূপ নবীনচন্দ্র বসুর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, নবীন শোভাবাজারনিবাসী সুপ্রীমকোর্টের মোক্তার হলধর বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম সুরেশচন্দ্র বসু। তাঁহাদের পিতা গোপীমোহন বসু হিজলী কাঁথীতে নিমক মহলে কি কাজ করিতেন, যাহাতে বিলক্ষণ উপার্জন ছিল। কিন্তু প্রাচীন রীতি অনুসারে গোপীমোহন সমুদায় টাকা নিজ জ্যেষ্ঠ হলধরের হস্তে অর্পণ করিতেন; এবং নিজ কর্মস্থানে পরিবার লইয়া যাইতেন না। কালে গোপীমোহনের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। সকলে আশা করিয়াছিলেন, যে গোপীমোহনের ধনে এই শোভাবাজারস্থ বসু পরিবার ত্বরায় কলিকাতার ধনী পরিবারদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবে। কিন্তু কয়েক বৎসর কর্ম করিতে না করিতে গোপীমোহন কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন সন্তানেরা নাবালক। তদবধি জ্যেষ্ঠ হলধর বসু ইহাদের পালনের ভার লইলেন। তিনি নিজে অপুত্রক, সুতরাং তাঁহার পত্নী পুত্রনির্বিশেষে ইহাদিগকে পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সুরেশচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং গিরিবালার বিবাহ হইয়া গেল। যথাসময়ে সুরেশচন্দ্র বিষয় কর্মে নিযুক্ত হইলেন। গবর্ণমেণ্ট তোষাখানায় একটী উত্তম চাকুরী পাইলেন। কিন্তু তাঁহার চাল চলন বৃদ্ধ হলধর বসুর ভাল লাগিত না। তিনি আপনার বেতনের সমগ্র জ্যেষ্ঠতাতের হস্তে অর্পণ করিতেন না; কিয়দংশ দিয়া অবশিষ্ট নিজ হস্তে রাখিতেন ও তদ্দ্বারা বাবুগিরি করিতেন; ইহা কৃপণস্বভাব বৃদ্ধের মনঃপূত হইত না। সে জন্য তিনি সুরেশচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে তিরস্কার করিতেন। প্রায় তিন বৎসর গত হইল সুরেশচন্দ্র একজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া একটা ব্যবসায়ে কিছু টাকা লাগাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার পিতার উপার্জিত অনেক সহস্র টাকা তাঁহার জ্যেঠা মহাশয়ের নিকট আছে। তদনুসারে বৃদ্ধ হলধর বসুর নিকট দুই হাজার টাকা চাহিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন,—"টাকা কোথায় পাব।"

সুরেশ। কেন, আমাদের পিতা যাহা কিছু উপার্জন করতেন, তাহা ত আপনার হস্তেই সমর্পণ করতেন। শুনতে পাই, তিনি ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা রেখে গেছেন। তা'হতে আমাকে দু হাজার টাকা দিতে পারেন না?

হলধর। কে বলিল ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা রেখে গেছে? যৎসামান্য যা কিছু রেখে গিয়েছিল, তা তোমরা এত বৎসর ধরে খাওনি? তোমাদের বিয়ে থাওয়া হলো কিসে? সে কি অক্ষয় ভাণ্ডার যে চিরদিন থাক্‌বে?

সুরেশ। আমি এত কথা জানি না। আমার দুই হাজার টাকার দরকার; আপনি দেবেন কি না?

হলধর। কোথা হতে দেব?

সুরেশ। তবে আপনার অন্নও আমি আর খেতে চাই না। আমার দিন এক প্রকার চলে যাবে।

এই বাদানুবাদের পরেই সুরেশচন্দ্র পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বাসা করিলেন; এবং বৃদ্ধ হলধর বসুর নামে নালিশ করিবার চেষ্টায় বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু নালিশ করিবেন কি অবলম্বনে? গোপীমোহন কোনও উইল রাখিয়া যান নাই। জ্যেষ্ঠের নিকট কোন দিন কত টাকা পাঠাইয়াছেন, তাহারও কোনও নিদর্শন নাই। একটা কিম্বদন্তী আছে মাত্র। নিদর্শনের মধ্যে একখানা পুরাতন খাতাতে কয়েক সহস্র টাকার উল্লেখ আছে। তাহাও কাহার টাকা, কোন্ উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন, তাহার কিছু নির্দেশ নাই। সুরেশচন্দ্র তদবলম্বনেই নালিশ করিতে প্রস্তুত, কেবল নবীনের জন্য পারিয়া উঠিতেছেন না। তিনি পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়া গেলে, নবীন তাঁহার সমভিব্যাহারী হন নাই। হলধর বসুর পত্নীকে তিনি "রাঙ্গা মা" বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। রাঙ্গা মাই নবীনকে প্রতি-পালন করিয়াছেন। গোপীমোহনের মৃত্যুর পূর্বেই নবীনের মাতার মৃত্যু হয়, সুতরাং জননীর কথা নবীনের কিছুমাত্র স্মরণ নাই। তিনি রাঙ্গা মাকেই মা বলিয়া জানেন, তাঁহারই ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছেন। রাঙ্গা মাও নবীনকে পুত্রাধিক স্নেহ করিয়া থাকেন। নবীনের দোষ তিনি দেখিতে পান না। নবীন যাহা করে, তাহা তাঁহার ভাল লাগে: এজন্য স্বীয় পতির সহিত তাঁহার সর্বদা বিবাদ হয়। সুরেশচন্দ্র যখন পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন নবীন রাঙ্গা মার মুখ চাহিয়া জ্যেষ্ঠের সঙ্গী হইতে পারিলেন না; বৃদ্ধ হলধর বসুর বিকৃত মুখভঙ্গী সহ্য করিয়াও শোভাবাজারের বাড়ীতে পড়িয়া রহিলেন। সুরেশ-চন্দ্র নালিশ করিতে উদ্যত হইলে নবীন বলিলেন,—"প্রাণ থাক্‌তে তা পারবো না। পিতৃহীন অবস্থায় যিনি পালন করেছেন, তিনিই পিতা। পিতার নামে আদালতে নালিশ! তা হবে না; সর্বস্ব যায় যাক্।" কাজেই নালিশটা হইয়া উঠিল না।

ইহার পর নবীনকে শোভাবাজারের বাড়ী ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাহার বিবরণ পরে আসিতেছে।

১৮৫৬ সালের বৈশাখের প্রারম্ভে একদিন নবরত্ন সভার অধিবেশন। কিঞ্চিৎ পূর্বে নবীনচন্দ্র, ব্রজরাজ ও মথুরেশ তিনজনে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে পণ্ডু উপস্থিত।

নবীন। এস হে পণ্ডু, তোমারও যে দেখি আমার দশা ঘট্‌লো। বিদ্যারত্ন মহাশয় নাকি তোমাকে বাড়ীতে যেতে নিষেধ করেছেন?

পণ্ডু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হাঁ করেছেন।

নবীন। আমি মনে করেছিলাম বাড়ী হতে বহিষ্কৃত হবার গৌরবটা বুঝি একলারই হলো, তা নয়, তুমি আবার আমার অংশী হলে।

পণ্ডু। আমাকে ত আর গলাধাক্কা খেতে হয় নি?

নবীন। (উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া) ঠিক বলেছ! আমার গৌরবটার অংশী হবার যো নাই; গলাধাক্কাটা আমার বেশী।

ব্রজরাজ। আচ্ছা নবীন! তোমার জ্যেঠার কাণ্ডটা কি ভাই? বুড়োর ত ছেলে পিলে কিছুই হলো না; তোমরাই বংশধর; এরূপ স্থলে ত তোমাদের উপরেই টান হবার কথা, কিন্তু কি অস্বাভাবিক ব্যাপার! তোমাদের উপরেই যত বিদ্বেষ। লোকের মুখে শুনি বুড়োর খুব টাকা আছে। টাকাগুলি নিয়ে কর্‌বেন কি?

মরবার সময়ে কি গলায় বেঁধে মরবেন?

নবীন। বিশ্বেষের অপরাধ কি ভাই? আমরা ত বিধিমতে জ্বালাতন করতে ছাড়ি নাই। আমাদের দিক দিয়ে তাঁদের বিচার কর্‌লে চল্‌বে না। তাঁদের দিক দিয়ে আমাদের বিচার কর্‌তে হবে। প্রথমতঃ দেখ, কতদিন ধরে আমার বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি কর্‌ছেন, আমি কোনক্রমেই মত দিই না। গত বৎসর একেবারে কন্যা দেখে, ঠিক করে, সে ভদ্রলোকদিগকে আনিয়ে, আমাকে ধরে বস্‌লেন, সে সব কথা ত শুনেছ। আমি অসম্মত হওয়াতে তাঁর কি প্রকার অপমান বোধ হলো তা একবার বিবেচনা কর। সেই অবধি কতদিন ত আমার সঙ্গে কথাই কইলেন না। তার পরে আবার গত বৎসর বাসন্তী পূজার সময়ে কৌশল করে পালালাম, ঠাকুর প্রণাম করাটা এড়ালাম, সেটা কি তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন না? তার পর আবার এ বৎসর পূজার সময় এক বিবাহ উপস্থিত কর্‌লেন, তাও ভঙ্গ করে দিলাম বুঝ্‌তেই ত পার, এরূপ কর্‌লে কিরূপ বিরক্তি জন্মাবার কথা।

ব্রজরাজ। যাই বল, তোমার মত এত বড় ভাইপোর গলায় হাত দিয়ে বাড়ী হতে বার করে দেওয়াটা কিছু অতিরিক্ত।

নবীন। (হাসিয়া) রাগটা বড় বেশী হয়েছিল; তা না হলে কি গলায় হাত দিতেন?

মথুরেশ। তুমি তখন কি কর্‌লে?

নবীন। কি আর করবো? মুখটী বুজিয়ে বাড়ী হতে চলে এলাম ব্যাপারটা কি হয়েছিল বলি শোন। চিরদিন ত বৎসরের মধ্যে এক কর্ম বাসন্তী পূজা হয়ে থাকে। এবার কোন্ ব্যক্তির পরামর্শে জানি না, জগদ্ধাত্রী পূজা করলেন। আমি ত পূর্ব হতেই সরে পড়্‌বার পরামর্শ করে রেখেছি, কিন্তু পূজার দিন প্রাতে উঠে আমাকে আদেশ কর্‌লেন, "তুমি কোথাও যেও না, লোকজন আস্‌বে, তাহাদিগকে আদর অভ্যর্থনা কর্‌বে, বাড়ীতে থাক্‌বে।" কি করি বাধ্য হয়ে রইলাম। পূজা শেষ হলে আমাকে ঠাকুর প্রণামের জন্য ডাকলেন। আমি বিনয় করে বল্‌লাম, "আমি তা পার্‌বো না।" দেখ্‌লাম বড়ই ক্রোধ হলো, কিন্তু তখন কিছু বললেন না। পর দিন ঠাকুর ভাসাতে নিয়ে গেলো। আমি কোথা হতে বেড়িয়ে এসে দেখি বাহিরবাড়ীতে জ্যেঠা মহাশয় চাকরের সঙ্গে কি কথা বল্‌ছেন। আমাকে দেখেই বল্‌লেন, "তোমার যেখানে জায়গা থাকে যাও, আমার বাড়ীতে তোমার স্থান নেই।" শুনে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তার পর মনে কর্‌লাম একবার রাঙ্গা মাকে বলে আসি; এই ভেবে যেমন বাড়ীর ভিতরের দিকে যাচ্ছি, অমনি জ্যেঠা মহাশয় গর্জন করে আমার দিকে ছুটে এলেন, "আবার বাড়ীর ভিতরে যাস্ যে?" আমি বল্‌লাম, "রাঙ্গা মার সঙ্গে দেখা করে আসি।" তিনি বল্‌লেন, "আর রাঙ্গা মার সঙ্গে দেখা করে না।" এই বলেই একেবারে আমার গলা ধরে ঠেলে বাড়ীর বাহির করে দিলেন। আমি আর কি কর্‌বো, রাস্তাতে দাঁড়িয়ে একটু ভাব্‌লাম, তারপর দাদার বাসাতে গেলাম।

ব্রজরাজ। তার পর আর কি বাড়ীতে যাওনি?

নবীন। না, রাঙ্গা মার জন্যে বড় মন কেমন করে, চাকর এসে বলে তিনি দিন রাত্রি কেবল কাঁদেন, আমার জন্যে সর্বদাই খাবার পাঠান, যেতে অনুরোধ করেন, কিন্তু কি করি আমি যেতে পারিনে।

পঞ্চু। সুরেশ বাবুর বাসাতে তোমার সব সুবিধা মত হয়েছে ত?

নবীন। সে দুঃখের কথা বল কেন? সে দাদা আর নাই! তিনি কি এক ব্যবসা খুলেছেন, তাতে আর কিছু হোক না হোক কুসঙ্গী কতকগুলো জুটেছে; খুব মদ খেতে আরম্ভ করেছেন; রাত্রে বাড়ীতে এসে এত উৎপাত করেন যে আমার পড়াশুনা কিছুই হয় না; মেজাজ এম্নি খারাপ হয়েছে, যে ঘরের লোকের টেঁকা ভার। সে এক যন্ত্রণা হয়েছে। আমি স্থির করেছি স্বতন্ত্র বাসা কর্‌বো। কেবল বৌদিদির জন্যে পারিনে। সে ভদ্রলোকের মেয়ে যে আমাকে কি ভালবাসেন তা বল্‌তে পারিনে। একদিন না দেখ্‌লে অস্থির হন। এখন আমি কাছে থাকাতে তিনি একটু সুখে আছেন। আমি চলে এলে তিনি অন্ধকার দেখ্‌বেন। সেই জন্যেই এত দিন কোথাও যেতে পারিনে। কিন্তু আর চল্‌ছে না; এইবার পালাতে হবে।

ব্রজরাজ। নবীন, তুমি কেন আমাদের বাড়ীতে এসে থাক না। ওপাশের ঐ ঘরটা ত পড়েই থাকে; তুমি ত বেশ থাক্‌তে পার; আর তুমি এলে মা খুব আনন্দিত হবেন; তুমি ত আমাদের ঘরের লোক হয়ে গেছ।

মথুরেশ। তা বৈ কি, তুমি কাল তোমার জিনিষপত্র নিয়ে এখানে এস।

নবীন। রসো, হঠাৎ কি এলেই হয়, অনেক ভেবে দেখ্‌তে হবে।

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, ইত্যবসরে সুরেন্দ্রলাল গুপ্ত ও তৎপরে অপরাপর সভ্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ঈশ্বরের স্তুতিবাদসহকারে সভার কার্য আরম্ভ হইল। অদ্যকার সভাতে দুইটী গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইবে। প্রথম, বিধবা বিবাহের যে আন্দোলন উঠিয়াছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের সভার কর্তব্য কি? দ্বিতীয়, সুরেন্দ্রলাল গুপ্ত পূর্ব সভাতে প্রস্তাব করিয়াছেন যে তাঁহাদের সভার অবলম্বিত সত্য সকল প্রচারের জন্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলে ভাল হয়; সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হইবে কিনা?

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে পণ্ডু বলিলেন,—“বিদ্যাসাগরের সহিত আমাদের বিশেষ-ভাবে যোগ দেওয়া কর্তব্য। তিনি যে মহৎ কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, আমাদের সভার তাহাতে যোগ দেওয়া উচিত।”

নবীন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যের সঙ্গে আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ যোগ আছে। তিনি এই প্রস্তাব উপস্থিত করে যে দেশের অসংখ্য স্ত্রীলোকের চির-কৃতজ্ঞতা উপার্জন করেছেন, তাতেও সন্দেহ নাই; এবং আমরা ব্যক্তিগত ভাবে সে বিষয়ে প্রত্যেকে সাহায্য কর্‌বো; কিন্তু আমাদের সভাটীকে এই আন্দোলনের স্রোতের মধ্যে নামান ভাল বোধ হয় না। আত্মোন্নতি আমাদের সভার প্রধান উদ্দেশ্য; সেটা ভুল্‌লে হবে না। ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়ার দিকে আমাদের দৃষ্টি। এস আমরা এমন একটা মন্তব্য প্রকাশ করি, যাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ প্রকাশ পায়। তৎপরে আমাদের কাজ যেরূপ চলিতেছে চলুক; আমরা যদি এই আন্দোলনে সকলে মাতিয়া যাই, তা হলে আমাদের প্রধান কাজটাতে অমনোযোগ হবে।

অনেক বাদানুবাদের পর নবীনের পরামর্শানুসারে কার্য করাই কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইল। তৎপরে সুরেন্দ্রলাল গুপ্তের প্রস্তাব উঠিল। সে বিষয়ে স্থির হইল, যে জুন মাস হইতে “হিতৈষী” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। তাহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ থাকিবে। নবীন তাহার সম্পাদক ও সুরেন্দ্রলাল গুপ্ত সহকারী সম্পাদক এবং ব্রজরাজ কর্মাধ্যক্ষ থাকিবেন।

নবীন ও সুরেন্দ্র ইংরাজী প্রবন্ধ এবং পঞ্চু, ব্রজরাজ ও মথুরেশ বাঙ্গলা প্রবন্ধ লিখিবেন। সুরাপান নিবারণের চেষ্টা এই পত্রিকার একটী প্রধান কার্য হইবে।

এই পত্রিকার ব্যয় কি প্রকারে চলিবে, এই প্রশ্ন উঠিলে সুরেন্দ্রলাল গুপ্ত বলিলেন, যে তিনি এক বৎসর উক্ত পত্রিকা চালাইবার মত অর্থের সংস্থান করিয়াছেন। তন্মধ্যে কি আবশ্যকমত গ্রাহক সংখ্যা হইবে না? এই সংবাদে সভাস্থ সকলে করতালি দ্বারা আপনাদের মনের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সভাভঙ্গ হইলে যখন সকলে চলিয়া গেলেন, তখন ব্রজরাজের মাতা আসিয়া নবীনকে তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নবীনের সহিত তাঁহার বহুদিন পূর্বে পরিচয় হইয়াছে। নবীন কতদিন রাত্রে তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়াছেন, এবং ব্রজরাজের মাতার স্নেহের অংশী হইয়াছেন। তাঁহাকে তিনি মাসী বলিয়া সম্বোধন করেন। সুতরাং মাসীর বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে নবীনের মনটা ব্রজরাজদিগের ভবনে থাকিবার জন্য একটু ঝুঁকিল। তিনিও তৎসম্বন্ধে কর্তব্য কি তাহা চিন্তা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠের বাসাতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

১৪

নবীনচন্দ্র ব্রজরাজদিগের ভবনে বাস করিতে আসিবার পর যে সকল গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণন করিবার পূর্বে পরলোকগত নরোত্তম ঘোষের পরিবারদিগের বিবরণ একটু দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। ইঁহারা কলিকাতার বনিয়াদী ঘর। সহরে কয় পুরুষ বাস তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে তিন পুরুষের সংবাদ আমরা জানি। পরলোকগত নরোত্তম ঘোষের পিতা শ্রীধর ঘোষ সেকালের ইংরাজী জানা লোকদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিরাটে একটী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। বৃদ্ধাবস্থাতে সে কাজ হইতে অবসর লইয়া প্রায় ৭০ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে নরোত্তম জীবিত ছিলেন, কনিষ্ঠ পুত্র, বাল্যকালে গত হয়। একমাত্র সন্তান নরোত্তমের দুই পুত্র ও দুই কন্যা—ব্রজরাজ, মথুরেশ, রাধারাণী ও কৃষ্ণকামিনী। বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সন্তানদিগের ন্যায় ইহাদিগেরও নামের একটী ইতিবৃত্ত আছে। এই ঘোষ পরিবার বৈষ্ণব পরিবার, গোঁসাইএর শিষ্য। শ্রীধর ঘোষ মহাশয় অতি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। উদরান্নের জন্য ম্লেচ্ছের অধীনে কাজ করিতেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। আপীসে যখন কর্ম করিতেন, তখন তাঁহার নাসাতে তিলক ও সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দৃষ্ট হইত। সকলেই তাঁহাকে সত্যবাদী, বিনয়ী, কর্তব্যপরায়ণ সাধুলোক বলিয়া জানিত। এমন কি এজন্য তাঁহার ইংরাজ প্রভুগণও তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন; এবং যাহাতে তিনি দু পয়সা পান সে বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। মানুষটী শ্যামবর্ণ, সুস্থ ও সবলদেহ ছিলেন, মুখটী সদ্ভাবে ও ভক্তিতে যেন গদগদ, সে মুখ দেখিলেই কেমন হৃদয় স্বভাবতঃ তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত। ঘোষজা মহাশয় আপীসে প্রবেশের দ্বারের পার্শ্বের ঘরেই বসিতেন; এবং যত গাড়ি মাল আমদানী ও রপ্তানী হইত

তাহার হিসাব রাখিতেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আপীসে প্রবেশের সময়ে অনেকবার এই প্রশ্ন শুনিতে হইত,—"কি ঘোষজা মশাই, খবর কি? সব কুশল ত!" অমনি ঘোষজার উত্তর,—"আজ্ঞে গোবিন্দের কৃপাতে সবই কুশল।" ঘোষজা দোলের সময় কিছু ব্যয় করিতেন; লোক জনকে শ্রদ্ধাসহকারে আহ্বান করিয়া উত্তমরূপে খাওয়াইতেন। এই জন্য আপীসের লোকে মাঘ মাস পড়িলেই জিজ্ঞাসা করিত,—"কি ঘোষজা মশাই, এবার দোল কর্‌বেন ত?" অমনি উত্তর,—"আজ্ঞে কি জানি, যা গোবিন্দের ইচ্ছা।" গোবিন্দের প্রতি নির্ভরের ভাব তাঁহার এমন স্বাভাবিক ছিল, যে ৮ বৎসর বয়সে ওলাওঠা রোগে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রটীর কাল হইলে, তাহারই তিন চারিদিন পরে আপীসের একজন লোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ঘোষজা মশাই, ছেলে দুটো মানুষ হচ্চে ত।" ঘোষজা উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে দুটো আর কৈ? এখন ত একটী; কেবল বড়টীই আছে।" প্রশ্নকর্তা বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—সে কি, ছোটটীর কি হলো?" ঘোষজা উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে, গোবিন্দ সেটীকে নিয়েছেন।" ঈশ্বরের প্রতি এই নির্ভর তাঁহার চরিত্রের একটা প্রধান শক্তি ছিল। তিনি প্রতিদিন আপীস হইতে আসিয়া ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শজনিত পাপ ক্ষালনের জন্য স্নান করিতেন; এবং হাজার কৃষ্ণ নাম জপ করিতেন। তদনন্তর পাড়ার এক প্রতিবেশীর গৃহে চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ শুনিতে যাইতেন। সেখানে তাঁহারা সমবয়স্ক আরও দুই একটী বৃদ্ধ মিলিত হইয়া চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিতেন। তৎপরে বাড়ীতে আসিয়া আহারাদি করিতেন। বিষয় কর্ম হইতে অবসৃত হওয়ার পর ধর্মচিন্তা ও ধর্মালোচনা ভিন্ন ঘোষজা মহাশয়ের অন্য কাজ ছিল না।

তিনি সাধ করিয়া নাতি নাতিনীদিগের নাম রাখিয়াছিলেন। পুত্রের সর্ব-জ্যেষ্ঠা কন্যা হইলে তাহার নাম রাধারাণী রাখিলেন। তৎপরে ব্রজরাজ, মথুরেশ ও কৃষ্ণকামিনী। কৃষ্ণকামিনীকে তিনি ৬।৭ বৎসরের বালিকা দেখিয়া গিয়াছেন, তাহার বয়ঃক্রম এখন ২১ বৎসর। সর্বজ্যেষ্ঠা রাধারাণী, তাঁহার প্রথম আদরের ধন ছিল। "রাধে! রাজনন্দিনী! গরবিনী! শ্যামসোহাগিনী!" বলিয়া যখন ডাকিতেন, তখন এক বৎসরের বালিকা রাধারাণী অচিরোদ্গত-দন্তাবলী-শোভিত মুখ-চন্দ্রে একটু হাসিয়া ঝাঁপাইয়া, তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া পড়িত। তাহাকে বুকে চাপিয়া বলিতেন,—"রাখালের সনে প্রেম করিস নে রাই!" অমনি চক্ষে জলধারা বহিত। কৃষ্ণকামিনী যখন হাঁটিতে শিখিল, তিনি তখন বৃদ্ধ ও পুত্রশোকে জর্জরিত, কারণ তৎপূর্বে নরোত্তম ঘোষ পরলোক-গমন করেন। তথাপি কৃষ্ণকামিনীকে বুকে ধরিয়া বৃন্দাবনলীলা স্মরণ করিতেন; এবং দুই চক্ষে অবিরল জলধারা বহিত। নরোত্তমের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই ঘোষজা মহাশয়ের পরলোক হয়। তখন রাধারাণী ব্যতীত আর সকলগুলিই নাবালক। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ব্রজরাজের মাতুল, বাগবাজারের শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয়ের উপরে পড়ে। ব্রজরাজ ও মথুরেশ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ভগিনী ও ভাগিনেয়দিগকে রক্ষা ও প্রতিপালন করিয়াছেন; তাহাদের পৈতৃক বাটী ভাড়া দিয়া, সেই ভাড়ার দ্বারা ও নরোত্তমের পরিত্যক্ত টাকা সুদে লাগাইয়া সেই টাকা এবং নিজের দত্ত সাহায্যে ক্লেশে তাহাদের ব্যয় নির্বাহ করিয়াছেন। ব্রজরাজের বয়ঃক্রম এখন ২৫ বৎসর। এক বৎসর হইতে তিনি একজন উকীলের বাড়ীতে একটী চাকুরী পাইয়াছেন। বেতন ৬০ টাকা। আর মথুরেশের বয়ঃক্রম যদিও ২৩ বৎসর মাত্র, তথাপি তাঁহাকেও

বিষয় কর্মে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। তিনি চল্লিশ টাকা বেতনের একটী চাকুরী যোগাড় করিয়াছেন। সে কালে অল্প একটু ইংরাজী শিখিলেই লোকে চাকুরীর চেষ্টা করিত। কৃষ্ণকামিনী শৈশবে বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে ভ্রাতাদের আশ্রয়েই আছে। রাধারাণী পতিগৃহ-বাসিনী। ভাগিনেয়দ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয়কে আর সর্বদা ইহাদের তত্ত্বাবধান করিতে হয় না। মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন।

পূর্বোক্ত কথোপকথনের দুই দিন পরেই নবীনচন্দ্র ব্রজরাজদিগের ভবনে বাস করিবার জন্য আসিলেন। সকলেরই আনন্দ। নবীনচন্দ্র ৫০৲ টাকা বেতনে ওরিএণ্টাল সেমিনারিতে তৃতীয় শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত আছেন। সে পদ তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির উপযুক্ত নহে। তিনি কেবলমাত্র ইংরাজীতে সুশিক্ষিত নহেন; পাড়ার একজন পণ্ডিতকে কিছু কিছু দিয়া কয়েক বৎসর হইতে সংস্কৃত শিখিতেছেন। ইতিমধ্যেই উক্ত ভাষাতে তাঁহার একটু ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। সুতরাং তিনি চেষ্টা করিলেই অধিক টাকা বেতনের একটী কর্ম যোগাড় করিতে পারিতেন। কিন্তু মনে দারপরিগ্রহ করিবার সংকল্প না থাকাতে এবং অর্থের অধিক প্রয়াস নাই বলিয়া ঐ ৫০৲ টাকা বেতনেই সন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। জ্ঞানচর্চাতেই আনন্দ, সেই জন্যই সহর ছাড়িতে অনিচ্ছুক।

তিনি এ বাড়ীতে আসার পরদিন অপরাহ্ণে ব্রজরাজের মাতা বাহিরের ঘরে আসিয়া বলিলেন, "নবীন, বাড়ীর ভিতর এস, কিছু জল খাবে।" নবীনচন্দ্র উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গৃহিণী নবীনকে লইয়া গিয়া ব্রজরাজের বসিবার ঘরে বসাইলেন। বসাইয়া পুত্রবধূদিগকে ও কন্যাকে ডাকিলেন। পুত্রবধূদিগকে বলিলেন, "মা তোমরা প্রণাম কর; উনি যে ভাসুর হন।" এই বলিয়া ব্রজরাজের কনিষ্ঠা কন্যাটিকে লইয়া নবীনের ক্রোড়ে দিলেন। নবীন তাহাকে পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—"বাঃ যেন মোমের পুতুলটী।" টেবিলের উপর একটী কাগজ চাপা পাথরের কুকুর ছিল, তুলিয়া তাহার হস্তে দিলেন; সে সেইটীকে লালারসপ্লাবিত করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণকামিনী বিনম্রভাবে উপস্থিত। গৃহিণী বলিলেন,—"লজ্জা কি, ভাই হয় যে। নবীন এই আমার ছোট মেয়ে কেষ্টো।" নবীনচন্দ্র পূর্বেই কৃষ্ণকামিনীর নাম শুনিয়াছিলেন। জানিতেন যে কৃষ্ণকামিনী নবরত্ন সভার প্রতি বিশেষ অনুরাগিণী এবং এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিরও কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি পূর্বে কত দিন তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়াছেন; কিন্তু কখনও তাঁহাকে চক্ষে দেখেন নাই; সুতরাং কৃষ্ণ-কামিনী যখন তাঁহার সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা বশতঃ তিনি যেন ভাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না; উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ওদিকে কৃষ্ণকামিনীর চক্ষের উপর তাঁহার চক্ষু পড়িবামাত্র, বিনয় ও হ্রীদ্বারা জড়িত কি এক অপূর্ব ভাব কৃষ্ণকামিনীর মুখের উপর দিয়া বহিয়া গেল; এবং তাঁহার দৃষ্টি আপনা হইতেই নিম্নাভিমুখিনী হইল। নবীনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি গতবারের সভার দিন ছিলেন?"

কৃষ্ণ। ছিলাম।

গৃহিণী। ও বাবা! ও তোমাদের নবরত্নের যে গোঁড়া, ও আবার থাক্‌বে না!

নবীন। (ঈষৎ হাসিয়া) মাসি! ভাল আপনি আমাদের সভাটার নাম নবরত্ন তুলে দিয়েছেন; আর কেউ আসল নামে ডাকে না।

গৃহিণী। তা মন্দ নাম কি দিয়েছি? তোমরা নয়টী ছেলে যেন নয়টী রত্ন। ঠিক নাম ত হয়েছে।

নবীন। (হাসিয়া) এখন ত আর আমরা নয় জন নই। তা হলেও সকলে নব-রত্নই বলে। আপনার নামে আমাদের প্রিয় নামটাকে চাপা দিয়ে ফেলেছে।

গৃহিণী। অত বড় বিদ্‌কুটে নাম কি রাখ্‌তে আছে? মান্‌ষে যা বল্‌তে পারে না। কি, কিরে কেষ্টো কি নামটা? বল্‌ত।

কৃষ্ণ। (হাসিয়া) আত্মোন্নতি-বিধায়িনী-সভা।

গৃহিণী। ও বাবা! ও দুন্নতি-ধানী সভা কি কেউ বল্‌তে পারে? (নবীনের ও কৃষ্ণকামিনীর হাস্য) কে জানে এক পোড়া ইংরেজী দেশে এসে যত বিদ্‌কুটে নাম হয়েছে।

নবীন। মাসি! ওটা ত ইংরাজী নাম নয়; ও যে বাঙ্গলা।

গৃহিণী। হাঁ, তা বই কি; বাঙ্গলা হলে আর আমরা বুঝতে পারিনি।

নবীন। মাসী, ঠিক বলেছেন; ওটা সংস্কৃত।

গৃহিণী। তাই বল।

ইতিমধ্যে একজন চাকরাণী আসিয়া সংবাদ দিল, যে শোভাবাজারের বাড়ীর রাঙ্গা মার নিকট হতে লোক এসেছে, বাবুকে ডাকছে। নবীনচন্দ্র সকলকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া নামিয়া গেলেন; এবং তাঁহার রাঙ্গা মার প্রেরিত লোককে বিদায় করিয়া কিঞ্চিৎ পরেই ফিরিয়া আসিলেন। আবার কথোপকথন আরম্ভ করিল।

গৃহিণী। রাঙ্গা মার খবর কি?

নবীন। খবর ভাল, আমাকে বাড়ীতে নে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি কর্‌ছেন।

গৃহিণী। মাথেকো ছেলে মানুষ করেছেন, প্রাণটা কাঁদ্‌বে না? একবার দেখা দিয়ে এস না কেন?

নবীন। জ্যেঠা মশাইএর অনুমতি না হলে, তাঁর অনিচ্ছাতে, গোপনে যেতে পারিনে। অন্য কোথাও দেখা হবে।

গৃহিণী। আজ লোক কি বল্‌তে এসেছিল?

নবীন। আজ কিছু বল্‌তে আসেনি। রাঙ্গা মা কিছু খাবার পাঠ্‌য়েছেন, ওই পাশের ঘরে আছে। সকলকে দেবেন।

এই কথা বলিতে নবীনের চক্ষু অশ্রু-সিক্ত হইল।

গৃহিণী। আহা কি মায়া, ঠিক যেন মায়ের মত।

নবীন। মাসি, মায়ের মত বলেন কি? রাঙ্গা মা আমাদের জন্যে যা করেছেন, অতি কম মায়ে তা করে।

ইত্যবসরে ব্রজরাজ আপীস হইতে আসিলেন; দেখিলেন, মাতা, বধূ ও ভগিনী এই সকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নবীন কথাবার্তা কহিতেছেন; দেখিয়া বলিলেন,—"এই ঠিক হয়েছে। মা এ কাজটা বেশ করেছ; নবীন ত আর বাহিরের লোক নয়।" তার পর দুই বন্ধুতে আলাপ আরম্ভ হইল; রমণীরা গৃহকার্যে গেলেন।

ব্রজরাজদিগের গৃহে নবীনের দিন একপ্রকার সুখেই কাটিয়া যাইতেছে। ক্রমে ঘরের ছেলের মত হইয়া গিয়াছেন; যখন ইচ্ছা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন; ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতেছেন; ব্রজরাজের কনিষ্ঠা কন্যা, মোমের পুতুলটীকে লইয়া আকাশে লুফিতেছেন; বুকে চাপিতেছেন; চুম্বন করিতেছেন। নবীন বড়

শিশু-ভক্ত। ব্রজরাজের বড় কন্যা 'টিমী' আড়াই বৎসরের বালিকা, সর্বদাই নবীনের নিকটে আছে; সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। নবীন একদিন বলিলেন,—"মাসি, এ কি করেছেন, এমন সুন্দর মেয়ের টিমী নাম দিলেন কেন? ঐ টিমীই থেকে যাবে।" ঘোষ গৃহিণী বলিলেন,—"ও নাম ওর মামার বাড়ী থেকে এনেছে; ওর দিদিমা দিয়েছে। আমাদের দোষ কি?" যাহা হোক টিমী সর্বদাই নবীনের সঙ্গী। নবীন আহার করিতে বসিলেই টিমী উপস্থিত, "আমি চঙ্গে থাব।" নবীন হাসিয়া বলেন, "তুমি চঙ্গে থাবে বৈ কি;" অমনি তাহাকে কোলে বসাইয়া অগ্রে তাহার মুখে অন্ন দিয়া পরে নিজে অন্ন গ্রহণ করেন। টিমী যে কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে পদ সিদ্ধ করে, এবং শব্দ-শাস্ত্রের কোন্ নিয়মানুসারে কথা কয়, কিছু বলিতে পারা যায় না। বর্ণমালার অনেক শব্দ উচ্চারণ করে না; সুতরাং পরিবার পরি-জনের চিরাভ্যস্ত কর্ণ ভিন্ন টিমীর ব্যাকরণ কেহ বুঝিতে পারে না। নবীনচন্দ্র অনেক লক্ষ্য করিয়া শুনিয়া শুনিয়া টিমীর ব্যাকরণের তিনটা নিয়ম ধরিতে পারিয়াছেন। প্রথম, সে কবর্গকে তবর্গ করিয়া উচ্চারণ করে; দ্বিতীয়, শ, ষ, স, সমুদায়কে এক 'চ'এর দ্বারা উচ্চারণ করে; তৃতীয় "র ও ড়'কে 'ল'এর দ্বারা উচ্চারণ করে। এইটী আবিষ্কার করার পর নবীনের আমোদ করিবার একটী জিনিষ হইয়াছে।

এইরূপে নবীন অসঙ্কোচে নিজ গৃহের ন্যায় এই গৃহে বাস করিতেছেন। কৃষ্ণকামিনী আবশ্যক মত তাঁহার নিকট আসেন; আবশ্যকমত কথা কহেন; কখনও কখনও কোনও পুস্তকের দুই এক পংক্তির অর্থ জানিয়া লন; কিন্তু তদ্ভিন্ন বড় একটা মেশেন না; বরং একটু দূরেই থাকেন। কৃষ্ণকামিনী স্বভাবতঃই ধীর; ধীরে ধীরে কথা কন; ধীরে চলেন; ধীরে ধীরে সব কাজ করেন। নিঃশব্দে গৃহের কত কাজ করেন, যাহারা লক্ষ্য করিয়া দেখে, তাহারাই আশ্চর্যান্বিত হয়। নবীনচন্দ্র দূর হইতে কৃষ্ণকামিনীর প্রশংসাই শুনিয়াছিলেন, এরূপ নিকটে কখনও দেখেন নাই; যতই দেখিতেছেন, মন মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

একদিন নবীনচন্দ্র স্কুল হইতে আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাড়ীর ভিতর আসিবা-মাত্র টিমী তাঁহার স্কন্ধে উঠিল; যেন তিনি টিমীর চিরক্রীত বাহন। গৃহিণীর অনেক অনুরোধে টিমীকে নামাইয়া তাহার সঙ্গে একত্রে জলযোগ করিলেন। তৎপরে টিমীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ হইল।

নবীন। টিমুমণি! বল দেখি—ঘরে।

টিমী। ধলে।

নবীন। বল দেখি—ঘোড়ার গাড়ি।

টিমী। ধোঁলাল দালি।

নবীন। বল দেখি, কোন খানে।

টিমী। তোন থানে।

টিমী নিজের ব্যাকরণের ভুল কখনই করে না। নবীনচন্দ্র হাসিয়া টিমীকে কোলে তুলিয়া লইলেন, ও নিজ বাম বাহুর উপর বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার 'থুতী' কোথায়?" এ প্রশ্নটা টিমীর মনঃপূত হইল না। সে বলিল—"'থুতী' তেন? থুতী নয়, থু-উ-উ-তী।" ইহার একটু টীকা চাই। টিমী নিজের ক বর্গের স্থানে ত বর্গ উচ্চারণ করে, কিন্তু তার এই বিশ্বাস আছে যে সে ঠিক উচ্চারণ করে; সুতরাং কেহ যদি তাহার অনুকরণ করিয়া ক বর্গ স্থানে ত বর্গ

উচ্চারণ করে, তবে টিমীর মনে হয় যে সে ব্যক্তির ভুল হইল, অমনি সংশোধন করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সংশোধিত উচ্চারণটাও তার নিজের ব্যাকরণ অনুসারে হইয়া যায়। আজও টিমী সংশোধন করিয়া বলিয়াছে, "থুতী কেন? থুতী নয়,—থু-উ-উতী।" যাহা হোক টিমী নবীনচন্দ্রের উচ্চারণের সংশোধন করিয়া বলিল,—"চে দুট্টু!" ব্যাপারখানা এই। কয়েক দিন হইল নবীনচন্দ্র খেলিবার জন্য টিমীকে ইংরেজের দোকান হইতে একটা বড় বিলাতী পুতুল আনিয়া দিয়াছেন। সেটা উচ্চে প্রায় টিমীরই সমান, তথাপি টিমী সেটাকে সর্বদাই কোলে করিয়া বেড়ায়। তার পরিচর্যাতে দিন রাত্রি এমনি ব্যস্ত যে টিমীর আহার নিদ্রা মনে থাকে না। এই খুকী সেদিন কি একটা দুষ্টামির কাজ করিয়াছে, তাই বলিল—"সে দুষ্টু।" বলিয়া ক্ষুদ্র অঙ্গুলির নির্দেশ দ্বারা নিজের খেলার ঘর দেখাইয়া দিল। নবীনচন্দ্র গিয়া দেখেন যে টিমী নিজে দুষ্টামি করিলে, তাহার পিতা বা কাকা বাবু যেমন তাহাকে মুখ ফিরাইয়া কোণে দাঁড় করাইয়া দেন, সে আপনার খুকীকে দুষ্টামির জন্য তেমনি মুখ ফিরাইয়া কোণে দাঁড় করাইয়া দিয়া আসিয়াছে। তখন নবীনচন্দ্র—"চে দুষ্টু" কথাটার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাস্যধ্বনিতে বাড়ী কাঁপিয়া গেল। কৃষ্ণকামিনী তাঁহার ঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন; বধূগণ রন্ধনশালা হইতে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে ব্রজরাজের মাতৃস্বসা মাতঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত। মাতঙ্গিনী বালবিধবা; বয়ঃক্রম ২৫।২৬ হইবে। বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়; শরীরে রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। মাতঙ্গিনী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই উপরে অট্টহাস্যধ্বনি শুনিতে পাইল; সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতেই ঘোষগৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ও কে দিদি, অমন করে হাসচে? বাবারে কি হাসি; আমি চম্‌কে উঠেছিলাম।"

ঘোষগৃহিণী। ও যে নবীন। তুই এখানে ছিলিনে। তা বুঝি জানিস্‌নে? নবীন যে এক মাস হতে আমাদের বাড়ীতে এসে আছে।

মাতঙ্গিনী। বটে, কেন তিনি না তাঁর দাদার সঙ্গে ছিলেন।

ঘোষগৃহিণী। আর দাদার মাত্‌লামির জ্বালায় সেখানে টেঁকতে পারে না।

মাতঙ্গিনী। তা বেশ হয়েছে।

ঘোষগৃহিণী। আয় না, নবীনের সঙ্গে তোর দেখা করিয়ে দি।

মাতঙ্গিনী। না না, বাপ্‌রে! অত বড় লোকের সঙ্গে কি হঠাৎ দেখা করা যায়?

ঘোষগৃহিণী। তাতে দোষ কি? ও ত বাড়ীর ছেলে, ও ত আমার ব্রজরাজ, মথুরেশেরই মত।

মাতঙ্গিনীর আপত্তিটা বড় শক্ত ছিল না; সুতরাং শেষে গৃহিণী যখন দ্বিতীয়-বার অনুরোধ করিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে নবীনচন্দ্রের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই গৌরাঙ্গী, প্রফুল্ল-বদনা, নারীমূর্তি যখন নবীনের সমক্ষে গিয়া দণ্ডায়মান হইল, তখন তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া নিজ আসন হইতে উঠিলেন। মাতঙ্গিনী হাসিয়া বলিল—"আপনি বসুন না, এত ব্যস্ত কেন?" এই বলিয়া নিকটে স্থিত একখানি তক্তপোষের এক পার্শ্বে নিজে বসিল। নবীনচন্দ্র শুনিয়াছিলেন মাতঙ্গিনী তাঁহাদের সভার প্রতি অনুরাগিণী ও মধ্যে মধ্যে চিকের অন্তরাল হইতে তাঁহাদের কথা শুনিতে আসিয়া থাকে। সাক্ষাতে ও নিকটে

কখনও দেখেন নাই। মাতঙ্গিনীও পরদার আড়াল হইতে, দূরে দূরে নবীনচন্দ্রকে দেখিয়াছিল; এবং দেখিয়া তাঁহার রূপগুণের পক্ষপাতিনী হইয়াছিল; এরূপ নিকটে কখনও দেখে নাই। আজ নিকটে পাইয়া কত কথাই আরম্ভ করিল। অধিক কথোপকথনে নবীনচন্দ্র বরং একটু সংকুচিত; কিন্তু মাতঙ্গিনীর সংকোচ নাই; মাতঙ্গিনী চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় কত প্রশ্নই করিল। হঠাৎ এতটা ঘনিষ্ঠতা নবীনচন্দ্রের ভাল লাগিল না। তিনি অধিক কথোপকথন করিতে একটু অসহিষ্ণু হইতে লাগিলেন; ইতিমধ্যে ব্রজরাজ আপীস হইতে সমাগত। নবীন মাতঙ্গিনীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

ইহার দুই দিন পরেই মাতঙ্গিনী নিজ জ্যেষ্ঠের অনুমত্যনুসারে ভগিনীর বাড়ীতে কিছুদিন বাস করিবার জন্য আসিল। নবীন তাহা পছন্দ করিলেন না। এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি মাতঙ্গিনী দিন দিন নবীনচন্দ্রের প্রতি মনোযোগের মাত্রা বাড়াইতে লাগিল। দুই দিনের মধ্যেই "আপনি" ছাড়িয়া "তুমি" ধরিল; বলিল, 'বাড়ীর লোক, তাকে আবার আপনি আপনি কি?' আচ্ছা তাই ভাল, কিন্তু মাতঙ্গিনী তাহাতেও নিরস্ত নয়। তাড়াতাড়ি নিজে নবীনের ভাত বাড়িয়া আনে; আহারটী না হইতে হইতে পানটী লইয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকে; রাত্রে চাকরাণী যখন নবীনের শয্যা করিতে যায়, তখন চাকরাণীর সঙ্গে গিয়া শয্যা করিবার বিষয়ে সাহায্য করে; কাপড়গুলি পাট করিয়া রাখে; নবীন স্কুলে গেলে, দুপুর বেলা তাঁহার ঘরের বই, কাগজ, কলম প্রভৃতি গুছাইয়া রাখে; নবীন আসিয়া সন্তুষ্ট হইয়া মাসীকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারেন, মাতঙ্গিনী করিয়াছে; নবীন আহার করিতে বসিয়া কোনও একটা হাসির কথা কহিলে অন্যে হাসুক না হাসুক, মাতঙ্গিনী হাসিয়া গড়াইয়া যায়।

নবীনচন্দ্র অতি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক। মাতঙ্গিনীকে দেখিয়া তাঁহার মনে কিছুমাত্র শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। তিনি বুঝিয়াছেন, লোকটী অতি অসার, ক্ষণিক ভাবের উত্তেজনাতে কাজ করে ও আত্মসংযমের শক্তি নাই; এমন লোককে প্রশ্রয় দিলে সর্বনাশ! এই জন্য মাতঙ্গিনী যতই তাঁহার সহিত মিশিতে চায়, তিনি ততই দূরে দূরে সরিয়া যান। কখনও কখনও মাতঙ্গিনী যখন দেখে বাহিরে নবীনের ঘরে আর কেহ নাই, তখন একখানা পুস্তক লইয়া কিছু জানিবার ছল করিয়া সেখানে যায়। নবীনচন্দ্র ছল বুঝিতে পারিয়া দুই একটী কথা বলিয়া দিয়াই সরিয়া পড়েন।

এইরূপে মাতঙ্গিনী কিছুদিনের মধ্যে নবীনচন্দ্রের সে বাড়ীতে থাকা দুষ্কর করিয়া তুলিল। অথচ নবীনেয় প্রতি বাড়ীয় সকলের এমনি বিশ্বাস ও তাঁহাকে এমনি আপনার লোক বলিয়া জ্ঞান যে, মাতঙ্গিনী যাহাই করুক না কেন, গৃহিণীর বা অপর কাহারও চক্ষে কিছুই মন্দ দেখায় না। কেবল কৃষ্ণকামিনী মনে মনে এতদূর ব্যাপকতা পছন্দ করেন না, কিন্তু কিছুই বলেন না। নবীনচন্দ্র মাতঙ্গিনীর উপদ্রব কয়েকদিন সহ্য করিয়া অবশেষে একদিন ব্রজরাজকে বলিলেন, "ওহে তোমার মাসীকে বলে দিতে পার, আমার প্রতি এতটা মনোযোগ দেওয়া ভাল দেখায় না; আমি ইহা পছন্দ করি না।" ব্রজরাজ হাসিয়া কহিলেন, "মাসীর সব কাজেই বাড়াবাড়ি। তোমার উপর একটু ভালবাসা জন্মেছে কিনা, তাই তোমাকে নিয়েই ব্যস্ত। ও দুদিন পরেই যাবে।" ইহার পর একদিন ব্রজরাজ মাতঙ্গিনীকে বলিলেন, "মাসি! নবীন যখন বাহিরের ঘরে একলা থাকে, পড়াশুনা করে, তখন তুমি

সেখানে যাও কেন? সে ত ভাল নয়।" এই মাত্র।

যতই দিন যাইতে লাগিল মাতঙ্গিনী দেখিল, তাহার হাব ভাব, ইঙ্গিত, সংকেত, সেবা শুশ্রূষা কিছুই নবীনকে ধরিতে পারিতেছে না। তিনি যেন সে পথ দিয়া চলিতেছেন না, অথবা বুঝিয়াও ধরা দিতেছেন না। কৌশলে সর্বদাই দূরে দূরে থাকিতেছেন। অবশেষে একদিন রাত্রে নবীনচন্দ্র বাড়ীর মধ্যে আহার করিতে আসিয়াছেন, ইত্যবসরে মাতঙ্গিনী বাহিরের ঘরে গিয়া নবীনচন্দ্রের টেবিলের উপরে তাঁহার নামে একখানি চিঠি রাখিয়া আসিয়াছে। নবীন আহারের পরে ঘরে গিয়াই পত্রখানি পাইলেন। খুলিয়া পড়িয়া দেখেন, তাহা মাতঙ্গিনীর লিখিত পত্র। তাহাতে মাতঙ্গিনী নবীনকে অনেক প্রেম-সূচক সম্বোধন করিয়াও "প্রাণের ভালবাসা" জানাইয়া, শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে। তিনি পত্রখানি পড়িয়া অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। একবার ভাবিলেন, যে সেই রাত্রেই ব্রজরাজকে ডাকিয়া পত্রখানি দেখাইবেন; আবার মনে করিলেন, তাহা হইলে কথাটা ছড়াইয়া পড়িবে; তাহাতে মাতঙ্গিনীকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইবে। বিশেষতঃ শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয় যে উগ্র-প্রকৃতির মানুষ, তিনি জানিতে পারিলে একটা মহা অনর্থ বাধিবে ও মাতঙ্গিনীর ক্লেশের অবধি থাকিবে না। ওদিকে আবার বন্ধুভাবে গৃহে বাস করিয়া গোপনে বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের এরূপ চিঠিপত্র লওয়া অতি গর্হিত কার্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অবশেষে স্থির করিলেন যে, আর সে গৃহে থাকিবেন না; স্বতন্ত্র স্থানে বাসা করিবেন, তাহা হইলে আপদ চুকিয়া যাইবে। এইরূপ নির্ধারণ করিয়া পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; ও সকাতরে ঈশ্বরচরণে পুণ্য, শান্তি ও বলের জন্য প্রার্থনা করিয়া শয্যাতে গমন করিলেন। কিন্তু মনের আবেগে ও বিবিধপ্রকার চিন্তায় সে রাত্রে নিদ্রা হইল না। পরদিন উঠিয়া বাড়ীর লোকের নিকটে স্বতন্ত্র বাসা করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সকলেই দুঃখ করিতে লাগিল। গৃহিণী সর্বাপেক্ষা দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাসা দেখিতে কয়েকদিন বিলম্ব হইতেছে, ইতিমধ্যে একদিন রাত্রে নবীনচন্দ্র গ্রীষ্মাতিশয়বশতঃ নিজ গৃহের দ্বার খুলিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার ঘরটী বাড়ীর ভিতরের দিকে, মনে করিলে তাহাকে বাড়ীর ভিতরেরও করা যায়, বাহিরেরও করা যায়। সেই ঘরে একখানি খাটে তিনি শয়ন করিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় একটা কি দুইটা, পরিজন সকলে নিদ্রিত, এমন সময়ে খাটের মশারিতে টান পড়াতে সহসা নবীনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহার যেন বোধ হইল কে তাঁহার মশারি ঠেলিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইল। নিদ্রাভঙ্গে কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" উত্তর—"চেঁচিওনা, আমি মাতঙ্গিনী।" নবীনচন্দ্র অমনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন,— "আপনি এত রাত্রে এখানে কেন?"

মাত। তুমি ত দুদিন পরেই চলে যাবে। জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলাম, আমার পত্রের উত্তরের কি কর্‌লে?

নবীন। একথা ত আপনি আমাকে অন্য সময়ে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌তেন; এমন সময়ে কেন? আপনার কি কিছুই বিবেচনা শক্তি নাই?

মাত। তোমার খাটে একটু বস্‌বো?

নবীন। (বিরক্ত ভাবে) না, আমার খাটে আপনি বস্‌বেন না; আপনি এখনি বাড়ীর মধ্যে যান। এমন সময়ে এখানে আসা অতি অন্যায় কাজ হয়েছে।

ভদ্রলোকের মেয়ের এমন ব্যবহার ত কখনও শুনি নাই।

মাতঙ্গিনী আর খাটে বসিতে সাহসী হইল না; কিন্তু বাড়ীর মধ্যেও গেল না; ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। নবীনচন্দ্র আবার বলিলেন,—"ভাবছেন কি? যান, এখনি বাড়ীর মধ্যে যান, আর এক মিনিট এখানে থাক্‌বেন না।" মাতঙ্গিনী নিরুত্তর রহিল, কিন্তু তথাপি গেল না। অবশেষে নবীনচন্দ্র গত্যন্তর না দেখিয়া একেবারে সিঁড়ির দ্বার খুলিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। মাতঙ্গিনী রাগিয়া অন্তঃপুরের দিকে গেল; এবং ঝনাৎ করিয়া নিজের গৃহের দ্বার বন্ধ করিল। নবীনচন্দ্র বাহির বাড়ী হইতে ঝনাৎ শব্দটা শুনিয়া ভাবিলেন আপদ বিদায় হইয়াছে। আস্তে আস্তে উপরে আসিয়া নিজ ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া কোনওরূপে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু যাপন করিলেন। প্রাতে উঠিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "মাসি! একটী বন্ধুর বাড়ী দুদিনের জন্য যাচ্চি; তার পর আলাদা বাসাতে যাব; আজ আর এখানে আস্‌ব না।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। নবীন চলিয়া গেলে সেই দিন অপরাহ্লেই মাতঙ্গিনী পিত্রালয়ে গমন করিল।

নবীন চলিয়া গেলে ঘোষপরিবারস্থ সকলেই বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন। ব্রজরাজ ও মথুরেশের ত কথাই নাই। নবীনের পবিত্র সহবাসে এই দুই মাস কাল তাঁহাদের অতি সুখেই কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহারা কত নূতন বিষয় শিখিয়াছেন। কত নূতন ভাব হৃদয়ে পাইয়াছেন। নবীনের জ্ঞানের ক্ষুধা আশ্চর্য! যে কোনও নূতন বিষয় তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হয়, তিনি তাহার তদন্ত না করিয়া ছাড়েন না; সে বিষয়ে কোথায় কি আছে সংগ্রহ করিয়া পাঠ না করিলে তাঁহার মনঃপূত হয় না। এই কারণে তাঁহার মনটী বিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। এরূপ ব্যক্তির সহবাসে থাকিলেই শিক্ষা। সুতরাং নবীন চলিয়া গেলে ব্রজরাজ ও মথুরেশ গভীর বিষাদে পতিত হইলেন। নবীনের প্রাণে কি ক্লেশ হইল না? যে গৃহে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ পাইয়াছেন, সহোদরের ন্যায় অকৃত্রিম সৌহার্দ লাভ করিয়াছেন, আপনার লোকের ন্যায় বিশ্বাস ও প্রীতি সম্ভোগ করিয়াছেন, সে গৃহ পরিত্যাগ করিতে কি তাঁহার প্রাণে ব্যথা লাগিল না? তাহা কি সম্ভব? তবে তিনি কেন চলিয়া গেলেন? মাতঙ্গিনীর উপদ্রবে? সে উপদ্রব কয়দিন থাকিবে? মাতঙ্গিনী ত দুই দিন পরেই পিত্রালয়ে যাইত। তবে কেন তিনি দূরে গেলেন? সম্পূর্ণ মাতঙ্গিনীর উপদ্রবেও নহে; তাঁহার চলিয়া যাইবার আর একটু কারণ ঘটিয়াছে। কিছুদিন হইতে তিনি অনুভব করিতেছেন যে তাঁহার মন দিন দিন কৃষ্ণকামিনীর প্রতি কিছু অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইতেছে। ইহা লক্ষ্য করা অবধি তিনি সাবধানে আপনাকে দূরে দূরে রাখিয়াছেন। কৃষ্ণকামিনীকে বা অন্য কাহাকেও কিছু জানিতে দেন নাই। অবশেষে স্থির করিয়াছেন যে কিঞ্চিৎ দূরে থাকাই ভাল। এই ভাবিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

মাতঙ্গিনী যাওয়ার দুই চারি দিন পরেই ব্রজরাজের মাতুল শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয় একদিন সন্ধ্যার সময় ভগিনী ও ভাগিনেয়দিগকে দেখিতে আসিলেন। আসিয়া ভগিনীর সহিত একথা সেকথার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শোভা-বাজারের হলধর বোসের ভাইপো নবীন বোস নাকি এখানে থাকে?"

ঘোষ-গৃহিণী। না, থাক্‌তো বটে, এখন আর থাকে না; স্বতন্ত্র বাসা করেছে।

শুনিয়া মিত্রজ মহাশয়ের দুর্ভাবনা কিঞ্চিৎ দূর হইল। প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে ভালই হয়েছে।"

ঘোষ-গৃহিণী। কেন দাদা ওকথাটা জিজ্ঞাসা কর্‌লে? তোমাকে এ খপর কে দিলে? মাতী দিয়েছে বুঝি?

শ্যাম। যেই দিক্‌না, তোমার ত কাণ্ডজ্ঞান কখনই হবে না। এত বড় বিধবা মেয়ে নিয়ে ঘর কর, যাকে তাকে কি বাড়ীতে পুরলেই হলো?

ঘোষ-গৃহিণী। (জিভ কাটিয়া) ছি! ছি! তুমি তাকে জান না, তাই অমন কথা বল্‌চ। সে কি মানুষ? সে যে একটা দেবতা!

শ্যাম। হাঁগো হাঁ, তোমাদের দেবতা দেখ্‌তেও বিস্তর ক্ষণ নয়, আর বিপদে পড়্‌তেও বিস্তর ক্ষণ নয়। যাক্‌ পরের ছেলে বাহিরে গেছে, সেই ভাল। এবাড়ীতে ছোঁড়াদের একটা কি সভা নাকি হয়!

ঘোষ-গৃহিণী। হাঁ ওদের নবরত্ন সভা হয়; ওরা বসে পড়াশুনা করে, কথাবার্তা কয়।

শ্যাম। না, না, এ বাড়ীতে সভা টভা হবে না! ব্রজ এলে বলো আমি বারণ করে গিয়েছি। ফের যদি শুনি সভা টভা এখানে হয়, তাহলে তোমাদের এ বাড়ী থেকে তুলে নে যাব; নিয়ে নিজের বাড়ীতে রাখ্‌বো। এই বলিয়া একটু বসিয়া, টেমির সঙ্গে একটু হাস্য পরিহাস করিয়া, চলিয়া গেলেন।

সেকালের বৃদ্ধা গৃহিণীরা বড় সরল লোক ছিলেন। ঘোষ-গৃহিণী সর্বাগ্রে গিয়া কৃষ্ণকামিনীকে বলিলেন, "শুনলি কেষ্টো, মাতীর কাণ্ড দেখ্‌লি? কিসে কি করে তুলেছে!" বলিয়া ভ্রাতাভগিনীতে যত কথাবার্তা হইয়াছিল, সমুদায় কৃষ্ণকামিনীর কর্ণগোচর করিলেন। "এত বড় বিধবা মেয়ে নিয়ে ঘর কর, যাকে তাকে ঘরে পুরলেই হলো," এই কথাগুলি শুনিয়া কৃষ্ণকামিনী চমকিয়া উঠিলেন। মামা কেন এরূপ কথা বলিলেন, ইহা ভাবিয়া লজ্জাতে একেবারে মরিয়া গেলেন। পরিশেষে ভাবিলেন, যাক্‌ সভাটা এবাড়ী হইতে উঠিয়া গেল, ভালই হলো। তিনি আমাদের বন্ধু আছেন, বন্ধুই থাকুন; দাদার মুখে তাঁহার কুশল সংবাদ ত আমরা শুনিব, তাহাই যথেষ্ট! তিনি সাধু, তিনি বুদ্ধিমান্‌, তিনি প্রতিভাশালী, তিনি জগতে দাঁড়াইবেন, উঠিবেন, কত কাজ করিবেন, শুনিয়াও ত আমরা সুখী হইব, তিনি এবাড়ীতে না আসিলেন, তাহাতে কি? এত চিন্তা যে সেই নির্দোষ সরলা বালিকার মন দিয়া বহিয়া গেল, গৃহিণী তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কৃষ্ণকামিনী প্রকাশ্যে বলিলেন---"মা, সেই ত বেশ, এ বাড়ীতে আর সভা করে কাজ কি? মামা যাতে বিরক্ত হন, তা না করাই ভাল।"

গৃহিণী। বলিস কি রে, তুই সভার এত গোঁড়া, তোর মুখে এই কথা! সভা উঠে গেলে তুই কি করে বাঁচ্‌বি?

কৃষ্ণ। তুমি দেখো আমি বাঁচি কিনা।

ব্রজরাজ গৃহে আসিয়া সমুদায় কথা শুনিয়া প্রথমে মাতুলের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইলেন; এবং মনে করিলেন যে মাতুলের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বাড়ীতেই পূর্ববৎ সভা করিবেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র শুনিয়া বলিলেন,—"মামা তোমাদের অভিভাবক, এমন একটা সামান্য কারণে তাঁর অবাধ্য হবার প্রয়োজন কি? আমাদের ত 'হিতৈষী'র একটা আপিস ঘর কর্‌তেই হবে, সেখানেই আমাদের সভা হবে। তবে মেয়েদের আর যোগ দেবার সুবিধা হবে না। তা কি করা যায়, সকল দিক রক্ষা করতে পারা যায় না।" সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, নবীনচন্দ্র কৃষ্ণকামিনী হইতে দূরে থাকিতে চাহিতেছেন।

হায়! হায়! নবীনচন্দ্র যখন ব্রজরাজদিগের গৃহ হইতে চলিয়া আসেন, তখন নিজ মানসিক বলের প্রতি কিছু অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন ব্রজরাজদিগের ভবনের প্রতি পশ্চাৎ ফিরিলেই, সেখানকার দুই মাসের স্মৃতির প্রতিও পশ্চাৎ ফিরিতে পারিবেন। মহাকবি কালিদাসের বর্ণিত, বায়ুর প্রতিকূলে নীয়মান কেতুর চীনাংশুকের ন্যায়, আর তাঁহার মন সে ভবনের দিকে চঞ্চল হইয়া ছুটিবে না। কিন্তু পরীক্ষাতে দেখিলেন সে স্মৃতি তাঁহাকে সহজে ছাড়িতেছে না। রাঙ্গা মাকে ছাড়িয়া আসিয়া বা নিজ সহোদরের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তিনি হৃদয়ের এত চঞ্চলতা অনুভব করেন নাই। মন যেন সেই ভবনে আবার যাইতে চায়, সেই সুখ আবার সম্ভোগ করিতে চায়। নবীন আজীবন আপনার অন্তরে সুখস্পৃহাকে দমন কবিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এক্ষণে মনের এই গতিকে সুখ-লালসা-সম্ভূত জ্ঞান করিয়া নিজের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং মনে মনে সংকল্প করিলেন, সুখাসক্ত হৃদয়কে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না; সুতরাং অগ্রে যে সপ্তাহে প্রায় দুই তিন দিন সে ভবনে যাইতেন, তাহাও যাইবেন না। একদিকে এইরূপ সংকল্পে আপনাকে বাঁধিলেন; অপর দিকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত "হিতৈষী" পত্রিকার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন; সে জন্য নানা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন; বিলাত হইতে সুরাপাননিবারণসম্বন্ধীয় পুস্তক ও পত্রিকাদি আনাইবার চেষ্টাতে রত হইলেন; এবং সুরাপান সম্বন্ধে ডাক্তার-দিগের ও দেশীয় বড় বড় লোকের মত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত পূর্বাপেক্ষা অধিক একাগ্রতার সহিত সংস্কৃত পাঠে মনোনিবেশ করিলেন; এবং সর্বোপরি সর্বদা একাকী নির্জনে ঈশ্বর-চিন্তাতে কালযাপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মানসিক সংগ্রাম ও গুরুতর শ্রম বশতঃ শরীর দিন দিন শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। দেখিয়া বন্ধুগণ সকলেই চিন্তিত হইলেন।

ওদিকে নবীনচন্দ্রের যাওয়ার দিন হইতে কৃষ্ণকামিনী ঘোর বিষাদমগ্না ও লজ্জাতে অভিভূতা। নবীনচন্দ্র চলিয়া গেলেই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যাঁহার আমাদের বাড়ীতে এতদিন থাকিবার কথা ছিল, তিনি হঠাৎ চলিয়া গেলেন কেন? একবার ভাবিলেন, আর কিছু নয় ছোট মাসীর উপদ্রবে পলাইয়া গেলেন। আবার সরলা বালিকার বুদ্ধিটা এই পথ হইতে সরিয়া পড়িল; ভাবিলেন,—না না, বোধহয় আমার ব্যবহারে কিছু অসাবধানতা হইয়া থাকিবে; নতুবা মামা এ বাড়ীতে তাঁহার আসা বন্ধ করিবেন কেন? নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই ভাবিয়া একদিন পড়িয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন; তীব্র আত্মনিন্দার যাতনা অকারণ সহ্য করিলেন। তৎপরে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, সে ভবনে আর নবীনচন্দ্রের দেখা নাই। 'হিতৈষী' পত্রিকা যথাসময়ে বাহির হইল; তাহার আপিসের জন্য একটা ঘর লওয়া হইল; এবং সেইখানেই নবরত্ন সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। ব্রজরাজ ও মথুরেশ নবীনকে তাঁহাদের বাড়ীতে আনিবার জন্য মধ্যে মধ্যে টানাটানি করেন, নবীন যাব যাব করিয়া কাটাইয়া দেন; এবং সুখস্পৃহ মনকে চাবুক মারিতে থাকেন, আসিতে ইচ্ছা হইলেও এ বাড়ীতে আসেন না! এইরূপে প্রায় দেড় মাস অতীত হইয়া গেল।

একদিন দুপুর বেলা ঘোষ-গৃহিণী বলিলেন—"নবীন সেই যে গেল, আর একবার দেখা দেয় না; এত কঠিন হলো কি করে? একেবারে কি মায়াটা কাটালে?" কৃষ্ণকামিনী নিরুত্তর। জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ বলিলেন—"তিনি মানী লোক; বোধ হয় মামাশ্বশুর মহাশয়ের কথাগুলো তাঁর কানে গিয়ে থাক্‌বে, তাই লজ্জাতে আর আসেন না।"

গৃহিণী। সে কথা তাকে কে বল্‌বে? যা হোক্ কাল রাত্রে খাবার জন্যে তাকে নিমন্ত্রণ করা যাক্; ব্রজ কি মথুরেশ বল্‌লে না আস্‌তে পারে, আমার কথা ফেল্‌তে পারবে না। কেষ্টো, কাগজ কলম আন্‌তো। আমি বলছি, আমার নামে নিমন্ত্রণ করে একখানা চিঠি লেখ্‌তো।

কৃষ্ণকামিনী। কাজ কি মা, ভদ্রলোকের ছেলেকে এত টানাটানি করে? তিনি কাজের মানুষ, সময় হয় না বলেই আসেন না।

গৃহিণী। তুই আন্‌না কাগজ কলম; না ডাক্‌লে সে আস্‌বে না।

কৃষ্ণ। আমি লিখ্‌তে পার্‌বো না, বড় দাদা কি ছোট দাদাকে দিয়ে লিখ্‌ইও।

গৃহিণী। কেন. তোমার আবার হলো কি? একখানা চিঠি লিখ্‌তে পার না? যা আন্‌গে যা।

কৃষ্ণকামিনী মাতার অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া কাগজ কলম আনিলেন ও চিঠি লিখিতে বসিলেন। এই তাঁর নবীনচন্দ্রের নিকট প্রথম পত্র লেখা, যদিও পরের নামে। অনিচ্ছাতে পত্রখানি লিখিতে তাঁহার হস্ত বার বার স্বিন্ন হইতে লাগিল; বার বার অঞ্চল দিয়া স্বিন্ন অঙ্গুলি সকল মুছিতে লাগিলেন। কণ্ঠতালু যেন শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে তিনি কোনও প্রকারে পত্রখানি সমাপ্ত করিলেন। তাহাতে এই লেখা হইল,—"তুমি অদ্য আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে; ও কল্য রাত্রে এখানে আহার করিবে।" পত্রখানি যথাসময়ে ভৃত্যের হস্তদ্বারা যথাস্থানে প্রেরিত হইল। নবীনচন্দ্র স্কুল হইতে আসিয়াই পত্রখানি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কৃষ্ণকামিনীর হস্তাক্ষর চিনিতেন। উপরে তাঁহার হস্তাক্ষর দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। একি! কৃষ্ণকামিনী আমাকে পত্র লিখিয়াছে, ইহা ত কখনও ভাবি নাই। খুলিতে তাঁহার হস্ত কাঁপিতে লাগিল; হৃন্মর্মস্থানে এক-প্রকার ভয় ও আশাজনিত কম্পন অনুভূত হইতে লাগিল। পত্র খুলিয়া প্রথমেই স্বাক্ষরটী দেখিলেন। স্বাক্ষর "তোমার মাসী।" তখন মনের উত্তেজনাটা একটু হ্রাস হইল। পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন; পাঠ করিয়া শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। এমন কি হইবে, কৃষ্ণকামিনীর পরামর্শক্রমে তাহার মাতা পত্র লিখিয়াছেন? আবার ভাবিলেন, না, তাহার স্বভাব এরূপ নয়। যাহা হোক নিমন্ত্রণটা লই কি না? নিমন্ত্রণ না লইয়াই বা থাকি কিরূপে? যাঁহারা পুত্রবৎ স্নেহে পরিচর্যা করিলেন, তাঁহাদের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করি কিরূপে? শয্যায় পড়িয়া অনেকক্ষণ এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া অবশেষে সন্ধ্যার পূর্বে ব্রজরাজদিগের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। পথে প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন, দেখাইবেন যেন কিছুই ঘটে নাই। কিন্তু তিনি গিয়া দাঁড়াইবামাত্র ঘোষগৃহিণী বলিলেন—"ওমা, নবীন কি হয়ে গেছে দেখ, সেরূপ চেহারা যেন আর নাই! সোনার মুখ কালি হয়ে গেছে; কি হয়েছে বাপধন? কোনও মনের কষ্টে কি আছ?"

হায় রে! অকৃত্রিম প্রীতির এমনি গুণ, ঘোষগৃহিণীর অমৃতনিষ্যন্দসম এই

কথাগুলি শুনিয়া নবীনের ন্যায় তেজস্বী বলবান্ পুরুষেরও চক্ষে জল আসিল গৃহিণী কৃষ্ণকামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন—"ও কেষ্টো, এসে দেখ্ নবীন একেবারে আধখানা হয়ে গেছে।" সে সময়ে স্বীয় ভ্রাতার সদুপদেশ ও সতর্কতা স্মরণে আসিল না। কৃষ্ণকামিনী মাতার আহ্বানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসিলেন। গৃহিণী নবীনের প্রতি, কঠিন-হৃদয়, দয়া-মায়াহীন, প্রভৃতি অনেক অনুযোগ করিয়া নানা কুশলপ্রশ্নান্তে কার্যান্তরে গমন করিলেন। নবীন ও কৃষ্ণকামিনী একা এক ঘরে রহিলেন। নবীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্র তুমি লিখেছিলে?"

কৃষ্ণ। হাঁ, আমার লেখ্‌বার ইচ্ছে ছিল না, মা কোনমতে শুন্‌লেন না; অনুরোধে লিখ্‌তে হলো।

নবীন। ইচ্ছে ছিল না কেন? আমি এখানে আসি তা তুমি কি চাও না?

কৃষ্ণ। আপনার অনেক কাজ, আপনাকে কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন কি?

নবীন। ওটা ত গেল অভিমানের কথা। একটু এখানে আস্‌তে কি এতই কষ্ট? তুমি কি সেই জন্য লিখ্‌তে চাওনি?

কৃষ্ণকামিনী মুখ ফিরাইলেন, এবং বোধ হইল যেন অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন; তৎপরে আর দাঁড়াইলেন না, চলিয়া গেলেন।

নবীনচন্দ্র একাকী কিয়ৎকাল বসিয়া ভাবিলেন; তৎপরে উঠিয়া টিমিকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন ও ব্রজরাজের আপীস হইতে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তাহার সঙ্গে খেলা করিতে লাগিলেন। টিমিকে স্কন্ধের উপর বসাইয়া দৌড়িতে লাগিলেন—"টিমুমণি, বল ত আমি কে?" উত্তর—ধোঁলা। ক্রমে ব্রজরাজ ও মথুরেশ আসিলে তিন বন্ধুতে আবার অনেক দিনের পর অনেক কথোপকথন হইল। তৎপরদিন রাত্রে তিনি ব্রজরাজদের বাড়ীতে আহার করিলেন।

ঘটনাক্রমে নবীনচন্দ্রের নিমন্ত্রণ খাওয়ার পর দিনই মাতঙ্গিনী ভগিনীর সহি সাক্ষাৎ করিতে আসিল। আসিয়াই বধূদিগের মুখে শুনিল, যে তৎপূর্বদিন ঘট করিয়া নবীনচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ খাওয়ান হইয়াছে। সে জানিত, নবীনচন্দ্র এখা থাকেন না, এবং নবরত্ন সভা সে গৃহ হইতে উঠিয়া গিয়াছে; সে বাড়ীর সঙ্গে নবীনের আর সম্পর্ক নাই; কৃষ্ণকামিনীর বিষয়ে সে যে সন্দেহ করিয়াছিল, তাহ ঘুচিয়াছে; কিন্তু এই সংবাদে তাহার বুদ্ধি আর একদিকে ছুটিল। তাহার মে হইল, নবীনচন্দ্র কৃষ্ণকামিনীকে বিবাহ করিতে চান; এবং ব্রজরাজ ও তাহার মাত এই পরামর্শের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে; তাই নিমন্ত্রণাদি চলিতেছে। সে মে মনে শাসাইয়া গেল: কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

মাতঙ্গিনীর গমনের দুই দিন পরেই ব্রজরাজের মাতুল আবার একদিন সন্ধ্যার সময়ে এ বাটীতে আসিলেন। আসিয়া বলিলেন,—"কৃষ্ণ প্রায় এক বৎসর আমাদের বাড়ীতে যায় নাই। আমি তাহাকে কিছুদিন ও বাড়ীতে নিয়ে রাখ্‌তে চাই।" গৃহিণী বলিলেন,—"বেশ ত, বেশ ত।" কৃষ্ণকামিনীও বলিলেন,—"মামা, চলুন আজই আপনার সঙ্গে যাই।" শ্যামচাঁদ বাবু বলিয়া গেলেন—"কল্য তোমার জন্য লোক পাঠাব, যেও।" পরদিন লোক আসিয়া কৃষ্ণকামিনীকে মাতুলালয়ে লইয়া গেল। কৃষ্ণকামিনী গিয়া দেখেন, যেরূপ আশা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমতঃ, মাতঙ্গিনী তাহাকে বিধিমতে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিল। কথায় কথায় নবীনের নিন্দা করে; এইটা কৃষ্ণকামিনীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। সরলা বালিকা, অধিক কথা কহা তাহার অভ্যাস

নয়, তর্ক করা তাহার স্বভাব নয়, চিরদিন নীরবে কাজ করিয়া আসিতেছে; নীরব থাকিতেই ভালবাসে; এবং চিরদিন নীরবে কাজ করিয়া যাইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ়ও আছে; কিন্তু মাতঙ্গিনীর ব্যবহারটা তাঁহার প্রাণে এতই ব্যথা দিতে লাগিল যে একদিন সেই স্বভাবতঃ শান্ত-প্রকৃতি বালিকারও মনে কোপের উদয় হইল। স্বাভাবিক সরল ক্রোধে তাঁহার মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"ছোট মাসি! তোমার ব্যবহার দেখে আমি অবাক্ হয়েছি; নিজে যাঁর এত প্রশংসা কর্‌তে, যাঁর চরিত্রে কেউ কোনও দোষ দেখ্‌তে পায় না, তাঁর এই নিন্দেগুলো করো, মুখে বাধে না? লজ্জা হয় না?"

মাত। তুই ফোঁস করে উঠবি বৈ কি? তোর আশা আছে কিনা!

কৃষ্ণ। তুমি কি বল? কিসের আশা আছে?

মাত। আমরি! ন্যাকামি দেখ, যেন ভাজা মাছটী উল্‌টে খেতে জানেন না! কিসের আশা তা বুঝ্‌তে পারলেন না! ওলো, মর্‌বো না, বেঁচে থাক্‌বো, দেখ্‌বো লো দেখ্‌বো, যেদিন দু হাত এক হবে, সেদিন বুঝ্‌বো!

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণকামিনীর ক্রোধ অন্তর্হিত হইয়া লজ্জার উদয় হইল। কারণ তাঁহার মনে পরিণয়েচ্ছার বিন্দুবিসর্গও নাই। তিনি বলিলেন, "ছি ছোট-মাসি! আমাকে এতদিন দেখে, এতদিন জেনে, এমন কথাটা বল্‌লে?" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মাতঙ্গিনী নবীনের নিকট অপমানিত হইয়া ঈর্ষা ও ক্রোধে জ্বলিতেছিল; কিন্তু কৃষ্ণকামিনীর অশ্রু দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—"তোর আশা না থাক্, তার ত আশা আছে; ও একই কথা।"

কৃষ্ণ। তাঁর প্রতি কেন অন্যায় কর? তিনি কি কারুকে এমন কথা বলেছেন? বা ভাবে প্রকাশ করেছেন? উদ্দেশে খড়ি পেতে মানুষকে দোষী কর কেন?

মাত। যা যা আমি তোদের মত অন্ধ হইনি। নবীন বোসের নামে তোদের যেমন লাল পড়ে, আমার তা পড়ে না। তোদের মত আমি উপরটা দেখে ভুলিনে। ওর মত ধূর্ত লোক কি আর আছে?

কৃষ্ণকামিনী লজ্জায়, ক্রোধে, মনের আবেগে আর কথা কহিতে পারিলেন না; সেখান হইতে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। মাতঙ্গিনী দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "মাতঙ্গিনী থাক্‌তে আর অভীষ্ট সিদ্ধ করতে হচ্চে না।"

একদিকে মাতঙ্গিনীর এই প্রকার বাক্য-বাণ, অপরদিকে আর এক উপদ্রব উপস্থিত, যাহার অনুরূপ উপদ্রব কৃষ্ণকামিনী জন্মে কখনও ভোগ করেন নাই। শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয়ের শ্যালক উমাশঙ্কর দে এই ঘটনার দুই দিন পরেই পীড়িত হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় মিত্র মহাশয়েরই ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এস্থলে উমাশঙ্করের কিঞ্চিৎ পরিচয় দি। মিত্রজ মহাশয়ের শ্বশুর গোপীনাথপুর গ্রামের জমিদার ছিলেন। নিজের পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার গুণে পৈতৃক সম্পত্তির অনেক উন্নতি করিয়া যান। তাঁহার জীবদ্দশায় বার মাসে তের পার্বণ এবং যথাসাধ্য দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথির সেবাদির কিছুরই ব্যতিক্রম ঘটিত না; অথচ বিষয় বৃদ্ধির দিকে তাঁহার বিলক্ষণ মনোযোগ ছিল। কিন্তু বিষয় বৃদ্ধির দিকে যেরূপ মনোযোগ ও চিত্তের একাগ্রতা ছিল, একমাত্র পুত্র উমাশঙ্করের শিক্ষা ও চরিত্রের উন্নতি বিষয়ে সেরূপ মনোযোগ ছিল না। আর ধনিসন্তানদের শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ করিয়াই বা কি হইবে? কুসঙ্গ বাল্যকাল হইতেই তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে। প্রথম দাসদাসীর নিকট কুশিক্ষা, তৎপরে পিতার

মোসাহেবদিগের তোষামোদ, তৎপরে যৌবনের সঙ্গিগণের উত্তেজনা, ইহাতে ধনিসন্তানদিগের মতিগতি স্থির থাকিতে দেয় না। উমাশঙ্করের বেলাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই উমাশঙ্কর অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। এমন পাপ নাই, যাহা তাহার অজ্ঞাত আছে; এমন নেশা নাই, যাহা সে করে নাই। দুষ্ক্রিয়াসক্ত পুরুষদিগের আকৃতিতে যে এক প্রকার দুর্বলতা ও বিলাসিতার ছায়া থাকে, উমাশঙ্করের আকৃতিতে তাহা দেদীপ্যমান। মিত্রজ মহাশয় শ্যালকের চিকিৎসার সমুচিত বন্দোবস্ত করিলেন। উপযুক্ত চিকিৎসা ও ভগিনীর শুশ্রূষার গুণে, কয়েকদিনের মধ্যেই উমাশঙ্কর আরোগ্য-লাভ করিল। তৎপরে অল্পদিনের মধ্যেই কৃষ্ণকামিনী বুঝিতে পারিলেন যে উমাশঙ্করের দৃষ্টি তাঁহার উপরে পড়িয়াছে। সে যখন বাড়ীর মধ্যে আহার করিতে আসে, কৃষ্ণকামিনী তাহার ত্রিসীমায় যান না, অথচ সে যদি কোনও প্রকারে তাঁহাকে একবার দূরেও দেখিতে পায়, অমনি কি এক রকম করিয়া তাকায়, যাহা দেখিয়া কৃষ্ণকামিনীর সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়। তিনি আরও দূরে দূরে থাকেন। কৃষ্ণকামিনী যে ঘরে শয়ন করেন, বাহির বাড়ীর দিকে তাহার একটি জানালা আছে। একদিন কৃষ্ণকামিনী শয়ন করিতে গিয়া দেখিলেন, মশারির চালের উপরে একখানি ফুলের পাখা রহিয়াছে ও তাহার গায়ে একখানি চিঠি বাঁধা আছে। তাঁহার বোধ হইল, কেহ জানালা দিয়া পাখাখানা ফেলিয়া দিয়া থাকিবে। চিঠিখানা প্রদীপের নিকট গিয়া পড়িয়া দেখিলেন, তাহা তাঁহারই উদ্দেশ্যে লিখিত। লেখকের নাম নাই; আদ্যোপান্ত অতি অভদ্র ও ব্রীড়াজনক ভাষাতে লিখিত। সেরূপ ভাষা তিনি জীবনে কখনও শুনেন নাই। তাহাতে অনেক ভালবাসা-সূচক শব্দের প্রয়োগ আছে, এবং গভীর বিরহযন্ত্রণারও প্রকাশ আছে; এবং সর্বশেষে এই সঙ্কেত আছে, যে সেই রাত্রে সকলে ঘুমাইলে, সিঁড়ীর ঘরের পার্শ্বের গলিতে অপেক্ষা করিলে লেখকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

লেখক যে কে, তাহা বুঝিতে আর বাকি রহিল না। কৃষ্ণকামিনী একবার মনে করিলেন, পত্রখানা মাতুলানীকে দেখান কর্তব্য। আবার ভাবিলেন, নিজে সেদিকে কর্ণপাত না করিলেই হইল। দুই চারি দিন দেখিয়া আপনিই নিবৃত্ত হইবে। এই ভাবিয়া পত্রখানি ছিঁড়িয়া পাখাখানি গুঁড়া করিয়া, বাড়ীর পশ্চাৎদিকের গবাক্ষ দিয়া পশ্চাদ্বর্তী নর্দামাতে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন। আসিয়া সে জানালাটী বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন! অপর একদিন রাত্রি ১০টার পর সকলে এক প্রকার ঘুমাইলে বাড়ীর একটা ঝী কৃষ্ণকামিনীকে নির্জনে একটা অন্ধকার স্থানে ডাকিয়া লইয়া গেল; এবং তাঁহার হস্তে এক ঠোঙ্গা মিঠাই দিয়া বলিল, "গিন্নির ভাই উমাশঙ্কর বাবু বড়বাজারে গিয়াছিলেন; এক ঠোঙ্গা মিঠাই তোমার জন্য এনেছেন। তুমি এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে খাও, আমি জল এনে দিচ্চি। তারপর একটু কথা আছে।" এই কথা শুনিয়াই কৃষ্ণকামিনী অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন। সমুদায় খাবার মাটীতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, এবং ঝীকে অনেক তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি যাই এখনি মামীকে বলে দেবো। তুই অতি অসৎ, তোর অসাধ্য কর্ম নাই, তোর মত মানুষকে বাড়ীতে রাখ্‌তে নাই, তুই গৃহস্থের সর্বনাশ কর্‌তে পারিস্‌।" ইত্যাদি বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। চাক্‌রাণী তাঁহার পায়ে ধরিয়া পড়িয়া রহিল; কোন মতেই যাইতে দিবে না; অবশেষে তাহাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল, যে সে যাত্রা তিনি কিছু বলিবেন না,

সে এমন কর্ম আর করিবে না।

কিছুদিন এই প্রকারে চেষ্টা করিয়া উমাশঙ্কর বুঝিল যে তাহার চিরাভ্যস্ত বিদ্যা এই বালিকার প্রতি খাটিবে না। সে ক্রমে নিরস্ত হইল। উমাশঙ্করের স্বভাব চরিত্র জানা অবধি কৃষ্ণকামিনী বাড়ীতে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতুল ও মাতুলানী প্রভৃতি তাঁহাকে নিবারণ করিয়া রাখিতে লাগিলেন।

ক্রমে মানব-প্রকৃতির আর একটা দিকে কৃষ্ণকামিনীর একটা চক্ষু পড়িতেছে। মাতুলালয়ে আসা পর্যন্ত তিনি যে ঘরে শয়ন করিতেন, সেই ঘরের মেজেতে বাড়ীর রাঁধুনি, একটী নিরীহস্বভাবা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক শয়ন করিত। মাতঙ্গিনী অন্য এক ঘরে শয়ন করিত। কয়েক দিন পরে, কি কারণে জানি না, মাতঙ্গিনী কৃষ্ণকামিনীর ঘরে শয়ন করিবার বন্দোবস্ত করিল। কৃষ্ণকামিনী আনন্দিত হইলেন, ছোট মাসীর সঙ্গে থাকিবেন। তাঁহার ভয়টা আর থাকিবে না। মাতঙ্গিনী আসিয়া বলিল,—"আমি কাহারও সঙ্গে এক বিছানাতে ঘুমাইতে পারি না। আমি মেজেতে শোব, তুই তক্তপোষেই থাক্!" কৃষ্ণকামিনী সে বন্দোবস্তে আপত্তি করিয়া বলিলেন, "না ছোটমাসি! আমি মেজেতেই শোব, তুমি তক্তপোষে থাক।" মাতঙ্গিনী এই বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট হইল। কৃষ্ণকামিনী সরল ভাবে বলিলেন, "ছোটমাসি, বাহির বাড়ীর দিকে জানালা খুলে রেখ না।" মাতঙ্গিনী বলিল, "বাপ্‌রে! আমি গরমি সইতে পারিনে, হাওয়া না হলে বাঁচবো না।" সুতরাং সে জানালা প্রতি রাত্রে খুলিয়া রাখা হইত। দুই একদিন গভীর রাত্রে কৃষ্ণকামিনী যেন দেখিলেন, জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া কে কি দিতেছে। ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহের সঞ্চার হইল। আর একদিন তিনি অঘোরে ঘুমাইতেছেন, কে যেন তাঁহার পা মাড়াইয়া চলিয়া গেল, তাহাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল; তিনি পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শুইলেন; উঠিলেন না; মশারির মধ্য হইতে দ্বারের অল্পালোকে দেখিলেন যেন সেই ঝীটা চুপে চুপে কি বলিয়া ছোটমাসীকে ডাকিয়া লইয়া গেল। এই সকল দেখিয়া কৃষ্ণকামিনীর মনে এক প্রকার অনির্দিষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার হইল। একবার ভাবিলেন, মাতুলানীকে সমুদায় জানাইবেন, কিন্তু আবার ছোটমাসীর ভয়ে ও স্বাভাবিক লজ্জাশীলতাবশতঃ বলিতে পারিলেন না। তিনি ঘরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মিত্রজ মহাশয় যে উদ্দেশ্যে তাঁহাকে আনিয়াছিলেন, তাহা তখনও ব্যক্ত করেন নাই, তাহার আরও দুইদিন অবশিষ্ট আছে। সুতরাং তাঁহাকে কোন মতে যাইতে দিলেন না। সে উদ্দেশ্যটা এই, দুই দিন পরে বাড়ীর মেয়েদের কি একটা ব্রত আছে, সেই দিন প্রত্যূষে মহিলারা সকলে গঙ্গাস্নানে যাইবেন, গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া পূজা করিবেন ও কথা শুনিবেন। মিত্রজ মহাশয় বাড়ীর রমণীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছেন, যে, সেইদিন কৃষ্ণকামিনীর হাতের চুড়ি খুলিয়া তাহাকে থান পরাইতে হইবে ও ব্রত করাইতে হইবে। মাতঙ্গিনী এই পরামর্শের মধ্যে আছে; কিন্তু কৃষ্ণ-কামিনীর নিকট সমুদায় গোপন রাখিয়াছে।

ব্রতের পূর্ব দিন সায়ংকালে মিত্রজ মহাশয় আপীস হইতে আসিবার সময় কৃষ্ণকামিনীর জন্য এক যোড়া থান কাপড় লইয়া আসিলেন। আহারান্তে কৃষ্ণকামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ! মা লক্ষ্মি! তুমি ছেলেবেলা বিধবা হয়েছ,

ছেলে মানুষের হাতের চুড়িগুলো খুল্‌তে প্রাণে লাগে বলে, তোমার মা ভাই এতদিন তোমার হাতের গহনা খুল্‌তে পারে নাই; পেড়ে কাপড়ও বদ্‌লাতে পারে নাই; এখন ত তুমি বড় হয়েছ; সব কথাই ত মা বুঝ্‌তে পার; হিঁদুর ঘরের বিধবা, এত বড় মেয়ে, পেড়ে কাপড়টা পরে থাকা ও হাতে চুড়িগুলো দেওয়া আর ভাল দেখায় না। তোমার জন্যে এই থান কাপড় এনেছি। কাল মেয়েদের ব্রতের দিন। কাল সকালে সকলের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করে, হাতের চুড়ি খুলে এই থান পর্‌বে, পূজো কর্‌বে, কথা শুন্‌বে, তারপর সকলের সঙ্গে হবিষ্যি কর্‌বে। আর একটা কথা বলি শোন। তোমার মা তোমাকে নির্জলা একাদশী করান না; সেটা অতি অধর্মের কথা; হিঁদুর ঘরের বিধবার পক্ষে মহা পাপ। পরশু একাদশী, তোমাকে নির্জলা উপবাস কর্‌তে হবে। আর প্রতিদিন বিকালে লুচি মিঠাই প্রভৃতি বাবুয়ানা জল খেলে চল্‌বে না। অন্যান্য বিধবাদের ন্যায় যা হয় একটু কিছু খেয়ে থাক্‌তে হবে।" কৃষ্ণকামিনী তখন আর কিছু উত্তর দিলেন না, নিজের ঘরে গিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহার মনে অতিশয় বিদ্রোহিতার ভাব আসিতে লাগিল। এরূপ পরাধীনতা, এরূপ বলপ্রয়োগ, তাঁহার ভাল লাগিল না। একবার মনে করিলেন, মাতুলের কোন অনুরোধ রক্ষা করিবেন না; আবার ভাবিলেন, চুড়ি ও পেড়ে কাপড়ে কি আছে, কেন পরিত্যাগ করিতে পারিব না? বরং আমি যে তপস্যাতে প্রবৃত্ত হইব ভাবিতেছি, তাহার পক্ষে কিঞ্চিৎ কৃচ্ছ্র সাধন ত ভালই। এই ভাবটা মনে আসাতে বৈকালের অর্ধাশন ও একাদশীর নির্জলা উপবাসের প্রস্তাবটাও তাঁহার চক্ষে ভাল বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু পূজাটা করিতে মন কোনও প্রকারেই প্রস্তুত হইল না। তিনি নবরত্ন সভার আলোচনাতে কতদিন উপস্থিত থাকিয়াছেন; পৌত্তলিকতাকে মহাভ্রান্তি বলিয়া চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন; পৌত্তলিকতা বর্জন করিতে হইবে, ইহা একপ্রকার সংকল্প করিয়া রাখিয়াছেন; নবীন যখন ঠাকুর প্রণাম না করাতে গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহাকে মনে মনে কত প্রশংসা করিয়াছেন; আজ তিনি কিরূপে নিজে ব্রত ও পূজা করিতে যাইবেন? যতবার ভাবেন, কি করি, নতুবা যে মামা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইবেন; অমনি মন বলে, তাহা হইলে অধর্ম হইবে; এবং তাহা হইলে তিনি আর নবীনচন্দ্র বসুর শ্রদ্ধার পাত্র থাকিতে পারিবেন না; অমনি মন সংকুচিত হইয়া আসে। তিনি শুনিলে কি ভাবিবেন, কেবল এই চিন্তাই মনে হয়।

অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া এই স্থির করিলেন যে ফলাফল যাহাই হউক, তিনি গঙ্গাস্নানে যাইবেন না ও পূজো করিবেন না; চুড়ি খুলিবেন, থান পরিবেন, অর্ধাশনে থাকিবেন ও নির্জলা একাদশী করিবেন। কৃষ্ণকামিনী উত্তর না করাতে মিত্রজ মহাশয় ভাবিতেছিলেন, "মৌনং সম্মতিলক্ষণং," সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে পরদিন অনেক বেলা পর্যন্ত নিদ্রা যাইতেছেন। মহিলারা অতি প্রত্যুষ উঠিয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। যাইবার পূর্বে কৃষ্ণকামিনীকে ডাকিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, "আমি যাব না।" একটু পীড়াপীড়িও করা হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মিত্রজ মহাশয় নিদ্রাভঙ্গে যখন শুনিলেন যে কৃষ্ণকামিনী গঙ্গাস্নানে যায় নাই, তখন অতিশয় বিরক্ত হইলেন। উগ্র ও কর্কশস্বরে কৃষ্ণকামিনীকে নিকটে ডাকিলেন,—"গঙ্গাস্নানে যাও নাই যে?" কৃষ্ণকামিনী উত্তর করিলেন, "আমি কাল রাত্রে স্থির করেছি গঙ্গাস্নানে যাব না

এবং পূজা কর্‌তে পারব না; তদ্ভিন্ন আপনি যা কিছু আদেশ করেছেন তা সকলি কর্‌ব।"

মিত্রজ। (অতি বিরক্তি-কর্কশ স্বরে) সকল জেঠা সইতে পারি, মেয়ে জেঠা সইতে পারিনে; আর রিফর্মার হতে হবে না; যাও, ভাল চাও ত এখনি গিয়ে স্নান কর; যাও এখনি যাও, আর এক মিনিট দেরি করোনা।

কৃষ্ণকামিনী স্নান করিতে গেলেন। মিত্রজ মহাশয় বাড়ীর একটী দাসীকে একখান থান কাপড় দিয়া ও কৃষ্ণকামিনীর হাতের চুড়ি খুলিয়া লইতে আদেশ করিয়া বাহিরে গেলেন। বাড়ীর মহিলারা গঙ্গাস্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, কৃষ্ণকামিনী স্নানান্তে গাত্রের অলঙ্কার খুলিয়া ও থান পরিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। সকলে কিঞ্চিৎ আশ্চর্যান্বিত হইলেন। ক্রমে পূজার সময় উপস্থিত; এইবার সর্বাপেক্ষা কঠিন সংগ্রাম। মহিলাগণ সাজিয়া প্রস্তুত, কৃষ্ণকামিনীকে বার বার আহ্বান করিতেছেন, কৃষ্ণকামিনী একবার বলিয়াছেন যে তিনি পূজা করিবেন না, আর কিছুই বলিতেছেন না। অবশেষে গৃহের বৃদ্ধা বিধবাদিগের মধ্যে একজন আসিয়া তাঁহার হাতে ধরিলেন, "মা লক্ষ্মি! চল, নইলে কর্তা বড় রাগ করবেন, বিধবা মানুষের ত এই কাজ।" কৃষ্ণকামিনী সবিনয়ে উক্ত বৃদ্ধাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন; কোন ক্রমেই পূজাস্থানে গমন করিলেন না। তৎপরে তাঁহার মাতুলানী আগমন করিলেন। তিনি করে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন, "একি কেষ্টো! এই সকাল বেলা একটা কান্ড বাধাবি, আয় আর দেরি করিস্‌নে।" কৃষ্ণকামিনী একপদও নড়িলেন না। তিনি টানাটানি করিতেছেন, ইতিমধ্যে মিত্রজ মহাশয় সংবাদ পাইয়া অতিশয় উত্তেজিত অন্তরে আসিয়া উপস্থিত। সকলেই ভয় পাইল, কি জানি কি হয়। তিনি অতিশয় কর্কশস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "যাও, এখনি যাও, ভাল চাও ত আর একটুও দেরি করো না।" কৃষ্ণকামিনী নিরুত্তর; যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছেন, আর কি বলিবেন? সুতরাং উত্তর করিলেন না; কিন্তু এক পদও নাড়িলেন না। তাহাতে মাতুল আরও কুপিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে নিজে তাঁহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকামিনী পাষাণ প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মান, এক পদও নড়েন না; তিনি এত গোলযোগ কিছুই দেখিতেছেন না;-কেবল ভাবিতেছেন, যাহা মানি না তাহা কিরূপে করিব, বিশেষতঃ তিনি শুনিলে কি মনে করিবেন!

মিত্রজ মহাশয় হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। সময় বুঝিয়া মাতঙ্গিনী বলিয়া উঠিল, "মাগো! ধন্যি মেয়ে বল্‌তে হবে, এত বড় লোকটা হাতে ধরে টান্‌ছেন, গ্রাহ্যই নাই। দাদা ছেড়ে দেও, কেন অপমানিত হও!" যেই এই কথা বলা, অমনি ঘৃতাহুতি পাইলে অগ্নি যেরূপ প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ এই প্ররোচনা-বাক্যে মিত্রজ মহাশয়ের কোপ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে যাও মর," এই বলিয়া এমন সজোরে এক গলাধাক্কা দিলেন যে কৃষ্ণকামিনী তিন হাত ঠিকরাইয়া গিয়া একটা বইএর আলমারির উপরে পড়িলেন। মিত্রজ মহাশয় আরও প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কেবল গৃহিণী উভয়ের মধ্যে পড়িয়া 'কর কি?' 'কর কি?' বলিয়া নিবারণ করাতে নিরস্ত হইলেন। এদিকে কৃষ্ণকামিনী আঘাত পাইয়াই হঠাৎ চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন, ও দুই হস্তে নিজ বসনাঞ্চলে মুখ আবরণ করিয়াছেন। তাঁহার দুই নাসারন্ধ্র দিয়া রক্তধারা বহিতেছে; তাহাতে বসনাঞ্চল ভিজিয়া যাইতেছে। গৃহিণী

কুন্দ পতিকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন; এবং অপরাপর মহিলারা কৃষ্ণকামিনীর পরিচর্যাতে নিযুক্ত হইলেন।

মহিলাদের পূজা শেষ হইলে, কৃষ্ণকামিনী মাতুলকে জানাইলেন, যে তিনি সেই দিনই বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চান। মিত্রজ মহাশয়ের মন তখনও উষ্ণ ছিল; মাতঙ্গিনীর উত্তেজনাবাক্য তখনও তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই;—"এত বড় লোকটা" এবং "অপমান" এই দুইটা শব্দ তখনও মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল, সুতরাং তিনি কর্কশস্বরে বলিলেন, "যাক্, ওর আর এখানে থেকে কাজ নেই?" এই বলিয়া কৃষ্ণকামিনীকে গাড়ী করিয়া চাকরাণীর সঙ্গে বাড়ী পাঠাইবার জন্য আদেশ করিয়া আপীসে গেলেন।

কৃষ্ণকামিনী দুপুর বেলা চাকরাণীর সঙ্গে, চুড়িবিহীন হস্তে, থান পরিয়া, বস্ত্রের দ্বারা মস্তক বাঁধিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই বেশ দেখিয়া ও প্রহারের বৃত্তান্ত শুনিয়া, ঘোষ-গৃহিণী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলে আর কি হইবে? কৃষ্ণকামিনী আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না, শয্যা পাতিয়া দেও, বোধ হয় তাঁহার জ্বর আসিতেছে। বধূগণ ত্বরা করিয়া শয্যা পাতিয়া দিল, কৃষ্ণকামিনী জ্বরশয্যায় শয়ন করিলেন। সন্ধ্যা আসিতে না আসিতে তাঁহার কর্ণমূল ও একদিকের গণ্ড ফুলিয়া জ্বর আসিল।

এ দিকে মিত্রজ মহাশয় আপীসে গিয়া সুস্থিরভাবে কাজ করিতে পারিতেছেন না। তিনি ক্রোধের অধীন হইয়া যাহা করিয়াছেন, সেজন্য প্রবল অনুশোচনা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি অসৎ লোক নহেন; ভগিনী ও ভাগিনেয়দ্বয়ের, বিশেষতঃ এই ভাগিনেয়ীটীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ আছে। তাহাদের পিতার মৃত্যুর পর তিনিই পিতৃস্থানীয় হইয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন; কৃষ্ণকামিনী বাল্যকালে বৈধব্য-দশা প্রাপ্ত হইলে, তিনি অনেক কাঁদিয়াছিলেন, এবং তিনি নিজেই তাহার পেড়ে কাপড় ও হাতের চুড়িগুলি খুলিয়া লইতে বারণ করিয়াছিলেন। এখন যাহা করিয়াছেন, তাহার অনেকটা মাতঙ্গিনীর প্ররোচনাতে। মাতঙ্গিনী আসিয়া তাঁহাকে কি শুনাইয়াছে বলিতে পারি না, যাহাতে মিত্রজ মহাশয়ের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে তাঁহার ভাগিনেয়দ্বয় ও ভাগিনেয়ীটী বিকৃত হইয়া যাইতেছে; হিন্দু-রীতিনীতির প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইতেছে; কেবল তাহা নহে; মাতঙ্গিনীর মুখে তিনি শুনিয়াছেন, যে গোপনে কৃষ্ণকামিনীর বিবাহ দিবার চেষ্টা হইতেছে। মাতঙ্গিনীর কথাতে যে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে দোষী করা যায় না। চারিদিকে যেরূপ বিধবাবিবাহের আন্দোলন উপস্থিত, নিত্য নিত্য যেরূপ নূতন নূতন জনরব উঠিতেছে, ইহাতে এরূপ বিশ্বাস করাতে আশ্চর্য কি? মিত্রজ মহাশয় নিজে ইংরাজী শিখিয়াছেন, আপীসে চাকুরীও করেন বটে, কিন্তু লৌকিক আচারব্যবহারগুলি মান্য করিয়া চলেন; কারণ তিনি যে সমাজে বাস করেন, তাঁহাকে সে সমাজের মুখ দেখিয়া চলিতে হয়। আর ইহাও মনে করা কর্তব্য নয়, যে কেবল মাত্র মাতঙ্গিনীর কথাতে তিনি কৃষ্ণকামিনীর হস্তের অলঙ্কার খুলিয়া থান পরাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন হইতে মধ্যে মধ্যে ভাবিয়াছিলেন, "কৃষ্ণকামিনী বড় হইয়া গেল, এখন বিধবার আচার করাই উচিত।" এত দিনের পর সেই সংকল্পটা কার্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এই মাত্র। যাহা হোক তিনি সমস্ত দিন মনের যন্ত্রণায় কাল কাটাইয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে, আপীস হইতে ফিরিবার সময় কৃষ্ণকামিনীকে দুইটী

মিষ্ট কথা বলিয়া যাইবেন।

ব্রজরাজ ও মথুরেশ আপীস হইতে আসিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া একেবারে আগুন হইয়া গেলেন। পূর্বাবধিই মাতুলের সঙ্গে তাঁহাদের অনেক বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইয়া মধ্যে মধ্যে তর্কবিতর্ক ও রাগারাগি হইয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, মাতুল যে এখনও তাহাদিগকে নাবালকের ন্যায় ব্যবহার করিবেন, ইহা তাহাদের সহ্য হয় না। মথুরেশ বলিলেন, "একি জুলুম, একি অত্যাচার! এত বড় মেয়েকে এই প্রহার! আসুন দেখি মামা, তাঁর সঙ্গে আর কথা কব না। আমাদের এমন অভিভাবকের দরকার নেই।" ব্রজরাজ জননীকে বলিলেন, "বল আর মামার বাড়ী যেতে চাবে না?" দুই ভ্রাতাতে এইরূপ আক্রোশ প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে যেই দেখা, অমনি সকলে নিস্তব্ধ। অন্য দিন তিনি আসিলে সকলে যেমন আনন্দ প্রকাশ করে, আজ আর কেহই তাহা করিল না: কাহারও মুখে প্রসন্নতার চিহ্ন নাই; অভ্যর্থনাসূচক শব্দ নাই! কেনই বা থাকিবে? মিত্রজ মহাশয় তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত, দুঃখিত বা আশ্চর্যান্বিত হইলেন না। একেবারে নিজ ভগিনীর ঘরে গিয়া ভগিনী ও ভাগিনেয়দ্বয়কে নিকটে ডাকিলেন; এবং তাঁহাদের নিকট অনেক ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে তাঁহাদের মন কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিল। অবশেষে তিনি কৃষ্ণকামিনীর ঘরে গেলেন। মনে করিয়াছিলেন, তাহারও নিকটে ক্ষোভ প্রকাশ করিবেন, সান্ত্বনার্থ দুই চারিটী মিষ্ট কথা বলিলেন, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়াই যখন দেখিলেন যে কৃষ্ণকামিনীর একদিকের গন্ড বিলক্ষণ ফুলিয়াছে, তখন মনে এতই লজ্জা হইতে লাগিল যে আর মুখে কথা সরিল না। মৌনী হইয়া তাঁহার শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কৃষ্ণকামিনী চক্ষু মুদিয়া ছিলেন, মাতুল মহাশয় এক পার্শ্বে বসিবামাত্র চাহিয়া দেখিলেন। এক মুহূর্তের জন্য উভয়েরই মুখে কথা নাই। ক্রমে কৃষ্ণকামিনী মৌনভাব ভঙ্গ করিলেন—"মামা, আপনি কি আপীস হতে আস্চেন।" উত্তর, "হাঁ,-আপীস থেকেই আসচি কৃষ্ণ, আমি সমস্তদিন মনের ক্লেশে আপীসে কাজ কর্তে পারি নি! রাগ চন্ডাল, তার অধীন হয়ে সকালে যা করেছি, তা জীবনে করি নাই।"

কৃষ্ণ। (মাতুলের হস্তের উপরে নিজ হস্তখানি রাখিয়া) কেন মামা! আপনি মন খারাপ করেছেন? রাগ হবারই ত কথা, আমার বাবা থাক্‌লে ত ওর চেয়ে রাগতেন! না মামা, অমন করে বলবেন না, আমি জানি আপনি আমাদের ভালবাসেন, কখনও গায়ে হাত তোলেন নি। হঠাৎ রাগ হ'য়ে গিয়েছিল, তা কি কর্‌বেন।

কৃষ্ণকামিনীর এই কথাগুলিতে মিত্রজ মহাশয় বালকের ন্যায় নিজ হস্তে মুখ আবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মাতুলের চক্ষে জল দেখিয়া কৃষ্ণকামিনী একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন; মাতুলের হাত ধরিয়া বার বার শান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মিত্রজ মহাশয় অশ্রু নিবারণ করিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণকামিনীকে আর কিছু বলিতে পারিলেন না: যাইবার জন্য তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন। একটা কথা কৃষ্ণকামিনীর মনে এই সময়ে ঘুরিতেছে, বলি বলি করিয়া বলিতে পারিতেছেন না: অবশেষে বলিয়া ফেলিলেন, "মামা, উমাশঙ্কর বাবু কি বেশী দিন ও বাড়ীতে থাক্‌বেন?"

মিত্রজ। না, দুই চারি দিনের মধ্যেই যাবে; কিন্তু কেন বল দেখি এ প্রশ্ন

আমাকে কর্‌লে?

কৃষ্ণ। থাক্‌; তিনি যখন চলে যাবেন তখন আর অধিক কথার দরকার নেই।

ইহাতে মিত্রজ মহাশয় আরও আগ্রহসহকারে ধরিয়া বসিলেন।

কৃষ্ণ। আর কিছু নয়, এই বলতে চাচ্ছিলাম যে, তিনি মানুষ ভাল নন্‌; তাঁকে বাড়ীতে রাখ্‌লে আপনাকে অনেক ক্লেশ পেতে হবে।

মিত্রজ মহাশয় ভিতরের কথা জানিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন; কৃষ্ণকামিনী আপাততঃ ইহার অধিক আর কিছুই বলিতে সম্মত হইলেন না। মাতুল মহাশয় উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণকামিনী আবার বলিলেন,—"আর একটা কথা, বামী চাক্‌রাণীকে বাড়ীতে রাখ্‌বেন না, সে অতি অসৎ।" শ্যামচাঁদ বাবু এই উভয় অনুরোধ শুনিয়া চিন্তিত অন্তরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। আজ তাঁহার চিন্তার অনেক কারণ উপস্থিত। প্রথম, কৃষ্ণকামিনীর পীড়া; মেয়েটা কতদিনে সারিয়া উঠিবে? এমন লক্ষ্মী মেয়ে কি হয়? কথা শুন্‌লে প্রাণ জুড়িয়ে যায়; কিন্তু এসব বিদ্‌কুটে মত কে ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিলে? সত্য সত্য কি ওর বিবাহের পরামর্শ চলছে? তা হলে আমি বলবামাত্র পেড়ে কাপড় ছেড়ে থান পর্‌লে কেন? ও মাতঙ্গিনী হতভাগীর মিথ্যে কথা। অমনি কৃষ্ণকামিনীর শেষ কথাগুলি মনে হইল। কেন কৃষ্ণকামিনী উমাশঙ্করকে বাড়ীতে রাখ্‌তে নিষেধ করলে? সেই যে গৃহিণী মাতঙ্গিনীর বিষয় কিছু কিছু বলেছেন, কৃষ্ণও কি তার কিছু জানে? বামী চাক্‌রাণীর বিষয়েই বা কেন এমন কথা বল্‌লে? যে প্রকারেই হোক, তিনি গৃহের যত নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, কৃষ্ণকামিনীর পীড়ার চিন্তা হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া, উমাশঙ্কর ও মাতঙ্গিনী এই দুইটী নাম একত্রে মনে জাগিয়া উঠিল; এবং অন্তরে প্রতিজ্ঞা হইতে লাগিল, তৎপর দিনই উমাশঙ্করকে চলিয়া যাইতে বলিবেন।

১৬

পরদিন প্রাতে নবীনচন্দ্র মথুরেশের মুখে যখন শুনিলেন যে, মাতুল কৃষ্ণকামিনীকে বলপূর্বক চুড়ি খুলিয়া থান পরাইয়াছেন. ও পূজা করে নাই বলিয়া এমন প্রহার করিয়াছেন যে, তাহার মুখ ফুলিয়া জ্বর হইয়াছে, তখন যেন তাঁহাকে শত বৃশ্চিকে একেবারে দংশন করিল! তাঁহার প্রধূমিত অনুরাগাগ্নি যেন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! যতক্ষণ মথুরেশ ছিলেন, ততক্ষণ কোনও প্রকারে দুর্জয় মানসিক শক্তির দ্বারা আপনার মনোভাব গোপন করিয়া থাকিলেন। কিন্তু মথুরেশ যাইবামাত্র নিজ গৃহের দ্বার বন্ধ করিলেন; এবং প্রথমে শয্যাতে পড়িয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ রহিলেন; তৎপরে উঠিয়া ক্ষোভে, অনুরাগে, বিরাগে অস্থির হইয়া গৃহের মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন. "হায় রে! এই ত আমার জীবনের উপযুক্ত সঙ্গিনী, এই ত সেই আদর্শ নারী, যাহাকে পাইলে জীবন ধন্য হয়। এখন কি করি! এ যাতনা, এ নিগ্রহ, এ অত্যাচার সব ত আমারই জন্য। কি কুক্ষণে সে বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলাম! বেশ ত বুঝিতে পারিতেছি, মাতঙ্গিনী ইহার মূলে আছে। বাপ্‌ রে স্ত্রীলোকের প্রতি-

হিংসা কি ভয়ানক! আমার উপর আক্রোশে এই নিরপরাধার প্রাণ যায়! কি করি, ব্রজরাজকে কি ভাঙ্গিয়া বলিব? কৃষ্ণকামিনীকে কি ভিক্ষা চাহিয়া লইব?" ভাবিতে ভাবিতে এমন যে শান্ত, ধীর ঈশ্বর-ভক্ত ও কর্ম-প্রিয় মানুষ নবীন, তিনিও ক্ষণকালের জন্য ভাবুক হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—"কৃষ্ণকামিনী! কৃষ্ণকামিনী! আমার জন্যই তোমার এই শাস্তি! চল তোমাকে বুকে করিয়া এদেশ হইতে পলাইয়া যাই; এ শত্রুতার হস্ত হইতে তোমাকে উদ্ধার করি।" কিন্তু সে ভাবুকতা অধিকক্ষণ রহিল না; ক্ষণকাল পরেই আবার কর্তব্যের কঠিন ভূমিতে অবতরণ করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—"এখন কর্তব্য কি? আমার কারণে এই নিরপরাধার প্রাণ যায়, তা ত সহ্য হয় না। কিরূপে এ অত্যাচার নিবারণ করি? তবে কি ব্রজরাজ ও মথুরেশের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিব? যে ভাব এতদিন সযত্নে গোপন করিতেছি, তাহা কি তাহাদের নিকট ব্যক্ত করিব? তাই বা কিরূপে করি? কৃষ্ণকামিনীর মনের ভাব ত সম্পূর্ণরূপ জানি না। আর এরূপ প্রস্তাব কার্যে পরিণত করাও সহজ নয়। তাহার মাতুল জানিতে পারিলে ত রক্ষা রাখিবেন না। আর, বিবাহ করা সম্ভব হইলেও আমার বিবাহের মত অবস্থা কৈ? আমার ঘর নাই, দ্বার নাই, মাথা রাখিবার স্থান নাই, আয় সামান্য, আমি কোন্ সাহসে একজনের জীবনের ভার লইব?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্কুলে গেলেন। কিন্তু সেদিন আর পড়াইতে পারিলেন না। হেড মাষ্টারকে বলিয়া ছুটি লইয়া গৃহে আসিয়া সমস্ত দিন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। অবশেষে প্রায় দিবাবসান সময়ে স্থির হইল যে, আর সহরে থাকিবেন না; কোনও একটা কাজ কর্মের যোগাড় করিয়া দূরদেশে গমন করিবেন! কারণ তিনি নিকটে থাকিলেই কৃষ্ণকামিনীর প্রতি অত্যাচার চলিবে।

এই সংকল্পে উপনীত হইয়া মনটা একটু সুস্থির হইল। কিন্তু কৃষ্ণকামিনীর চিন্তা প্রবলভাবেই হৃদয়কে অধিকার করিল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত, মন ব্রজরাজ-দিগের বাড়ীতে যাইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইতে লাগিল; একবার দেখিয়া আসি কৃষ্ণকামিনী কিরূপ আছে; কিন্তু সে মনকে সংযত করিয়া রাখিলেন, সন্ধ্যার পর গড়ের মাঠে অনেকক্ষণ বেড়াইয়া আসিলেন; এবং শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রার ক্রোড়ে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। তৎপরে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, প্রতিদিনই হয় ব্রজরাজ না হয় মথুরেশের সঙ্গে দেখা হয়, তাহাদিগকেও বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হন না; উপরে উপরে সংবাদ পান।

ওদিকে অশনে, বসনে, উপবেশনে কৃষ্ণকামিনী হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সেই মূর্ত্তি মনকে জড়াইতেছে, চিন্তাতে মিশিতেছে, স্বপ্নে আসিতেছে! নবীন তাহাকে হৃদয় হইতে বিদায় করিয়া অন্য কাজ করিতে চান, কিন্তু সে মূর্তি যেন এক দ্বার দিয়া বাহির হইয়া, অপর দ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে; এবং নিজে ভিতরে থাকিয়া সমুদায় জগৎকে বাহিরে ফেলিয়া দিতে চায়। এইরূপ মনের উত্তেজনা দুই তিন দিন গেল। অবশেষে নবীন বন্ধুদিগের নিকটে সহর ছাড়িবার সংকল্প জানাইলেন। সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

সহর পরিত্যাগ করিবার সংকল্প হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া অবধি নবীনচন্দ্র সেই চেষ্টাতেই তৎপর হইলেন। মফঃস্বলে যে সকল জেলা স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কোনও স্কুলে কোনও কর্ম খালি আছে কিনা জানিবার জন্য ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের আপীসে গতায়াত আরম্ভ করিলেন; এবং সহর ছাড়িতে হইলে

কলিকাতার কার্যের কি প্রকার বন্দোবস্ত করিবেন, সে বিষয়ে অনেক চিন্তা করিতে করিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে তিনি কয়েক দিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সুরেশচন্দ্রের বাসাতে যাইতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতৃজায়া তাঁহার প্রতি এতই অনুরক্ত যে, সেখানে প্রত্যহ একবার, অন্ততঃ একদিন অন্তর একবার, না গেলে চলে না। ঐ ভ্রাতৃজায়ার নাম সৌদামিনী। তাঁহার সমবয়স্কা, কি দুই এক বৎসরের ছোট হইবেন। তথাপি নবীন তাঁহাকে বৌদিদি বলিয়া ডাকিয়া থাকেন; আপনার ভগিনীর ন্যায় ভালবাসেন; নিজে তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছেন; এবং অনেকটা উদারভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন।

একদিন স্কুল হইতে আসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া চাদরখানি স্কন্ধে লইয়া বাসা হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে পঞ্চু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। পঞ্চুকে দেখিয়াই নবীন বলিলেন, "এই যে পঞ্চু, বেশ হয়েছে, আমি দাদার বাসায় যাচ্চি, চল দুজনে পথে পথে অনেক কথা হবে।" এই বলিয়া পঞ্চুর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্বক দুই বন্ধুতে প্রিয় নবরত্ন সভার বিষয়ে ও তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কলিকাতার কার্য কিরূপে চলিবে, সে বিষয়ে নানা কথা কহিতে কহিতে সুরেশচন্দ্রের বাসার অভিমুখে চলিলেন। সুরেশচন্দ্রের বাসার দ্বারে উপস্থিত হইয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন, "পঞ্চু, তুমি এখান থেকে ফিরে যাবে কেন, বাহিরের ঘরে একটু অপেক্ষা কর না, আমি বাড়ীর ভিতর হতে বৌদিদির সঙ্গে দেখা করে আস্‌চি, তারপর আবার দুজনে কথা কইতে কইতে যাব।" এই বলিয়া উভয়ে বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইয়া চাকরকে সুরেশচন্দ্রের বসিবার ঘরের দ্বার খুলিয়া দিতে বলিলেন। নবীনচন্দ্র উপরে উঠিয়া পঞ্চুকে সেই ঘরে বসাইয়া, তাঁহাকে পড়িবার জন্য একখানা পুস্তক দিয়া, বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

যেই বাড়ীর মধ্যে পদার্পণ করা, অমনি শিশুদিগের ঘোর কোলাহল,—"কাকা! —কাকা!—কাকা!" সকলেই ছুটিয়া আসিল। একজন আসিয়া জানু আলিঙ্গন করিয়া ধরিল; অপর জন অঙ্গুলি ধরিয়া টানিতে লাগিল; সর্বকনিষ্ঠ দুই বৎসরের বালক, খর্বাকৃতি ও বলবান্ বলিয়া নবীন তাহাকে নেপোলিয়ান বলিয়া ডাকেন। সে আসিয়া তাহার নিজের স্থান অধিকার করিবার ইচ্ছা জানাইল। নেপোলিয়ানকে যেমন তেমন আদর করিলে চলে না, স্কন্ধের উপরে বসাইতেই হইবে। দুই স্কন্ধের উপরে দুইদিকে দুইখানি পা দিয়া বসিবেন, এবং মুখে "হেট্ হেট" শব্দ করিবেন, তবে তাঁর মনোমত আদর হইবে। নবীনচন্দ্র তাহাকে সে স্থান দিতে অপ্রস্তুত নহেন, কিন্তু তৎপূর্বে নেপোলিয়ানকে কিছু করিতে হইবে। নেপোলিয়ানের অনেক প্রকার বিদ্যা আছে। তিনি নানাপ্রকার জানোয়ারের ডাক ডাকিয়া দেখাইতে পারেন, এবং অনেকের গতিবিধিরও অনুকরণ করিতে পারেন, অগ্রে সেগুলির একবার পরীক্ষা হওয়া চাই। নবীনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, —"বাঘ কি রকম ডাকে?"—নেপোলিয়ান—"আলুম"।—নবীনচন্দ্র—"কুকুর কি রকম ডাকে,"—নেপোলিয়ান—"গেও।"—নবীনচন্দ্র, "বিড়াল?"—"মেও"—"গরু?" —"আম্বা"। এইরূপে বেচারা কাঁধে চড়িবার লোভে কতই অশ্রাব্য ও মানবের অযোগ্য ডাক ডাকিল। অবশেষে নবীনচন্দ্র হাসিয়া একটী চুম্বন করিয়া তাহাকে স্কন্ধের উপরে তুলিলেন। নেপোলিয়ান তাহার চিরাভ্যস্ত হেট হেট শব্দ আরম্ভ করিল।

এইরূপে ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নবীন ভ্রাতৃজায়ার অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। ভ্রাতৃজায়াকে যে অন্বেষণ করিতে হইতেছে, ইহাতেই

প্রমাণ যে তিনি আজ মানিনী; কারণ অন্য দিন তিনি ছেলেদের কাকা ধ্বনি শুনিবা-মাত্র যেখানেই থাকেন দৌড়িয়া আসেন এবং দেবরকে অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন; আজ কেন দর্শন নাই? নবীনচন্দ্র বুঝিলেন, কয়দিন না আসার অপরাধের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সুতরাং বৌদিদি, বৌদিদি! করিয়া ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাকে রান্নাঘরে রাঁধুনীর নিকটে পাওয়া গেল। নবীন বলিলেন,—"কি বৌদিদি! কেমন আছ, দিনটে চল্‌ছে কেমন?

সৌদামিনী। কেন, যে দেশে নবীনচন্দ্র বসু নাই, তাদের দেশে কি সূর্য উদয় হয় না? তাদের দিন কি চলে না? দিন বেশ চল্‌ছে।

নবীন। এস তোমার ঘরে এস, একটা কথা আছে।

সৌদামিনী। আমার সঙ্গে কি কথা? এখন তোমার কথার লোক ত ঢের হয়েছে, তাদের সঙ্গে গিয়ে কথা কও।

নবীন। ছি বৌদিদি, রাগ করো না। আমি কি জন্যে এতদিন আস্‌তে পারিনি, তা শুনবে এস।

অনেক সাধ্য-সাধনার পর সৌদামিনী দেবরের সঙ্গে নিজের ঘরে আসিলেন। পুনরায় কথাবার্তা আরম্ভ হইল।

নবীন। আমি সহর ছেড়ে যাচ্ছি, তাই একটা কাজকর্মের যোগাড়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্চে, সেই জন্যে এ কয়দিন আস্‌তে পারিনি।

সৌদামিনী। (নবীনচন্দ্রের সহর ছেড়ে যাওয়ার কথা শুনিয়াই বিস্ময়ে স্তব্ধ) সত্যি!

নবীন। সত্য সত্যই আমি সহরে থাক্‌চি না।

সৌদামিনী। তা হবে বৈকি, যেদিন বাড়ী হ'তে বেরিয়ে অন্য জায়গায় বাসা করেছ, সেই দিন থেকে বুঝেছি, আমাদের প্রতি আর ভালবাসা নাই।

নবীন। না বৌদিদি! আমার প্রতি অবিচার করো না। তুমি এই কথাটা বল্‌লে, আমি তোমাদের ভালবাসি না! যে জন্যে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকি না, তা ত তুমি জান!

এদিকে সৌদামিনী অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। দেবর সহর হইতে চলিয়া যাইবেন, ইহা শুনিয়া তাঁহার প্রাণ ঘোর বিষাদে মগ্ন হইয়াছে। তিনি নিজ পতির নিকটে আদর যত্ন পান না, বরং অনেক সময় অপমান সহ্য করেন। বহুবৎসরাবধি এই দেবরই তাঁহার সুখের সুখী ও দুঃখের দুঃখী। এমন মনের দুঃখ নাই, যাহা তিনি নবীনচন্দ্রকে বলেন না। পতির নিকটে অপমানিত হইয়া তাঁহারই নিকটে ক্রন্দন করেন। যত আদর, যত আবদার, যত মান, যত অভিমান এই প্রিয় দেবরের নিকটে। এখন যে নবীনচন্দ্র জ্যেষ্ঠের উচ্ছৃঙ্খলতা বশতঃ দূরে রহিয়াছেন, এখনও তাঁহার মনের দুঃখ মনে তোলা থাকে; দেবর আসিলে বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করেন। সেই দেবর সহর ছাড়িয়া যাইতেছেন, সুতরাং সৌদামিনীর নেত্রে জল আসিবারই কথা। তিনি চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—"কিজন্য সহর ছেড়ে যাবে?"

নবীন। একটু কারণে যেতে হচ্ছে, তা সব তোমাকে এখন বলবার যো নেই, সময়ান্তরে বল্‌বো। বাধ্য হয়ে যেতে হচ্চে।

সৌদামিনী। আমার মাথা খাও, বল না কি কারণ।

নবীন। ওকি বৌদিদি! ছেলেমানুষী কর কেন? এখন বলবার যো থাক্‌লে তোমায় বলতাম না?

সৌদামিনী। তুমি গেলে আমাকে কে দেখ্‌বে।

নবীন। আর বৌদিদি! দাদার মতি গতি যখন খারাপ হয়েছে, তখন ত তোমার কপালে অনেক দুঃখই আছে। আমি থেকেই বা তোমার দুঃখের কি লাঘব করি? দাদা ত আমার কথা শোনেন না। মধ্যে পড়ে কেবল তোমাদের সঙ্গে আমিও মারা যাই। আমি দূরে গেলেও সর্বদা চিঠি পত্রে খপর নেব।

সৌদামিনী। কোথায় যাবে?

নবীন। তা এখনও ঠিক নেই, মফঃস্বলে কোন জায়গায় একটা মাষ্টারি যুটিয়ে নেব।

সৌদামিনী। কথাটা কি বল্‌বে বল্‌লে যে।

নবীন। হাঁ হাঁ, আসল কথাটা ভুলে যাচ্চি। তোমার ভোনাকে দাদা এমন করে মাটী কর্‌চেন কেন? ১১।১২ বৎসরের ছেলেটা হলো, বুদ্ধি শুদ্ধি বেশ আছে, কোথায় একটা ছাই ভষ্ম স্কুলে দিয়ে রেখেছেন, ছেলেটার ইহকাল পরকাল গেল।

সৌদামিনী। আমি কত বলেছি, ছেলেটা এখনো হিন্দু স্কুলে দেও। তা তিনি বলেন, আমার টাকায় কুলোয় না, পাঁচ টাকা মাহিনা কিরূপে দেব?

নবীন। টাকায় কুলোয় না, তার অর্থ কি? দুশ টাকা বেতন পান; মাহিনা পেলে তুমি ১০।১৫টা টাকা কেড়ে কুড়ে রাখ্‌তে পার না?

সৌদামিনী। হাঁ কেড়ে রাখ্‌বো। আমি ঘর থেকে কিছু দিতে পার্‌লে তাঁর ভাল হয়। কি এক সর্বনেশে ব্যবসা ধরেছেন, ধনে প্রাণে সারা করলে।

নবীন। দাদার মাথায় একটা বাতিক ঢুক্‌লে ত আর রক্ষা নাই; এ ছাই ব্যবসা করে ত লাভ খুব হবে!

সৌদামিনী। লাভের মধ্যে ত দেখি স্বভাব চরিত্র দিন দিন অসৎ হয়ে যাচ্চে

নবীন। আচ্ছা বৌদিদি! আমি একটা কথা ভাবছি, তুমি কি বল!

সৌদামিনী। কি ভাব্‌ছ?

নবীন। আমি ভাব্‌ছি, আমার যদি মফঃস্বলে কোথাও চাকুরী হয়, আমি তোমার ভোনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব, নিজের কাছে রেখে লেখা পড়া শেখাব, তাতে তোমার আপত্তি আছে?

সৌদামিনী। তোমার কাছে থাক্‌বে তাতে আপত্তি কি? আমিও তা হলে বেঁচে যাই, এ কুদৃষ্টান্ত থেকে যত দূরে থাকে ভাল। ঈশ্বর করুন, তোমার গুণ যেন ওরা একটু একটু পায়। কর্তার কি মত হবে?

নবীন। তুমি বলে কয়ে মত করতে পার্‌বে না?

সৌদামিনী। আমার কথা কি শোনেন?

নবীন। তুমি যে কোনও কর্মের নও, তুমি শক্ত মেয়ে হলে কি দাদা এত বেগ্‌ড়াতে পারতেন? আমি যদি স্ত্রীলোক হতাম, তা হলে স্বামীকে মুটোর ভিতর রাখ্‌তাম।

সৌদামিনী। আচ্ছা বাপু, আমার দ্বারা ত হলো না, একদিন ত বিয়ে হবে দেখা যাবে কে কাকে কত মুটোর ভিতর রাখে। তোমাদের দুভাইকে বশে রাখা সামান্য মেয়ের কাজ নয়।

নবীন। সে যা হোক, এই কথা কিন্তু রৈল, ভোনাকে আমার সঙ্গে দিতে হবে। দাদার মত না হবার কারণ দেখ্‌ছি না।

সৌদামিনী। আমারও বোধ হয় রাজি হলে হতে পারেন: তিনি ত ওদের

একবার দেখ্‌বার সময় পান না। কেউ ভার নিলে যেন বেঁচে যান।

ইতিমধ্যে চাকরাণী জলখাবার লইয়া উপস্থিত।

নবীন। ওকি বৌদিদি, আমি এই জল খেয়ে এলাম।

সৌদামিনী। তা হোক, একটু খেতেই হবে, আমার মাথার দিব্বি।

নবীন হাত ছাড়াইতে না পারিয়া নামমাত্র কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। অবশিষ্ট সমুদায় শিশুদের উদরে গেল। বাহিরে পণ্টুর জন্যও কিঞ্চিৎ প্রেরিত হইল।

এইরূপে আহার ও আমোদ প্রমোদ চলিতেছে, এমন সময়ে বাহির বাড়ী হইতে একটা কলরব শ্রুত হইল। ভূপেন তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়াছিল। সে জানালা দিয়া দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, —"কাকাবাবু, বাবা কাকে ধরে এনে মারছেন।" শুনিবামাত্র নবীনচন্দ্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দৌড়িয়া বাহির বাড়ীতে গেলেন। গিয়াই দেখেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর আপীস হইতে ফিরিবার সময় একজন লোককে রাস্তা হইতে ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে পুরিয়াছেন; এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে প্রহার করিতেছেন। তাঁহাদের ভৃত্যটী ঐ ব্যক্তির হস্ত দুখানি পৃষ্ঠের দিকে কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ধরিয়া আছে, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পদাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, চড় চাপড় প্রভৃতি যথেচ্ছ মারিতেছেন ও গালাগালি দিয়া বলিতেছেন, "আর ভদ্রলোকের ছেলেকে অপমান কর্‌বি; বেটা পাজি ছোট লোক!"

তাঁহার জ্যেষ্ঠের বাহির বাড়ীতে নীচের ঘরে দয়ালচাঁদ নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠের আশ্রিত একটী লোক থাকে, সে ব্যক্তি অদূরে দাঁড়াইয়া আছে এবং বার বার বলিতেছে, "বাবু আর মার্‌বেন না, যথেষ্ট হয়েছে, ওর খুব শিক্ষা হয়েছে, ছেড়ে দিন," কিন্তু সে ছাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে না। নবীনচন্দ্র একেবারে গিয়া উভয়ের মধ্যে পড়িলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠের হাত ধরিয়া বাধা দিলেন; বলিলেন, "দাদা কর কি, ব্যাপারটা কি, ও করেছে কি?" তিনি যদি প্রতিবন্ধক হইলেন, ত পণ্টু উপর হইতে দৌড়িয়া আসিলেন। তিনি এতক্ষণ এই ব্যাপার দেখিতেছিলেন, অপরিচিত ব্যক্তি, কিছু বলিতে পারেন না, হঠাৎ বাধা দিতে পারেন না, কি করিবেন ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।

নবীনচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠকে ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন; এবং পণ্টু সেই ব্যক্তির হস্তের বন্ধন উন্মোচন করিয়া দ্বার খুলিয়া তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন। পরে কথাটা এই জানা গেল যে, সে একজন সামান্য দোকানদার, সুরেশচন্দ্র যে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ ব্যক্তির সহিত কি কারবার হয়, সেই কারবারে সে তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে, এবং কয়েক দিন পূর্বে সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সকলের সমক্ষে অপমান করিয়াছে। আজ হঠাৎ সে সুরেশ-চন্দ্রের বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে তিনি আপীস হইতে বাটীতে আসিতেছেন। বাড়ীর দ্বারে তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র ভৃত্যসহ তাহার উপর পড়িয়া বল পূর্বক তাহাকে বাড়ীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া, উত্তম মধ্যম দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠকে শান্ত করিতে নবীনচন্দ্রের অনেকক্ষণ গেল। তৎপরে পণ্টুকে সঙ্গে করিয়া তিনি আবার কথাবার্তা কহিতে কহিতে স্বীয় বাসার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কয়েকদিন পরেই শুনিতে পাওয়া গেল, সেই দোকানদার পুলিশ আদালতে সুরেশচন্দ্রের নামে নালিশ উপস্থিত করিয়াছে। সে যে কোথা হইতে নবীনচন্দ্রের

ও পঞ্চুর নাম সংগ্রহ করিল, তাহা বলা যায় না; কিন্তু যথাসময়ে নবীনচন্দ্র ও পঞ্চু উভয়ে সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। সুরেশচন্দ্র ও তাঁহার ভৃত্য উভয়ের প্রতি অভিযোগ; আরও দুইজনকেও সাক্ষী মানিয়াছে; প্রথম, সুরেশচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখের মুদীর দোকানের মুদী ও তাঁহার ভবনস্থিত আশ্রিত দয়ালচাঁদ।

সাক্ষীর সপিনা পাইয়াই নবীনচন্দ্র মকদ্দমা মিটাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অনেকবার সেই দোকানদারের দোকানে হাঁটাহাঁটি করিলেন। তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, সে যে প্রকার প্রবঞ্চনা করিয়াছিল ও তৎপরে ভদ্রলোকের সমক্ষে সুরেশচন্দ্রকে যে প্রকার অপমান করিয়াছিল, তাহাতে তাহার প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব সে নিজ কার্যের উপযুক্ত শাস্তিই পাইয়াছে। এ নালিশে অতি সামান্য দণ্ড হইবে, এবং সে যদি নিবৃত্ত না হয়, সুরেশচন্দ্র তাহার নামে প্রতারণার নালিশ আনিতে পারেন। এইরূপে সে ব্যক্তিকে ভয় ও মৈত্রী উভয়ের দ্বারা নালিশ তুলিয়া লইবার জন্য অনেক প্ররোচনা দিলেন; সে কিছুতেই সম্মত হইল না। অবশেষে সুরেশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, তাহাই দেখিলেন। সুরেশচন্দ্র মিটাইবার পক্ষ নন। অবশেষে মকদ্দমাস্থলে কিরূপ করা হইবে, সেই কথা আরম্ভ হইল।

নবীন। আচ্ছা, মকদ্দমা না মেটাও, আদালতে উপস্থিত হ'য়ে সমুদায় কথা স্বীকার কর।

সুরেশ। হাঁ, তোর বুদ্ধিতে হাড়িকাঠে গলাটী বাড়িয়ে দি, দিয়ে সাজা পাই।

নবীন। স্বীকার কর্‌তে ভয় কি? বড় জোর ৫।৭ টাকা জরিমানা হবে; ও ব্যক্তি প্রতারণা করেছে, অপমান করেছে, তা ত আদালত বুঝ্‌বে।

সুরেশ। হাঁ অপরাধ স্বীকার করে, জরিমানা দিয়ে, একটা দাগ নিয়ে বাহির হই।

নবীন। যে দিক দিয়েই যাওয়া যাক্‌ কিছু সাজা ত পেতেই হবে, আমাকে আর পঞ্চুকে ত সত্য কথা বল্‌তেই হবে।

সুরেশ। তা বল্‌বি বৈকি? সহোদর ভাইকে জেলে না পুরলে রিফর্মেশনটা ভাল করে হবে কেন?

নবীন। দাদা, কঠিন কঠিন কথাগুলো বলো না। আমার ত আর চারা নেই।

সুরেশ। চারা থাক্‌বেনা কেন? তোরা বল্‌বি, এসেছিল বটে, বকাবকিও হয়েছিল, কিন্তু মারামারি হয় নাই।

নবীন। সেটা ত সত্যি হবে না।

সুরেশ। আ মরি কি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির গো! মিথ্যে যেন আর কোনও রকমে বলেন না। নিক্তির ওজনের সত্যি কি এ জগতে চলে?

নবীন। না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, আমার দ্বারা সেটা হবে না; আমি হলপানা মিথ্যে বল্‌তে পারবো না।

সুরেশ। আচ্ছা তবে তোরা দুজনে সাক্ষী দিতে যাস্‌নি; ব্যায়রাম হয়েছে বলে একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাঠাস।

নবীন। সেটাও ত মিথ্যে হবে।

সুরেশ। তবে মরগে যা, তোদের যা ইচ্ছে করিস; আমার যে সাজা হয় হবে।

নবীন। তোমাকে বার বার বল্‌ছি স্বীকার করলে অতি সামান্য সাজাই হবে। আমি একজন ভাল উকীলকে জিজ্ঞাসা করেছি। তুমি ভয় পাচ্চো কেন? সামান্য

একটা ভয়ের জন্যে ধর্মটা খোয়াবে কেন?

সুরেশ। (অতিশয় বিরক্ত ভাবে) যা যা, আমার সম্মুখ হতে উঠে যা! ধর্মের ছালা তুই বাঁধিস্, আমার অত ধর্মের দরকার নেই।

নবীনচন্দ্র অতিশয় দুঃখিত অন্তরে চলিয়া গেলেন। মকদ্দমার দিন যথাসময়ে পুলিশ আদালতে যাইতে হইল। গিয়া তিনি আবার মিটাইবার জন্য উভয় পক্ষের উকীলদিগকে ধরিলেন। যখন অকৃতকার্য হইলেন, তখন যাহাতে জ্যেষ্ঠের সাজাটা লঘু হয়, তাঁহার উকীলদিগকে এমন পরামর্শ দিলেন।

যথাসময়ে জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হইল। দয়ালচাঁদ ও মুদী দুই জনকেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ গড়িয়াছিলেন, সুতরাং তাহারা মারপিটের কথা উড়াইয়া দিল। মুদী বলিল, "আমি রাস্তা হতে টানিয়া লইতে দেখি নাই; আমার দোকান হইতে সুরেশ বাবুর উঠান দেখিতে পাওয়া যায়; আমি দোকানে বসিয়া দেখেছি যে বাদী তাঁহার বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া কি বকাবকি করছে, এই মাত্র।" দয়াল বলিয়াছে, "হাঁ আমি সেখানে ছিলাম। বাদী উক্ত দিবস বৈকালে সে বাড়ীতে আসিয়াছিল বটে এবং অনেক বকাবকি করিয়াছিল বটে। কৈ আমি কাহাকেও দ্বার বন্ধ করিতে দেখি নাই, এবং প্রহার করিতেও দেখি নাই। তবে সুরেশ বাবু মারবো ধরবো এমন কথা ব্যবহার করেছিলেন বটে।"

এই দুইটী সাক্ষী মাত্র সম্বল হইলে হয়ত মকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইত, সুরেশ-চন্দ্রের কিছুই শাস্তি হইত না। নবীনচন্দ্র ও পঞ্চু যে সাক্ষী দিবার জন্য উপস্থিত হইবেন, ও যদি উপস্থিত হন, সত্য সাক্ষী যে দিবেন, ইহা সুরেশচন্দ্র সম্ভব মনে করিতে পারেন নাই। কিন্তু উভয়ের সাক্ষী যখন লওয়া হইল, তখন প্রকৃত কথা সমুদায় প্রকাশ হইয়া পড়িল। নবীনচন্দ্রের কথাতে যাহা হয় নাই, তাহা আবার পঞ্চুর কথাতে হইল। সে ব্যক্তিকে যে সর্বাগ্রে বাড়ীতে পুরিয়াই কানে ধরিয়া ঘোড় দৌড় করান হইয়াছিল, তাহা নবীনচন্দ্র দেখেন নাই; কিন্তু পঞ্চু দেখিয়া-ছিলেন; তাহা তাঁহার উক্তির দ্বারা প্রমাণ হইয়া গেল।

প্রতিবাদীর সহোদর ভ্রাতা তাহার বিপক্ষে সাক্ষী দিতেছে, ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে বিশ্বাস হইতে বাকি থাকিল না। যদিও সুরেশচন্দ্রের উকীল নবীনচন্দ্রকে স্বধর্মত্যাগী, গৃহতাড়িত ও ভ্রাতার বিদ্বেষ্টা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ও তাঁহার সাক্ষ্যের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটী করিলেন না, তথাপি ম্যাজিষ্ট্রেটের মনের বিশ্বাস কোনও মতে টলিল না। পরিশেষে সুরেশচন্দ্রের ২০৲ বিশ টাকা জরিমানা হইল।

বিশ টাকা যে কিছু অধিক, তাহা নহে, কিন্তু অপমানটা বড়ই লাগিল। তাঁহার আপীসের কর্তা সাহেবেরা যখন এই কথা শুনিলেন, তখন সুরেশচন্দ্রের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিলেন। তিনি কৈফিয়ৎ দিয়া তাঁহাদিগকে একপ্রকার সন্তুষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু মনের মধ্যে একটা ক্লেশ থাকিয়া গেল; এবং মনে মনে নবীনের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রহিলেন।

একদিন আপীস হইতে আসিয়া দেখেন, নবীচন্দ্র তাঁহার গৃহিণীর সহিত কথা কহিতেছেন। অমনি কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "নেমকহারাম, বদ্মাস, বকধার্মিক, দূর হ; আমার বাড়ী হতে বেরো; আমার স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে তোর সম্পর্ক কি রে?"

নবীনচন্দ্র দেখিলেন, থাকিলে বা উত্তর করিলে কোপ বাড়িবে। অমনি

আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন।

তৎপরে যতদিন তিনি সহরে ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃজায়া তাঁহাকে লইবার জন্য বার বার লোক পাঠাইতেন। চাকর ও দাসী আসিয়া বলিত, "মা ঠাক্রুণ কেবল কাঁদ্ছেন, আপনি না গেলেই চল্‌বে না।" তিনি কি করেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠের কোপের ভয়ে যাইতে পারেন না; অথচ তাঁহারও প্রাণ ভ্রাতৃজায়াকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ব্যগ্র। অবশেষে সৌদামিনীকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন :—

"বৌদিদি! শুনিলাম দাদা আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়াতে তুমি প্রাণে বড় ক্লেশ পাইয়াছ, ও সর্বদা কাঁদিতেছ। তোমার এত ক্লেশ কেন? দাদাতে কি ছোট ভাইকে গালি দেয় না? আমার গলাটিপে ত কতবার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। দাদার রাগটা একটু পড়ুক, আবার দেখা সাক্ষাৎ হবে। এখন রাগের উপরে গেলে তোমারই যাতনা বাড়িবে। আমি বিদেশ যাত্রার পূর্বে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করিবার চেষ্টা করিব। আর কিছু নয়, ভোনাকে যে সঙ্গে লইয়া যাইতাম, সেইটা হলো না। যাহা হউক, আমার একটী অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। আমি গোপনে তোমার কাছে মাসে পনর টাকা করিয়া পাঠাইব, তাহা হইতে তুমি ভোনার হিন্দুস্কুলের মাহিনা ৫৲ পাঁচ টাকা দিবে; এবং অবশিষ্ট দশ টাকা তোমার নিজের জন্য, যাহা ইচ্ছা খরচ করিবে। বৌদিদি! এ দশ টাকা অতি সামান্য, উল্লেখের যোগ্যই নয়। তোমার স্নেহের ঋণ শুধিবার নয়। যদি দয়া করিয়া এই কয়টী টাকা নেও, আমার চাকুরী মিষ্ট হইবে। আমাকে পদধূলি দিও ও ভাই বলিয়া আশীর্বাদ করিও।

তোমাদেরই
নবীন।"

এই পত্রের উত্তরে সৌদামিনী লিখিলেন, যে তিনি মাসে পনর টাকা করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। নবীনচন্দ্রের বিদেশযাত্রার পূর্বে এই বন্দোবস্ত হইয়া রহিল।

১৭

উক্ত ১৮৫৬ সালের ভাদ্র মাসে একদিন বেলা প্রায় ১২টা বাজিয়া গিয়াছে; শোভাবাজারের রাজবাড়ীর রাস্তাতে লোকসমাগম অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে; দুই একজন দোকানদার ও বাবুর বাড়ীর দুই একটী চাকরাণী সেই বেলাতে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; দুই একজন ফেরিওয়ালাও মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া যাইতেছে; এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়া এখনও টিপ টিপ করিয়া জল পড়িতেছে, এবং রাস্তার দুই ধারের নর্দমা দিয়া জল বহিতেছে; কোনও কোনও দোকানে দোকানদার আহার করিতে যাইবার জন্য দোকানের ঝাঁপ তাড়া বন্ধ করিতেছে। এমন সময়ে, এত বেলাতে, ঐ রাস্তার পার্শ্বস্থ একটী ভবনে একজন বৃদ্ধ একটী ঘরে মাদুর পাতিয়া বসিয়া কি কাগজপত্র পরীক্ষা করিতেছেন। বাড়ীটী সেকেলের ধরণের; বোধ হয়, ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়া

থাকিবে; এবং পনর কি বিশ বৎসরের মধ্যে যে তাহাতে হাত পড়ে নাই, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাড়ীর বাহিরে রাজপথ হইতে দেখিলে বোধ হয়, সে বাটী প্রথমে যিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি রুচিশালী লোক ছিলেন; কারণ বাহিরের বারাণ্ডাটী বেশ সুন্দর করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল। কিন্তু মেরামতের অভাবে সকলই কদাকার মূর্তি ধারণ করিয়াছে। নীচের তালাতে লোনা ধরিয়া প্রায় ৪।৫ হাত পর্যন্ত বালি চূন খসিয়া পড়িয়াছে; লোনাধরা ইষ্টক সকল বাহির হইয়া রহিয়াছে; দ্বারে প্রবেশ করিতেই দুই ধারের খিলানের অবস্থা এরূপ যে, দেখিলে বাস্তবিকই মনে শঙ্কার উদয় হয়। বাহির বাড়ীতে একটী পূজার দালান আছে, তাহারও থামগুলিতে লোনা ধরিয়া ইষ্টক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তবে প্রতি বৎসর বাসন্তী পূজার সময়ে এক একবার করিয়া সেই ইষ্টকেরই উপরে চূণ বুলাইয়া দেওয়া হয় বলিয়া, তাহাদের আকৃতি তত চক্ষের পীড়াদায়ক নহে। বাহির বাড়ীর কোন ঘরের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। প্রায় সকল ঘরেই স্থানে স্থানে বালিচূণ খসিয়া গিয়া কদাকার দেখাইতেছে ও কোনও কোনও ঘরের খিলান ফাটিয়া বৈশাখের ফুটীর ন্যায় হইয়াছে; কেবল গোঁজা দিয়া কোনও প্রকারে রক্ষা করা হইতেছে। সর্বাপেক্ষা বড় ও বৈঠকখানা ঘর যেটী, সেটীর অবস্থা একটু ভাল, এত ফাটা চটা নয়। তাহাতে কতকগুলি ছবিও আছে; বোধ হয় পনর কি বিশ বৎসর তাহাতে কেহ হাত দেয় নাই; কোন ছবিটীর কাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোনটীর নাক মুখ পোকাতে খাইয়াছে; দেখিলেই বোধ হয় এই বাড়ীতে এক সময়ে কেহ একজন ছিলেন, যাঁহার একটু ঘর সাজাইবার সখ ছিল, তাঁহার পরলোক হইলে যাহারা আছে, তাহাদের আর সে সখ নাই। বাড়ীর অবস্থা দেখিলে অনুমান হয়, ইহারা এক সময়ে সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল, কালক্রমে দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হইয়াছে; কিম্বা গৃহস্বামীর মৃত্যু হওয়াতে বাড়ীটী বেওয়া বিধবাদিগের হস্তে পড়িয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। গৃহস্বামী এখনও বর্তমান; তাঁহার অবস্থাও মন্দ নহে; কিন্তু এ সকল দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। বাড়ীর লোকে বা সমাগত বন্ধুবান্ধবগণ মধ্যে মধ্যে বাড়ীটা মেরামত করিবার আবশ্যকতা দেখাইয়া দিলে তিনি এক একবার সজাগ হইয়া উঠেন; রাজমিস্ত্রীদিগকে ডাকাইয়া আনেন, এবং সম্ভাবিত খরচের একটা আনুমানিক তালিকা প্রস্তুত করিতে বলেন, সেই তালিকা দেখিয়াই আবার নিরুৎসাহ হইয়া যান, বলেন, "ও এত খরচ! থাক্, হাতে টাকা আসিলে কিছুদিন পরে করা যাবে।" প্রায় দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল, টাকাও হাতে আসে না, "কিছুদিন পর"ও আর আসে না।

ঐ যে বৃদ্ধটী মাদুর পাতিয়া বসিয়া মনোযোগ সহকারে কাগজপত্র দেখিতেছেন, উনি এই বাড়ীর কর্তা, উঁহার নাম শ্রীযুক্ত হলধর বসু। উঁহার স্বর্গীয় পিতা ৺রামনারায়ণ বসু কলিকাতাতে আসিয়া বাস করেন: তিনিই এই বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। হলধর বসুর বয়ঃক্রম এখন ৭১।৭২ এর কম হইবে না। তিনি পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাবুদের বাড়ীতে মোক্তারী কর্ম করেন। ঐ কাজ বহুদিন করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে কাজ কর্ম বড় করিতে হয় না, বসিয়া মাসহারা পাইয়া থাকেন; এবং বড় বড় মকদ্দমা পড়িলে, এক আধ বার আদালতে যাইতে হয়, ও উকীলদিগকে পরামর্শাদি দিতে হয়। তবে বাবুদের বৈঠকখানাতে মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া আসিতে হয়। এক্ষণে তাঁহার প্রধান কাজ কোম্পানির কাগজের সুদের হিসাব রাখা ও তেজারতে যে টাকা খাটিতেছে, তাহার সুদ প্রভৃতি আদায়

করা। এটা একটা প্রতিদিনের কাজ; সর্বদাই তাঁহাকে এজন্য ব্যস্ত থাকিতে হয় এবং কখনও কখনও ছোট আদালতে নালিশ করিবার জন্য যাইতে হয়। বৃদ্ধটী আজ যেরূপ কাগজপত্র দেখিতেছেন, ঐরূপ কাগজপত্র প্রায় প্রত্যহই দেখিয় থাকেন। ঐ চিন্তা ভিন্ন তাঁহার অন্য চিন্তা যে আছে, এরূপ বোধ হয় না। দেবত ব্রাহ্মণে কোনও দিন বিশেষ ভক্তি জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। বাল্যকালে পারসী আরবী ও কাজ চালাইবার মত ইংরাজী শিখিয়াছিলেন; সেইমাত্র সম্বল; তাহাও মরিচা পড়িয়া গিয়াছে।

পাড়াতে মধ্যে মধ্যে কথকতা, পুরাণ পাঠ, রামায়ণ গান প্রভৃতি হইয়া থাকে কিন্তু বৃদ্ধটী সেদিকে বড় একটা যাইতে চান না। তাহার দুইটী কারণ আছে প্রথম এ সকল বিষয়ে তিনি তৃপ্তি পান না, পেলেও এ সকলে তাঁহার মন বসে না; 'মারীচ বধ' শুনিতে শুনিতে কোম্পানির কাগজের সুদ মনে পড়ে, বা ছোট আদালতের কোনও মকদ্দমার চিন্তা উদয় হয়। দ্বিতীয়তঃ—তিনি গিয়া বসিলেই লোকে আশা করে যে, তাঁহার যখন দুই পয়সা আছে, তখন তিনি নিশ্চয় কিছু দিবেন। লোকের মনের এই "নিশ্চয় কিছু দিবেনটা" তাঁহার অসহ্য বোধ হয় এই কারণে এ সকল স্থানে যাইবার ভার তিনি গৃহিণীর উপরে দিয়াছেন। বাড়ীর পরিবারদিগের মধ্যে গৃহিণী, একটী বিধবা শালী ও একটী বিধবা কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ, এইমাত্র। স্থান দিলে আসিবার লোক অনেক আছে, কিন্তু খাইতে দিবার ভয়ে হলধর তাহাদিগকে আনিতে চান না। বৃদ্ধের আর কোনও সখ দেখা যায় না, কেবল সখের মধ্যে কতকগুলি বিড়াল পুষিয়াছেন।

বৃদ্ধের মধ্যম সহোদর গোপীমোহন বসু নিমক মহলে চাকুরী করিতেন তিনি অধিকাংশ সময় হিজলী কাঁথির দিকে থাকিতেন এবং যে তিন শত টাক বেতন পাইতেন, তিনি প্রাচীন রীতি অনুসারে আবশ্যক ব্যয় বাদে সমুদায় অর্থ জ্যেষ্ঠের নিকট পাঠাইতেন। তিনি একটু উদার-রুচিসম্পন্ন ও ধর্মভীরু লোক ছিলেন; এবং প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে একবার বাড়ী মেরামত করিয়াছিলেন তৎপরে প্রায় ২০।২২ বৎসর গত হইল, তাঁহার পরলোক হইয়াছে। ইহার মধ্যে এ বাড়ীতে হাত পড়ে নাই। গোপীমোহন মৃত্যুর সময়ে দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া যান। কন্যা দুইটী এখন পতিগৃহে, তাহার একটী বিধবা। পুত্র দুইটীর মধ্যে একজন সুরেশচন্দ্র বসু ও অপর জন নবীনচন্দ্র বসু। কি কারণে ইঁহাদিগকে এ বাড়ী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহা সকলে একপ্রকার অবগত আছেন; সুতরাং তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সুরেশচন্দ্রের বয়ঃক্রম এখন ৩৩।৩৪ হইবে, তাঁহার চারি পাঁচটী পুত্রকন্যা।

যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন বাড়ীর ভিতরের একটী ঘরে মাদুর পাতিয়া বসিয়া বৃদ্ধটী একমনে কি কাগজপত্র দেখিতেছেন। এমন সময়ে একটী চাকরাণী আসিয়া ডাকিল,—"কর্তা, গা তুলে আসুন, ভাত বাড়া হয়েছে।" বৃদ্ধ অন্যমনস্ক-ভাবে একবার "হুঁ" করিয়া উত্তর দিলেন, কিন্তু উঠিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে এক গৌরাঙ্গী স্থূলাকৃতি প্রবীণা আসিয়া বলিলেন,—"কি, খেতে দেতে হবে? না ভাতগুলো শুকিয়ে যাবে?" ঐ গৌরাঙ্গীর নাম কৃপাময়ী, উনি ইঁহার গৃহিণী ও নবীনের রাঙ্গা মা।

বৃদ্ধ কাগজপত্র বাক্সে তুলিয়া উঠিলেন। তাঁহার আহারের স্থানে যাইবার পূর্বেই দুইটী বিড়াল তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। তিনি উঠিবামাত্র তাহারা

লাঙ্গুল ঊর্ধ্ব করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে আহার স্থানে চলিল। বৃদ্ধ খড়ম জোড়াটী পায়ে দিয়া খট্ খট্ শব্দে অগ্রসর হইলেন; বৃদ্ধটী কিছু অধিক শুষ্কাকৃতি। কৃপণ হইলে কি মানুষ কিছু শুষ্কাকৃতি হইয়া থাকে? বলিতে পারি না;—মনে সাধারণতঃ এই একটা সংস্কার আছে যে, কৃপণ ও হিংসুকে লোক বেশ মোটাসোটা ও প্রসন্নাকৃতি হয় না। সে যাহা হোক, এ বৃদ্ধটী বড় শুষ্কাকৃতি, নীরস ও একহারা; বর্ণটা যৌবনকালে কিরূপ ছিল বলা যায় না, বোধ হয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণই ছিল; কিন্তু তাহা শুষ্কাকৃতিতে ভাল করিয়া ধরিতে পারা যাইতেছে না; কপালে অনেক চিন্তার রেখা; চক্ষু দুইটী বিষয় চিন্তা করিয়া করিয়া দগ্ধ বরাটক-কল্প; পরিধানে একখানি আটহাতি ধুতি। লোকের মুখে শুনি, মধ্য বয়সে তিনি নাকি বাড়ীতে থাকিবার সময় এত ছোট কাপড় পরিতেন যে কাছা দিতে কুলাইত না। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,—"ওহে বাপু, ঘরের ভিতরে আছি, কে দেখ্‌তে আস্‌চে? দুখানা কাছাতে একখানা গামছা হয় তা জান?" এই কারণে সহরের কোন সুরসিক ব্যক্তি এক নূতন নামতা প্রস্তুত করেন, যথা—"কাছাকে কাছা, কাছা দ্বিগুণে গামছা, তিন কাছায় পৌনে ধুতি, চার কাছায় ধুতি!" যাহা হোক বসুজ মহাশয়ের সেদিন এখন নাই, অবস্থার উন্নতি হওয়াতে এখন কাছা দিয়া থাকেন।

বৃদ্ধ আসিয়া আহার করিতে বসিলেন, অমনি চারি পাঁচটী বিড়াল মেও মেও করিয়া ঘর মাথায় করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ অগ্রে তাহাদিগকে অন্ন দিলেন, তৎপরে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহিণী দ্বারের কপাটে পৃষ্ঠ দিয়া দণ্ডায়মানা। কিয়ৎক্ষণ আহারের পর বৃদ্ধ বলিলেন,—"ওগো বয়েস ত অনেক হলো, কোন দিন কি হয় তার ঠিক নেই, একটা কথা ভাব্‌ছি। তুমি কি বল?"

গৃহিণী। কি কথা?

বসুজ। একটী পোষ্যপুত্র নিলে হয় না?

গৃহিণী। অভাগ্যি পোড়া কপাল! সোনার চাঁদ ছেলে ঘরেই রয়েছে, তা থাক্‌তে পুষ্যিপুত্র নিতে যাব কেন? সোনা বাইরে আঁচলে গিরে! যাদের ধন, যারা খাবে, নেবে, দেবে, তারা রৈল বাইরে, আর একটা কলমের চারা এনে বসাতে হবে। না, না, ও সব হবে না!

বসুজ। (কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত) ঐ দোষেই ত তোমার সঙ্গে আমার কোনও পরামর্শ হয় না।

গৃহিণী। আর মাথা মুণ্ডু পরামর্শ কি হবে?

বসুজ। আমি ত তোমার ভালর জন্যেই বল্‌ছি, আমার ত সময় হয়ে এসেছে, তোমাকে এখনও কিছুদিন থাক্‌তে হবে, আমি চক্ষু মুদ্‌লে তোমায় দেখ্‌বে কে?

গৃহিণী। তুমি আপনার চরকায় তেল দেও; আমার ভাবনা আর তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। কেন আমার ভেয়েরা কি আমায় একমুটো খেতে দেবে না? আর তারাই যদি না দেয়, বেঁচে থাক্ আমার সোনার চাঁদেরা; তারা কি আমায় ফেল্‌তে পার্‌বে?

বসুজ। (বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া) হাঁ সোনার চাঁদেরা তোমায় দেখ্‌বে? একটা ত মাতাল, গোঁয়ার, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন, আর একটা ত খ্রীষ্টান, তারা তোমায় দেখ্‌বে বৈ কি? গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল! উনি সোনার চাঁদেদের আশা

ধরে বসে আছেন!

গৃহিণী। তারা ত আর তোমার মত অধম্মে নয়, তারা দেখ্‌বে না কেন?

বসুজ। (অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে) মিছে বকোনা বল্‌ছি, কথায় কথায় শক্ত কথাগুলো বলো, লজ্জা করে না।

গৃহিণী। লজ্জা কি, ঠিক্ কথাই ত; তুমি অধম্মে নও? সেদিন বড় ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিলে, বল্‌লে তোর বাপ কিছু রেখে যায় নি; আমি কি ঘরের কথা জানিনি, তার বাপ কিছু রেখে যায় নি? তার পর ছোট ছেলেটাকে গলা টিপে বার করে দিলে, যেন সে এ বাড়ীর কেউ নয়। কেন তারা কি বানের জলে ভেসে এসেছে? আজ যদি তারা তোমার নামে নালিশ করে, তাহলে কোথায় থাক? এ বাড়ীর ভাগ দিতে হয় না?

বসুজ। আমি কি বল্‌ছি, বাড়ীর ভাগ দেব না?

গৃহিণী। পেয়াদায় দেওয়াবে, দায়ে পড়ে দেবে?

বসুজ। (অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে) মেয়ে মানুষের বুদ্ধি আর কত হবে?

গৃহিণী। জন্ম জন্ম যেন মেয়ে মানুষ থাকি, আর এই বুদ্ধিই থাকে। তোমার ও বুদ্ধির গলায় দাড়ি! যে বুদ্ধিতে পরকে প্রবঞ্চনা করে, তার মুখে আগুন।

বসুজ। (অতি ক্রুদ্ধস্বরে) তবে উইল করে টাকাগুলো আমি পথের লোককে দিয়ে যাব, তোমাকে পথে বসাব।

গৃহিণী। হুঃ বড় ভয়! পথের লোককে দেবে কেন, টাকাগুলো ভাঙ্গিয়ে গিনির মালা কর, তাই গলায় দিয়ে তোমাকে চিতেয় তুলে দেওয়া যাবে। নিজে পর আর ওই বেরালগুলোকে এক এক ছড়া পরিয়ে দেও, তা হলেই তোমার পরকালের কাজ হবে।

বসুজ। তুমি যে বড় বাড়ালে দেখ্‌ছি।

গৃহিণী। বাড়ান আবার কি? উচিত কথা বল্‌লেই গায়ে তপ্ত জলের ছড়া দেয়। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেক্‌লো, এখনও পরপ্রবঞ্চনার বুদ্ধি গেল না! না হয় দুদণ্ড বসে ঠাকুর দেবতার নাম কর, পাড়াতে কথা হয়, পাঠ হয়, না হয় দুদিন শুন্‌তে যাও, নিজেদের সন্তান ভাগ্যি নেই, ভাইপো, ভাইঝিদের এনে না হয় দুদিন আমোদ আহ্লাদ কর, তার কিছুই নেই, কেবল বাক্স আর কাগজ, কাগজ আর বাক্স। আর দুদিন পরেই ত সব ফেলে যেতে হবে।

কি জানি কেন গৃহিণীর এই শেষ উক্তির পরেই বসুজ মহাশয় আর কথা কহিলেন না; অতি গম্ভীরভাবে আহার করিতে লাগিলেন। গৃহিণী স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

বসুজ মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণীর এই কলহের কিছুদিন পরে, আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে, এক দিবস "হিতৈষী" পত্রিকার আপীসে নবরত্ন সভার অধিবেশন হইতেছে। আজ পূর্ণসংখ্যক সভ্য উপস্থিত। নবীন সহর পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করার পর সভ্যদিগের মধ্যে তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইতেছে। যে নবীন বলিয়াছিল তাহার জীবনের অন্য উদ্দেশ্য নাই, দুই বেলা দুইটী আহার করিবার মত সংস্থান হইলেই সে সহরে পড়িয়া থাকিবে, ও প্রিয় নবরত্ন সভার উন্নতি সাধনে সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিবে, যে নবীন বিদ্যা, বুদ্ধি, সুপারিস প্রভৃতি সত্ত্বেও সামান্য একটা ৫০৲ টাকার শিক্ষকতা লইয়া সহরে পড়িয়া

রহিয়াছিল, বড় বড় চাকুরীর সুবিধা পাইয়াও এক দিনের নিমিত্ত সহর ছাড়িবার ইচ্ছা করে নাই, সে নবীন কেন আজ সহর ছাড়িতে চায়? তবে কি আমাদের প্রতি নিরাশ হইয়া গেল? আমাদিগের দ্বারা কিছু হইবে না কি মনে করিল? অথবা উহার মনে আরো কোন ক্লেশের কারণ উপস্থিত হইয়াছে? এইরূপ নানা-প্রকার আলোচনার পর সকলে স্থির করিয়াছেন যে অদ্যকার সভাতে সকলে উপস্থিত হইয়া নবীনকে ভাঙ্গিয়া বলিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। এতদ্ভিন্ন নবীনচন্দ্রও সহর পরিত্যাগের পূর্বে সভার কার্যের বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া, সকলকে বিশেষ ভাবে ডাকিয়াছেন; সেইজন্য আজ সকলেই সমবেত। যথাসময়ে সভার কার্য আরম্ভ হইল। প্রথমে "হিতৈষী" পত্রিকার কথা উপস্থিত হইল। নবীনচন্দ্র বলিলেন, সুরেনকে উহার সম্পাদক করা যাউক; এবং ব্রজরাজ সহকারী সম্পাদকই থাকুন।

সুরেন। কে সম্পাদক হবে সে কথা এখন থাক্। নবীন, আমরা ভেবে কিছু ঠিক কর্‌তেই পার্‌ছি না, তুমি সহর ছেড়ে যাচ্চো কেন?

নবীন। তোমরা কি মনে কর বিশেষ কারণ না থাক্‌লে আমি সহর ছেড়ে যাচ্চি?

পঞ্চু। সে কারণটা কি? আমাদের উপর কি নিরাশ হয়ে গিয়েছ?

নবীন। না, না, সেকি কথা! আমি যে কারণে সহর ছাড়্‌ছি, তা সব তোমাদের কাছে বল্‌বার যো নাই, নতুবা বল্‌তাম; কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের সভার কোনও সম্পর্ক নাই। তোমাদের প্রতি নিরাশ হওয়া দূরে থাক্ আমাদের সভার কার্য্যকারিতা বিষয়ে আমার বিশ্বাস কখনও এমন প্রবল হয় নাই। আমি কিছু দিনের জন্য দূরে থাক্‌লেও তোমাদের সঙ্গেই আছি। আশা করি, অল্প দিন পরে আবার আমাকে কার্য্যক্ষেত্রে দেখ্‌তে পাবে।

ব্রজরাজ। আর কিছু নয়, আমার ভয় হয় তোমার অনুপস্থিতিকালে পাছে সভাটা ম্লান হয়ে পড়ে।

নবীন। সে কি, তোমরা কিছুদিন কাজটা চালাতে পার্‌বে না? আমার ত আশা হয়, তাতে ভালই হবে। সকলের উৎসাহ আরও বাড়বে।

সুরেন। এতদিন পরে সভাটার কাজ আরম্ভ হয়েছে, এমন সময়ে তোমার না গেলে ভাল হত।

নবীন। আমি কর্তব্যজ্ঞানের দ্বারা বাধ্য হয়ে কিছু দিনের জন্য দূরে যাচ্চি। ঈশ্বর যদি করেন, বোধ হয় অধিক দিন দূরে থাক্‌তে হবে না।

সকলেই নিরুত্তর! নবীনের অনুপস্থিতিকালে কিরূপে কার্য চলিবে, সেই কথোপকথন আরম্ভ হইল। সুরেন্দ্রলাল গুপ্ত হিতৈষীর সম্পাদক ও ব্রজরাজ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। পঞ্চু একজন প্রধান লেখক হইলেন। মথুরেশের উপর ম্যানেজারের ভার অর্পিত থাকিল। তৎপরে সভার অন্যান্য কথা আরম্ভ হইল। স্থির হইল যে, নবীন সহর ত্যাগ করিলেও সভাপতি থাকিবেন; এবং চিঠি পত্র দ্বারা তাঁহার পরামর্শ লওয়া হইবে। তদ্ভিন্ন প্রতি বৎসর পূজার অব্যবহিত পরেই একবার সভার বার্ষিক অধিবেশন হইবে; তাহাতে নবীনচন্দ্র উপস্থিত থাকিবেন; এবং অপরাপর সভ্যগণও উপস্থিত থাকিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় একজন ভৃত্য একখানি পত্র আনিয়া নবীনের

হস্তে দিল। নবীন খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ চিন্তাভারে পূর্ণ হইতে লাগিল। সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি, ব্যাপারটা কি? নবীন বলিলেন, "আমার জেঠা মহাশয়ের শক্ত পীড়া হয়েছে আমাকে এখনি যেতে হবে। রাঙ্গা মা একজন পাড়ার লোকের দ্বারা প০ লিখাইয়াছেন; আমি চল্লাম।" এই বলিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাহির হইয় গেলেন।

নবীন বাড়ীতে গিয়া দেখেন, বসুজ মহাশয় চারি পাঁচদিন হইতে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ক্লেশ পাইতেছেন। পূর্বদিন হইতে পীড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিবার কেহ নাই: কাজ করিবার কেহ নাই। গৃহিণী দুই একজনকে খব দিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই আসেন নাই। একজন প্রতিবেশীকে ডাকাইয়া অনেব করিয়া বলাতে তিনি একবার ডাক্তার ডাকিয়া দিয়াছেন; ও চিঠিখানি লিখিয় দিয়াছেন; তৎপরে তাঁহার আর দেখা নাই। দুই তিন দিন খাটিয়া বিধবা শালিট একটা কাজের ছল করিয়া তাঁহার ভ্রাতার বাড়ীতে গিয়াছেন। বাড়ীতে কেবল দুইটী স্ত্রীলোক ও একটী দাসী আছে। নবীনেরা এবাড়ীতে থাকিতে একটি চাকর ছিল; বসুজ মহাশয়ের কৃপণতার জন্য তাহাকেও ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ডাক্তারখানা হইতে ঔষধটা আনিবে এমন লোক নাই, চাকরাণী কোনও প্রকারে ঔষধটা আনিয়াছে। কিন্তু হিসাব করিয়া খাওয়ায় কে? ভাগ্যে ডাক্তারখানা হইতে শিশির গায়ে দাগ করিয়া দিয়াছিল, তাহা দেখিয়া গৃহিণী দুই একবার খাওয়াইয়াছেন। এমন সময়ে নবীনচন্দ্র গিয়া উপস্থিত! প্রথমে তিনি বসুজ মহাশয়ের ঘরে যাইতে সাহস করিলেন না; বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন তাঁহার আগমনবার্তা পাইয়াই গৃহিণীর দেহে প্রাণ আসিল! তিনি অন্ধকার দেখিতেছিলেন, যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইলেন। নবীনের নিকটে গিয়া কাঁদিয় ফেলিলেন: তাঁহার দাড়িতে হাত দিয়া কত স্নেহের কথা বলিলেন; এবং তিনি রোগা হইয়াছেন বলিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু নবীন আর বিলম্ব করিতে পারিতেছেন না। বসুজ মহাশয়ের ঘরে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিয় পাঠাইলেন। গৃহিণী গিয়া বসুজ মহাশয়ের মুখের নিকট অবনত হইয়া জিজ্ঞাস করিলেন, "নবীন তোমাকে দেখ্তে এসেছে, আর কেউত দেখ্বার নেই; সে আস্বে কি? আর কেউ যে দেখ্বার নেই, তাহা এই বৃদ্ধ কয়দিনে বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন, সুতরাং অধিক অনুরোধ করিতে হইল না, প্রার্থনা মা অনুমতি দিলেন।

নবীন বসুজ মহাশয়ের ঘরে গিয়া, তাঁহার মুখের নিকট অবনত হইয় বলিলেন, "জেঠা মহাশয়! আমি এসেছি, কি কষ্ট হচ্চে, আমাকে বলুন।"

বসুজ মহাশয় অভ্যর্থনাসূচক দৃষ্টির দ্বারা নবীনকে বসিতে বলিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "একটু জল।" নবীন জল দিলেন; ও পাখাখানি লইয়া মস্তকে অল্পে অল্পে বাতাস করিতে লাগিলেন। তিনি অর্ধ ঘণ্টা না বসিতে বসিতে বাহির বাড়ীতে ব্রজরাজ, পণ্ডু, ও সুরেন গুপ্ত প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত; যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়। নবীনের আর মানুষের অপ্রতুল রহিল না। পণ্ডু ও সুরেন গুপ্ত সে রাত্রি বাহির বাড়ীতেই রহিলেন, নবীন ও রাঙ্গা মা রোগীর নিকট রাত্রি জাগরণ করিলেন। পরদিন প্রাতে পণ্ডু একজন ভাল ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার বাবু বলিলেন, "পীড়া সঙ্কট নহে, কিন্তু আরোগ্য লাভ করিতে

কিছু বিলম্ব হইবে; চিন্তিত হইবার বিশেষ কারণ নাই।" চিকিৎসকের বাক্যে নবীনচন্দ্র অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। দিন রাত্রি রোগীর শুশ্রূষা চলিল। এই কারণে তাঁহাকে স্কুল হইতে কয়েক দিনের ছুটি লইতে হইল। তৎপরে তিনি পণ্ডু, গোবিন্দ ও সুরেন গুপ্ত চারিজনে পালা করিয়া স্কুলের কাজ ও রোগীর সেবা দুইই চালাইতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে পণ্ডু, গোবিন্দ ও সুরেনের সহিত বসুজ মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণীর পরিচয় হইয়া গেল। ক্রমে বসুজ মহাশয় আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন।

মানুষের মন কি বিচিত্র! যাহাকে কিছুতেই নরম করিতে পারে না, তাহাকে অনেক সময়ে রোগে নরম করে। এই রোগ-শয্যায় শয়ন করিয়া বৃদ্ধ হলধর বসু অনুভব করিয়াছেন যে তিনি যমের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। যখন পরকালের ছায়া তাঁহার উপরে পড়িতেছিল, তখন তিনি ক্ষণকালের জন্য বিষয়ের অনিত্যতা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার সে বিষয় কে ভোগ করিবে, তাঁহার কোম্পানির কাগজের সুদ কে আদায় করিবে, কে তাঁহার বিষয়ের জন্য ছোট আদালত আর ঘর করিবে? এই সকল চিন্তা অতি প্রবল ভাবেই কয়েকবার তাঁহার মনে উদয় হইয়াছে। যতবারই এই সকল প্রশ্ন আসিয়াছে, ততবারই যেন চক্ষে অন্ধকার দেখিয়াছেন; এবং এক একবার তাঁহার আশার দৃষ্টি ঐ পার্শ্বস্থিত ভ্রাতুষ্পুত্রের উপরে পড়িয়াছে, যে ব্যক্তি পুত্রের অধিক একাগ্রতার সহিত তাঁহার সেবা করিতেছে। রোগ-যাতনার মধ্যে তিনি এক একবার নবীনকে উইল করিবার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু নবীন সে কথা উড়াইয়া দিয়াছেন; বলিয়াছেন, "এ ব্যারাম শীঘ্র সারিয়া যাইবে, ওসব কথা এখন থাক।" এমন যে কঠিন বৃদ্ধ, এমন যে শুষ্কাকৃতি ও শুষ্কহৃদয় বৃদ্ধ, তিনিও নবীনের শুশ্রূষাতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কয়েকবার বলিয়াছেন—"ভাগ্যে তুমি ও তোমার বন্ধুরা ছিলে, তাই এ যাত্রা রক্ষা পেলাম, তুমি আমার কাছ আর ছেড় না।" এই সকল কথাতে নবীনচন্দ্রের চক্ষে জল আসিয়াছে; কিন্তু তিনি সে অশ্রু নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

বসুজ মহাশয় রোগমুক্ত হইতে না হইতে পূজা অতীত হইয়া গেল। পূজার পরেই পূর্বোক্ত সঙ্কল্পানুসারে নবরত্ন সভার সাম্বৎসরিক প্রথম অধিবেশন উপস্থিত। সভ্যগণ সকলে সমবেত হইলে, নবীনচন্দ্র যথাসময়ে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া পণ্ডুকে একটী সঙ্গীত করিতে অনুরোধ করিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে নিজেই নিম্নলিখিত মর্মে প্রার্থনা করিলেন,—"হে করুণাময় বিধাতা, এত বৎসর একত্রে বাস করিয়া আমরা তোমার যে অপার করুণা সম্ভোগ করিয়াছি, সেজন্য তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ করি। আমাদের বিচ্ছেদের দিন সম্মুখে আসিতেছে। প্রাণ বিষাদে ম্লান হইতেছে; তোমার চরণে এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে, এই বিচ্ছেদকালে যেন আমরা তোমারই করুণাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারি; এবং সর্বদা সর্বত্র আমাদের নিঃস্বার্থ জীবনের দ্বারা যেন তোমার পূজা করিতে পারি।" নবীনকে কেহ কখনও মুখ ফুটিয়া প্রার্থনা করিতে শুনে নাই; সহস্র অনুরোধ করিলেও তিনি তাহা করিতেন না। কেমন এক প্রকার লজ্জা হইত। আজ এই কয়েকটী কথা বলিতে অশ্রুতে মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, ও ভাবাবেশে কথা রোধ হইয়া আসিল; আর অধিক বলিতে পারিলেন না। তাঁহার এই ভাব দর্শনে সে ক্ষেত্রে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হইল। উপস্থিত সভ্যগণের অনেকেই

কাঁদিতে লাগিলেন। পণ্ডু ভাবে বিভোর হইয়া আবার গান করিলেন ও নিজে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সকলেই অনুভব করিলেন নবরত্ন সভার প্রতিষ্ঠা অবধি এমন দিন কখনও আসে নাই।

ক্রমে সকলে একটু শান্তভাব ধারণ করিলে, সভার ভবিষ্যৎ কার্যাদির বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ হইল। সমন সময়ে সুরেন্দ্রলাল গুপ্ত আসিয়া উপস্থিত। নবীন পূর্বাবধিই "সুরেন এলো না কেন?" বলিয়া বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, সকলেই বলিতেছিলেন তার একটু বিলম্ব হবে। সুরেন যখন আসিলেন তখন নবীন তাহার বিলম্বের কারণ বুঝিতে পারিলেন। অদ্যকার সভাতে নবীনচন্দ্রকে কিছু প্রীতির উপহার দেওয়া হইবে, সুরেন সেই যোগাড় করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহা লইয়া উপস্থিত। একটী চমৎকার বাক্স আনিয়াছেন, যাহা দেখিলে উপরে একখানি পুস্তক বলিয়া বোধ হয়, অথচ তাহার মধ্যে দোয়াত, কলম, চিঠির কাগজ, টাকা-পয়সা প্রভৃতি সমুদায় রাখিবার বন্দোবস্ত আছে ও একটী সোনার ঘড়ি আছে। এই মূল্যবান বস্তুটীর মূল্য এই যুবকদলের সকলে সানন্দে দিয়াছে। সুরেন বাক্সটী লইয়া নবীনচন্দ্রের নিকটস্থ হইলে তিনি আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও হস্ত দ্বারা নিজের মুখ আবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সভ্যেরা সকলে দণ্ডায়মান। সুরেন সকলের মুখপাত্রস্বরূপ নবীনের করে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রাণের ভাই! তোমার গুণ আমরা ভুলিতে পারিব না; তুমি আমাদের যে উপকার করিয়াছ, তাহার প্রতিশোধ জন্মেও হইবে না; আমরা তোমাকে এমন কিছুই দিতে পারি না, যাহা তোমার গুণের উপযুক্ত হয়; তথাপি এই সামান্য উপহার গ্রহণ কর। এইটী যখন ব্যবহার করিবে, তখন আমাদের কথা স্মরণ করিও।" সকলে চারিদিকে কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং নবীনচন্দ্রও ভাবাবেগে কাঁপিতে লাগিলেন।

একদিকে নবীনচন্দ্র তাঁহার বন্ধুদিগের হস্ত হইতে প্রীতির উপহার প্রাপ্ত হইলেন; অপর দিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় একটু সুস্থ হইয়াই একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি গেলে বলিলেন, "সুরেশকে সঙ্গে করিয়া সন্ধ্যার সময়ে একবার এস, একটু বিশেষ কাজ আছে।" নবীনচন্দ্র রাঙ্গা মার মুখে শুনিয়া গেলেন, যে, বৃদ্ধ তাঁহাদের পিতার গচ্ছিত সমুদায় ধন তাঁহাদিগকে অর্পণ করিবেন, এরূপ সংকল্প করিয়াছেন। বসুজ মহাশয়ের পীড়ার সময় নবীনচন্দ্র দুই দিন স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ডাকিতে গিয়াছিলেন, তিনি তখন আসেন নাই, কিন্তু যখন শুনিলেন যে টাকা কড়ি বুঝাইয়া দিবেন, তখন আর আপত্তি রহিল না। তাঁহারা উভয়ে সায়ংকালে উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমাদের পিতার গচ্ছিত সুদে আসলে প্রায় ২২ বাইশ হাজার টাকা আমার নিকট আছে। আমি ক্রোধ করিয়া তাহা তোমাদিগকে জানিতে দিই নাই: কিন্তু আমার বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায় ছিল না। সেই টাকা ১ হাজার করিয়া দুই ভাইয়ে গ্রহণ কর; আর আমি এই বাড়ীর দাম ১৬ ষোল হাজার ধরিয়াছি. সেই ন্যায্য দাম। আমার অংশের ৮ হাজার বাদে তোমাদের দুই ভাইকে আট হাজার দিতেছি। বাড়ীটা আপাততঃ আমারই থাক। কারণ, আমাদের এত বিষয়ে মতান্তর ঘটেছে যে, এক বাড়ীতে বনিবনাও হওয়া সম্ভব নয়; আর বাড়ীটা প্রাচীর দিয়া ভাগাভাগি করলেও একেবারে বাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। অতএব একজনের হাতে থাকাই ভাল।" এই প্রস্তাবে উভয় ভ্রাতা সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে একটী দিন স্থির হইল, যে দিন লেখা পড়া করিয়া টাকা দেওয়া হইবে। নবীন বলিলেন, "জেঠা মশাই, আমি এখন সহরের বাহিরে চাকুরী লইয়া যাইতেছি; আমার টাকার প্রয়োজন নাই, আমার টাকা আপনার নিকটেই থাক্; ঐ টাকার সুদ মাসে মাসে রাঙ্গা মাকে দেবেন, তিনি দান ধ্যান কর্বেন।" বৃদ্ধ তথাপি টাকাগুলি লইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, নবীন লইতে স্বীকৃত হইলেন না।

এদিকে পূজার পরেই নবীন ফরিদপুর জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কর্ম পাইলেন। ঐ পদের বেতন ৭৫্ টাকা। এই কর্ম পাইয়া তিনি রাঙ্গা মা, ভ্রাতৃজায়া, ব্রজরাজের মাতা প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া ও পণ্ডুকে নিজের কাজটী যোগাড় করিয়া দিয়া, আপাততঃ কিছু কালের জন্য ফরিদপুর যাত্রা করিলেন।

১৮

১৮৫৬ সালের মাঘ মাসেই বিন্ধ্যবাসিনীর বিবাহ উপস্থিত। ১৮৫২ সালে স্বীয় জননীর সঙ্গে সে যখন নশিপুরে মাতামহালয়ে যায়, তখন তাহার বয়স ৭ বৎসর অতিক্রম করিতে চলিল। শাস্ত্রানুসারে ও দেশাচারানুসারে সে অরক্ষণীয়া হইয়াছে। এতদিন যে তাহার বিবাহ হয় নাই, সে কেবল বিজয়ার জন্যই! এক বৎসরের অধিককাল হইতে শিবচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় ত্বরা দিতেছেন। বিজয়া কেবল এই কথা বলিতেছেন,—"থাক্ যতদিন বিবাহ না হয়ে যায় থাক্—বিবাহ হইলেই ত ওর পড়াশুনা সব বন্ধ হবে।" তর্কভূষণ মহাশয় এই কথা শুনিয়া বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন নাই। কিন্তু মেয়ে বার বৎসরে পা দিতে যায়, আর কেহই স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। বিগত পূজার সময়ে পাত্র দেখিয়া শীঘ্র বিবাহ দেওয়া একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে। পাকাপাকিরূপে বিবাহের প্রস্তাব উঠিলেই বিজয়া তাঁহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, যদি বিবাহ দিতেই হয় তবে গোবিন্দের সঙ্গে বিবাহ দিলে ভাল হয়। গোবিন্দের স্বভাব চরিত্র তিনি উত্তমরূপ জানেন। সে যদিও দরিদ্রের সন্তান, তথাপি সে যেরূপ মনোযোগ দিয়া লেখা পড়া শিখিতেছে, তাহাতে যে ত্বরায় আপনার অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রস্তাবে শিবচন্দ্র হাড়ে জ্বলিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তিকে তিনি বাসা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, যাহাকে দেখিলে তাহার বিরক্তির উদয় হয়, তাহাকে কন্যা সম্প্রদান! ইহা হইতেই পারে না। তিনি বিজয়ার প্রস্তাব ও তদুপরি নিজের আপত্তি জানাইয়া নশিপুরে তর্কভূষণ মহাশয়কে পত্র লেখেন। অপর সকল আপত্তির প্রতি তর্কভূষণ মহাশয় বিশেষ মনোযোগ করেন নাই; তাঁহার মনে সর্বপ্রধান আপত্তি এই, গোবিন্দের পিতা রামনিধি চাটুয্যে ব্রাহ্মণ কিনা কে জানে? আর যদিই ব্রাহ্মণ হয়, কোন জাতীয় ব্রাহ্মণ তাই বা কে বলিতে পারে? হরিহর চক্রবর্তী না হয় দায়ে পড়িয়া রামনিধিকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, বিজয়ার এমন কি দায় উপস্থিত হইয়াছে? সুতরাং বিজয়ার প্রস্তাব তর্কভূষণ মহাশয় হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

অবশেষে বহু অন্বেষণের পর নৈহাটীর মুখুয্যেদের বাড়ীর একটী ছেলের

সঙ্গে বিবাহ স্থির করা হইয়াছে। ছেলেটীর বয়স ১৬।১৭ বৎসর হইবে; হুগলী কালেজে পড়ে। পাত্রটী দেখিতে শুনিতে যে ভাল তাহা নহে। বিজয়া যতদূর সংবাদ লইয়াছেন, তাহাতে জানা গিয়াছে যে ছেলেটীর পড়াশুনাতে বড় মনোযোগ নাই; এবং স্বভাব চরিত্রও ভাল নয়। কিন্তু কর্তাদের নিকট সর্বোপরি তাহার সদ্‌গুণ এই যে, সৎকুলজাত ও তাহার পিতা একজন সম্পন্ন লোক, খাইবার পরিবার কষ্ট হইবে না। এ পাত্র কোনওরূপেই বিজয়ার মনোমত হয় নাই; অথচ জ্যেষ্ঠের মতে বাধা দিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। নশিপুর হইতে শঙ্কর তাঁহার দেবরদ্বয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহারাও এ পাত্র মনোনীত করিয়াছেন। তবে আর উপায় কি? বিজয়ার হইয়া কেবা কথা বলে? তাঁহার পক্ষে কেহই নাই, কেবল এক পণ্ডু। পণ্ডুর প্রথম ইচ্ছা, বিন্ধ্যবাসিনী আরও কিছুদিন লেখা পড়া করে; কারণ তিনি বাল্যবিবাহের বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ, বিবাহ যদি দিতেই হয়, তবে গোবিন্দের সহিত দেওয়া কর্তব্য। পণ্ডু বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছেন যে, মনোনীত পাত্র, চারুচন্দ্র ভাল ছেলে নহে; এবং সে বাড়ীর লোকের স্বভাব চরিত্রও ভাল নহে। সে সমুদায় সংবাদ তিনি বিজয়াকে দিয়াছেন; এবং এই বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিবার জন্য বার বার প্ররোচনা দিতেছেন। তাঁহার সহিত বিজয়ার মনের সম্পূর্ণ মিল, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি জ্যেষ্ঠের অবাধ্য হইয়া কাজ করিতে সাহসী হইতেছেন না। ওদিকে তাঁহার মনের অনুশোচনা ও আত্মনিন্দার মধ্যে বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।

বিবাহ একপ্রকার স্থির হইয়া গেলে এই প্রশ্ন উঠিল, কোথায় বিবাহ হইবে? নশিপুরের বাড়ীতে, কি কলিকাতায় বিন্ধ্যবাসিনীর পিত্রালয়ে? মেদিনীপুরে বিজয়ার মধ্যম দেবরের মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে, তিনি লিখিলেন, যে তাঁহার প্রথমা কন্যাটীরও বিবাহ শীঘ্র দিতে হইবে, তিনি একটী উপযুক্ত পাত্র হাতে পাইয়াছেন, আর বিলম্ব করিতে পারিতেছেন না; সুতরাং নিজ কন্যার আট বৎসরেই বিবাহ দিতেছেন। মাঘ মাসে একদিনে বিবাহের দুইটা লগ্ন আছে; ঐ দিনে দুই কন্যারই বিবাহ দেওয়া হইবে; তাহা হইলে ব্যয়ের অনেক সুবিধা হইবে। তর্কভূষণ মহাশয় এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তদনুসারে কলিকাতার বাড়ীতে বিবাহ দেওয়াই স্থির হইয়াছে। ১২ই মাঘ বিবাহের দিন। বিজয়ার মধ্যম দেবর লিখিয়াছেন, যে তিনি সে সময়ে ছুটী লইয়া আসিবেন। বিজয়া এক মাস পূর্ব হইতেই কলিকাতার বাসাতে ছোট দেবরের নিকটে গিয়া রহিলেন; ও কন্যাদ্বয়ের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় বিন্ধ্যবাসিনীর বিবাহের ব্যয়ের সাহায্যার্থে গোপনে বিজয়ার নিকটে ১৫০ দেড় শত টাকা প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট দেবরেরা দিবেন।

বিজয়া দেবরদিগের বাড়ীতে আসিয়া অবস্থিতি করা অবধি পণ্ডু ও গোবিন্দ প্রায় প্রতিদিন আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। এই বিবাহটা হইতেছে বলিয়া পণ্ডু অতিশয় দুঃখিত। তিনি বিজয়ার নিকটে সর্বদাই দুঃখ প্রকাশ করেন। বিজয়ার বলিবার কিছু নাই, তিনি নিজেই দুঃখিত, সুতরাং মৌনী হইয়া থাকেন। বিবাহের দিন সন্নিকট হইলে পণ্ডু দুঃখিত হইয়া বলিয়া গেলেন, "আমি এবিবাহে আসিব না: আপনি ঐ বালিকাটীর প্রতি মায়ের কর্তব্য করিলেন না।" পণ্ডু চলিয়া গেলে বিজয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া রহিলেন।

ক্রমে বিবাহের দিন উপস্থিত। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণে বাড়ী পূর্ণ

হইতে লাগিল। দুই স্থানে দুইটী আসন ও দুই স্থানে বিবাহমণ্ডপ করা হইয়াছে। কন্যাকর্তা দুইজন। হরিকিশোর নিজ কন্যাকে সম্প্রদান করিবেন; এবং যুগলকিশোর বিন্ধ্যবাসিনীকে সম্প্রদান করিবেন। যুগলের পত্নী বিন্ধ্যবাসিনীর বরকে বরণ প্রভৃতি কন্যাকর্ত্রীর সমুদায় কার্য করিবেন। বিজয়ার প্রতি কেবল নিমন্ত্রিতা নারীগণের তত্ত্বাবধানের ও ভাঁড়ার রক্ষার ভার আছে।

আজ দুইটী কন্যাতে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে। হরিকিশোরের কন্যা অষ্টালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বসিয়া আছে; কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর অঙ্গে সর্বসমেত একশত টাকারও গহনা হইবে কিনা সন্দেহ। এতদ্ভিন্ন অদ্যকার দিনে আর একটু পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে। হরিকিশোরের পত্নী মোক্ষদা, আজ এমনি সাজিয়াছেন, যে দেখিলে তিনি যে কন্যাকর্ত্রী এরূপ বোধ হয় না; বোধ হয় যেন তিনি নিমন্ত্রিত কোনও ধনীর রমণী। তাঁহার হাতে হাজার টাকা মূল্যের এক জোড়া বালা, ও তৎপার্শ্বে নারিকেল ফুল; গলে পাঁচনলি ও দক্ষিণ বাহুর উপরে সোনার বাজু, তাবিজ ও তাগা; এবং কোমরে চন্দ্রহার। তিনি দক্ষিণ বাহুখানি অনাবৃত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; এবং স্বর্ণালঙ্কার দেখিয়া দেখিয়া নারীগণকে আদর করিয়া নিজের ঘরে বসাইতেছেন। সমাগতা নারীগণ সকলেই তাঁহার বালা দেখিতেছেন, ও তাহার গড়নের অনেক প্রশংসা করিতেছেন। বিজয়া গরীব গোছের স্ত্রীলোকদিগকে আদর করিয়া নিজ গৃহে বসাইয়া আপ্যায়িত করিতেছেন। ভাগ্যে বিজয়া ছিলেন, তাহা না হইলে এই গরীবেরা বোধ হয় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া যাইত।

যথাসময়ে বর আসিল; কন্যাসম্প্রদান হইল; নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের ভোজনাদি হইতে লাগিল। নীচে আহারাদি চলিয়াছে; ওদিকে উপরে বৈঠকখানার পার্শ্বের ঘরে হরিকিশোর তাঁহার কয়েকটী বন্ধুকে লইয়া বসিয়াছেন। দ্বারটী বন্ধ আছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের একজনের গোপাল নামক একটী ভৃত্য দ্বারের বাহিরে বসিয়া আছে; যেন কেহ হঠাৎ ঘরে প্রবিষ্ট না হয়। তাঁহারা পাঁচ ছয়জন লোকে একটী টেবলের চারিদিকে বসিয়াছেন; সকলেই ইংরাজীতে সুশিক্ষিত এবং সকলেই উচ্চপদস্থ লোক; কেহ সদরওয়ালা, কেহ ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, কেহ প্রফেসার। এই জন্য তাঁহাদের বিশেষ আদর ও তাঁহাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত। টেবলের উপর একটী মদের বোতল ও একটী গ্লাস রহিয়াছে; তাঁহাদের কথোপকথন চলিতেছে। একজন গ্লাসে একটু মদ ঢালিয়া, এক ঢোক পান করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—

"I say Harikisor, how did you feel, when going through that farce of a ceremony of giving away a daughter in the presence of the fire?

--অর্থ, আচ্ছা হরিকিশোর অগ্নি সাক্ষী করিয়া কন্যাসম্প্রদানরূপ ছেলেখেলাটা যখন করিতেছিলে, তখন কেমন লাগিতেছিল?"

হরিকিশোর। You can well imagine that sort of thing no longer suits educated men, these things should be left to the women and the ignorant priests.

—অর্থ, তা ত বুঝিতেই পার; শিক্ষিত ব্যক্তিদের কি আর ওসব করা শোভা পায়? ওসব কাণ্ড মেয়েদের ও মূর্খ পুরোহিতদের জন্য থাকাই ভাল।

প্রথম ব্যক্তি। (অট্ট হাস্য করিয়া) All religious ceremonies are intended for the ignorant masses; they are not meant for

enlightened people—অর্থ, সমুদায় ধর্মানুষ্ঠানই অজ্ঞ লোকদিগের জন্য, শিক্ষিতদিগের জন্য নহে। (আর এক ঢোক সুরাপান)।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। Then what do you think of that curse of child-marriage? Is it not sapping the very foundations of our national life?—অর্থ, তৎপরে এই বাল্যবিবাহরূপ মহানিষ্টের বিষয় তুমি কি বিবেচনা কর? ইহাতে কি আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি পর্যন্ত বিনষ্ট করিতেছে না?(বলিয়াই এক ঢোক সুরাপান)।

হরিকিশোর। Oh yes, equally objectionable or perhaps more. —অর্থ, তা বৈ কি, সমান আপত্তি-জনক অথবা বোধ হয় বেশি। (সুরাপান)।

তৃতীয় ব্যক্তি। What is the age of your daughter?—অর্থ, এখন তোমার মেয়ের বয়স কত?

হরিকিশোর। Only past eight.—অর্থ, সবে অষ্টম বৎসর পার হইয়াছে।

তৃতীয় ব্যক্তি। Oh foolish! you could have waited a few more years.—অর্থ, কি নির্বোধের কাজ, তুমি বোধ হয় আরও দুই এক বৎসর দেরী করতে পারতে।

প্রথম ব্যক্তি। What is the age of your neice?—অর্থ, তোমার ভাইঝির বয়স কত?

হরিকিশোর। I think she is twelve—অর্থ, আমার বোধ হয় তার বয়স বার বৎসর।

তৃতীয় ব্যক্তি। Then it seems your sister-in-law is a more rational being than yourself.—অর্থ, তবেই ত দেখ্‌ছি তোমার ভাজ তোমার অপেক্ষা বুদ্ধিমতী।

ইহা শুনিয়াই মানসিক উত্তেজনাতে হরিকিশোরের ইংরাজী অন্তর্হিত হইল। তিনি কর্কশ ও নেশা-বিকৃতস্বরে বলিলেন, "বল্‌লে হয় না বাবা, উপস্থিত পাত্রটী ছেড়ে দিয়ে তার পর কোথায় খুঁজে বেড়াই?"

চতুর্থ ও পঞ্চম। Quite right—ঠিক কথা?

এইরূপ নানা বিষয়ে কথোপকথন চলিল; এবং মদের গ্লাসটী ঘন ঘন ঘুরিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে অপরাপর লোকের ভিড় কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিলে, ক্রমেই বাবুদের ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখা কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই ঘরের ভিতর হইতে অট্টহাস্য ও নানাপ্রকার চীৎকারের ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট ছিল, সকলে ছুটিয়া গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে চায়, যুগলকিশোর ও বাড়ীর অপরাপর লোকে নিষেধ করিয়া রাখেন, "ও ঘরে যাবেন না, ওখানে বাবুরা আমোদ কর্‌ছেন।"

বাবুদের আমোদ ক্রমে অনেকদূর গড়াইয়া গেল। তাঁহাদের জন্য বিশেষ ভাবে মাংসাদি পাক হইয়াছিল, কিন্তু আহারের দ্রব্য যখন আসিল, তখন আর তাঁহাদের আহারের মত অবস্থা নাই। একজনের মস্তকটী বক্ষঃস্থলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তিনি গৃধ্ররাজ জরদ্গবের ন্যায় অবনত মস্তকে, টেবলের উপরে দুইখানি হস্ত প্রসারিত করিয়া, যেন তন্ময় হইয়া আছেন। গোপাল তাঁহারই ভৃত্য। তিনি এতক্ষণ মধ্যে মধ্যে গোপালকে ডাকিতেছিলেন। এ ডাকার মধ্যে কিঞ্চিৎ চমৎকারিত্ব আছে। নেশা যতই পাকিতেছে, ততই ডাকের প্রণালীও বদ্‌লাইতেছে।

দুই এক গ্লাস খাইয়াই ডাকিলেন—গুপ্লে—এ—এ; নেশা আর একটু পাকিলে ডাকিতে লাগিলেন—প্লে—এ—এ; তৎপরে নেশার আরও গাঢ়তা হইলে ডাকিতে লাগিলেন—লে—এ—এ। এক্ষণে সেটুকুও গিয়াছে! এখন যেন নিদ্রাভিভূত! আহারের জন্য অনেক ঠেলাঠেলি করাতে একবার চক্ষু খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— Is the Hugly on fire? —অর্থ, গঙ্গাতে কি আগুন লেগেছে? তিনি গঙ্গাতে আগুন দেখিতেছেন! আর একজন উঠিয়া নৃত্য করিতেছেন, তাঁহাকে ধরিয়া বসান ভার! হরিকিশোরের ইংরাজী বক্তৃতার ঝোঁক আসিয়াছে! তিনি টেব্‌ল্ চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছেন;—

Be thou a spirit of health, or goblin damned or that sea-beast, leviathan, which God of all his works, created hugest, that swim the ocean stream;—

ইতিমধ্যে আর এক ব্যক্তি লম্ফ দিয়া উঠিয়া তাঁহার মুখ আবরণ করিয়া তাঁহাকে জোরে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বক্তার তখন ঝোঁক আসিয়াছে, বক্তৃতা পাইয়াছে, তিনি শুনিবেন কেন? তিনি নিবারণকারীর হাত ছাড়াইয়া চীৎকার করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—

Be thou a Canning or Channing; be thy intents sacred or charitable;—

পূর্বোক্ত ব্যক্তি আবার তাঁহার মুখ আবরণ করিলেন; সুতরাং বক্তৃতাটা এইখানেই বন্ধ হইয়া গেল। বক্তৃতাটা অবশ্য মাতালে উচ্চারণে হইয়াছিল, তাহা লেখাতে প্রকাশ হইল না। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহাদের জন্য অনুবাদও দিতে পারা গেল না। তাঁহারা এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিবেন, যে এরূপ ইংরাজী বক্তৃতা তাঁহারা নাই-বা বুঝিলেন। তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে, হরিকিশোর সেক্ষপীয়ার ও মিল্‌টনের গ্রন্থে সুপণ্ডিত। পূর্বোক্ত বক্তৃতাতে সেই পাণ্ডিত্যের কিঞ্চিৎ শ্রাদ্ধ হইল, এইমাত্র।

এই কোলাহল ও গোলযোগের মধ্যে আর এক ব্যক্তি বমি করিয়া টেব্‌ল্, কাগজ, বই ও অপর একজনের কাপড় ভাসাইয়া দিলেন।

এইরূপে সেদিনকার বিবাহকার্য সমাধা হইয়া গেল। যুগলকিশোরের প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি অদ্যকার বিশেষ প্রলোভনের মধ্যেও ধৈর্যধারণ করিয়া আছেন। পঞ্চু আসেন নাই, কিন্তু গোবিন্দ আসিয়াছেন। কেবল তাহা নহে, পরিবেশনাদিতে তিনি তিনজনের শ্রম একা করিতেছেন।

বিন্ধ্যবাসিনীর বিবাহের পরেই বিজয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসাতে গমন করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দুই মাস যাইতে না যাইতে সংবাদ আসিল যে, তাঁহার নব জামাতা চারুচন্দ্র যে জ্বরগায়ে বিবাহের দিন আসিয়াছিল, সেই জ্বরেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইহাতে বিজয়া হৃদয়ে অতিশয় আঘাত পাইলেন। বিন্ধ্যবাসিনী যে অকাল-বৈধব্যে পতিত হইল, ইহা তাঁহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল।

১৯

অনেক দিন হইল আমরা তর্কভূষণ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা ভুবনেশ্বরীকে ভুলিয়া রহিয়াছি। ভুবনেশ্বরী প্রথম শ্বশুর ঘর করিতে গিয়া বিনা দোষে নিগ্রহ সহ্য করিয়া পূজার সময় পিত্রালয়ে আসিয়াছে, এইমাত্র সকলে অবগত আছেন। সে হইল ১৮৫৩ সালের দুর্গোৎসবের সময়। ভুবনেশ্বরীকে আনিবার সময় কথা ছিল যে, তৎপরবর্তী মাঘ মাসে রামরতন মুখুয্যে মহাশয় তাহাকে লইবার জন্য লোক পাঠাইবেন। তদনুসারে ১৮৫৪ সালের মাঘ মাস পড়িলেই ভুবনেশ্বরীকে লইবার জন্য নশিপুরে লোক আসিয়াছিল। কিন্তু ভুবনেশ্বরী তাহার প্রথম বারের নিগ্রহের কথা, ও শ্বশুর বাড়ীতে যাহা দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল, তাহার কিছু কিছু বিবরণ বিজয়াকে ও নিজ জননীকে বলিয়াছিল। সেই সকল শুনিয়া গৃহিণী কুপিত হইয়াছিলেন। তিনি মাঘ মাসে ভুবনেশ্বরীকে পাঠাইলেন না; বলিলেন,—"এই সেদিন এসেছে; কিছুদিন থাক্ না।" পাঠান ত হইল না; অধিকন্তু সমাগত দাসীর দ্বারা বৈবাহিক গৃহিণীকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া পাঠাইলেন।

এত কথা তর্কভূষণ মহাশয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি পত্রে এইমাত্র লিখিলেন,—"ছেলে মানুষ কয়েক মাস মাত্র আসিয়াছে, এখনও আরও কয়েক মাস থাক্। জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাবাজীকে জামাই-ষষ্ঠীর সময়ে আনিতে লোক যাইবে। অমনি বাবাজীর সঙ্গে শ্রীমতীকে প্রেরণ করা যাইবে।" তর্কভূষণ মহাশয়ের পত্র পাইয়া মুখুয্যে মহাশয় সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু মুখুয্যে গৃহিণী দাসীর মুখে আরও কিছু অধিক সমাচার পাইয়া আগুন হইয়া রহিলেন।

ক্রমে জামাই-ষষ্ঠীর সময় উপস্থিত। যথাসময়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথকে আনিবার জন্য লোক গেল। জ্ঞানেন্দ্র নশিপুরের বাড়ীতে আগমন করিল। তখন গ্রীষ্মাবকাশের সময়; ছেলেরা সকলেই বাড়ীতে আছে। হরচন্দ্র অনুতাপ ও নবজীবনের মধ্যে বাস করিতেছেন। নশিপুরের সকলে পূর্বেই লোকমুখে জ্ঞানেন্দ্রের স্বভাব-চরিত্রের বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন, সুতরাং কেহই তাহাকে তেমন আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করিল না। জামাই বাড়ীতে আসিলে ভদ্র লোকে যেরূপ আদর যত্ন করে, তাহার কিছু অপ্রতুল হইল না বটে, কিন্তু কি জানি কেন, জলের মাছকে ডাঙ্গায় রাখিলে যেরূপ হয়, জ্ঞানেন্দ্রেরও যেন সেই প্রকার দশা ঘটিল। সে গোপনে গাঁজা খাইতে শিখিয়াছে, ইহারা কেহ তামাকটী পর্যন্ত খায় না; হরচন্দ্র তামাক খাইতে শিখিয়াছিলেন, অনুতাপের দিন হইতে তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন; সে পড়াশুনা ছাড়িয়া দোকানদারি করে; ইহারা পণ্ডিতবংশ, সকলেই বিদ্যাচর্চাতে নিযুক্ত: সে সর্বদা ছোটলোকের সঙ্গে মিশিয়া কুৎসিত আমোদ প্রমোদ ভালবাসে; ইহারা সে সকলকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে: সে জুয়াখেলাতে পরিপক্ক; ইহারা অনেকে তাস খেলিতেই জানে না: সুতরাং জলের মাছ ডাঙ্গায়, এইরূপ অনুভব করিবারই কথা।

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় ধীর গম্ভীর মানুষ, অধিক কথা কহা তাঁহার অভ্যাস নয়, তাহাতে আবার জ্ঞানেন্দ্র পড়াশুনা ছাড়িয়া বাজারে দোকান করিয়াছে শুনিয়া তাঁহার মনে মনে মুখুয্যে মহাশয়ের পরিবারের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে। তিনি প্রথম দিনে দুই চারিটী কথা কহিয়াছেন, মধ্যে আরও দুই একবার দুই

একটী প্রশ্ন করিয়াছেন, তৎপরে আর বিশেষ বাক্যালাপ নাই।

যাহা হৌক জ্ঞানেন্দ্র যে কয়েকদিন শ্বশুরবাড়ীতে ছিল সে কয়েকদিন যেন তাহার পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রণা গিয়াছে। জামাই-ষষ্ঠী হইয়া গেলেই সে ভুবনেশ্বরীকে লইয়া উলোতে নিজ ভবনে গেল। পথে মনে মনে সেই নিরপরাধা বালিকাকে শাসাইয়া গেল, একবার চল না, এক বার উলোর বাড়ীতে গিয়ে দেখাব! আপনারা হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন তার অপরাধ কি? আমিও ভাবি, তার অপরাধ কি? কিন্তু এদেশে দুই বাড়ীর কলহে এইরূপ সহস্র সহস্র নিরপরাধা বালিকা যাতনা পাইতেছে।

এক দিকে সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে প্রথম বারে মেজবৌ চাতুরী খেলিয়া নিজের দোষ ভুবনেশ্বরীর ঘাড়ে চাপাইয়া যে যাতনা দিয়াছিল, এবারে সে বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। যাহার যাহা স্বভাব, তাহা কি সহজে যায়? এবং সত্য কি অধিক দিন চাপা থাকে? ভুবনেশ্বরীর অনুপস্থিতি কালে মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ীতে আরও কয়েকবার টাকা পয়সা চুরি হইয়াছিল। গৃহিণী প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রকে সন্দেহ করেন, তৎপরে একদিন স্বচক্ষে দেখিয়া মেজবৌকে ধরিয়া ফেলেন। তদবধি মেজবৌ তাঁহার বিষনয়নে পড়িয়াছে; এবং ভুবনেশ্বরীর প্রতি অবিচার করা হইয়াছিল বলিয়া অনুতাপেরও উদয় হইয়াছে। সুতরাং এবার ভুবনেশ্বরীকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার কথা। কিন্তু কালচক্রে কখন্ কোন্ ঘটনা আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা কে বলিতে পারে? গৃহিণীতে গৃহিণীতে কথা চালাচালি হইয়া বিষম বিবাদ বাধিয়া গেল। ভুবনেশ্বরী আসিবামাত্র শাশুড়ী বলিলেন, "এস বাছা, ঘরে ঢোক, আর বাপের বাড়ী যাবার নামটী কর্‌তে পার্‌বে না।" জ্ঞানেন্দ্রের সেই প্রতিহিংসোদ্যত মুখ দেখিয়া এবং শ্বশ্রূর এই সুমিষ্ট সম্বোধন শুনিয়া, ভুবনেশ্বরীর প্রাণটা কিরূপ হইল, তাহা কি বর্ণনাসাপেক্ষ? বেচারী বুঝিল, তাহার জন্য দুঃখের অমানিশি আসিতেছে। ক্রমে জ্ঞানেন্দ্র শ্বশুরবাড়ী গিয়া যে কষ্টে দিন কাটাইয়াছে, সমুদায় বিবরণ জননীর কর্ণগোচর করিল। ভুবনেশ্ববীকে সাজা দিবার এই আর একটা কারণ যুটিল।

১৮৫৩ সালে পূজার সময় ভুবনেশ্বরী পিত্রালয়ে যাওয়ার পর রামরতন মুখুয্যে মহাশয়ের পরিবার মধ্যে যে-যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। মুখুয্যে মহাশয়ের প্রথম দুই পুত্র, রাজেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র, ঐ বৎসর পূজার সময়ে বাড়ীতে আসিয়া পাড়ায় সমবয়স্ক একজন বন্ধুর সঙ্গে এই পরামর্শ করিল, যে পূজার পরেই তিনজনে সমানাংশে উলোর বাজারে উচ্চদরে একখানা মনিহারির দোকান খুলিবে। তাহাতে কাগজ, কলম, বই, গ্লাস, ল্যাম্প, এমন কি চীনের বাড়ীর জুতা পর্যন্ত থাকিবে। জ্ঞানেন্দ্র ও সেই বন্ধুটী দুজনে দোকান দেখিবে। টাকা পয়সা সমুদায় সেই বন্ধুটীর হাতে থাকিবে, জ্ঞানেন্দ্র শুধু বসিয়া থাকিবে ও খরিদদারকে বেচিবে। তদনুসারে পূজার পরেই কলিকাতা হইতে সমুদায় জিনিষপত্র আসিল; এবং যথাসময়ে দোকান খোলা হইল। জ্ঞানেন্দ্র প্রাতে উঠিয়াই দোকানে যায়, একবার দুপুরবেলা আহার করিতে আসে, আবার আহারান্তে বৈকালে দোকানে যায়, পরে রাত্রি প্রায় ৯টার সময়ে ঘরে আসে।

কয়েক মাসের মধ্যেই দেখা গেল যে এই দোকানটি জ্ঞানেন্দ্রকে একেবারে পাপ-সাগরে নিমগ্ন করিবার উপায়স্বরূপ হইল। একেই তাহার স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না, তাহাতে সে আবার প্রলোভনজালের মধ্যে গিয়া পড়িল। দোকানে দিন রাত্রি

থাকাতে বাজারের কতকগুলি দুশ্চরিত্র যুবকের সঙ্গে তাহার পরিচয় ও বন্ধুতা হইল। সে তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া তামাক হইতে চরশ, চরশ হইতে গাঁজাতে প্রমোশন পাইল; তাস খেলাতে উত্তম পরিপক্ক হইয়া উঠিল। বাজারের পার্শ্ববর্তী একটা স্ত্রীলোকের ভবনে এই তাসের আড্ডা হইত। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রের সেখানে গতায়াত করা অভ্যাস হইয়া গেল। প্রথমে এই সকল কথা গোপনে ছিল, কিন্তু ১৮৫৬ সালে চৈত্র মাসে খাতা পত্র নিকাশ করিবার সময় রাজেন্দ্র ব্রজেন্দ্রের অংশীদার জানিতে পারিল যে, জ্ঞানেন্দ্র দোকানের অনেক টাকা ভাঙ্গিয়াছে। কি করিয়াছে? সে টাকা কোথায় গিয়াছে? অনুসন্ধান করিতে করিতে সমুদায় কথা বাহির হইয়া পড়িল। সে জুয়া খেলিয়া সেই টাকা উড়াইয়াছে। ১৮৫৬ সালের বৈশাখ মাসে রাজেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র বাটীতে আসিয়া এই কথা শুনিল ও একদিন তাহাদের পিতার সমক্ষেই এই বিষয় লইয়া তিন ভ্রাতাতে ঘোর বিবাদ হইয়া গেল।

রাজেন্দ্র। গাধা, হতভাগা, পাজি, তোমার ভালর জন্যেই একটা কাজ দেখিয়ে দিয়ে গেলাম, ভিতরে ভিতরে এই কান্ড!

জ্ঞানেন্দ্র। মিছে গালাগালি দিও না বল্‌ছি!

রাজেন্দ্র। গালি দেব না, হাজার বার দেব। জুতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেব জানিস্‌।

জ্ঞানেন্দ্র। উঃ, ঢের জুত দেখেছি।

ব্রজেন্দ্র। বল্‌ রাস্‌কেল, এতগুলো টাকা নিয়ে কি কর্‌লি বল্‌? টাকা অম্‌নি মাঙ্গনা আসে, না? যদি টাকা রোজগার কর্‌তে হতো তবে বুঝ্‌তে পার্‌তিস্‌! বল্‌ না টাকা কি কর্‌লি?

জ্ঞানেন্দ্র নিরুত্তর।

রাজেন্দ্র। জবাব থাক্‌লে ত জবাব দেবে, ওর গুষ্টীর পিন্ডী করেছে, জুয়ো খেলে উড়িয়েছে। মুখটা দেখ না, ইচ্ছে করে এক লাথি মেরে দাঁতগুলো ভেঙ্গে দি; গাধা, নচ্ছার।

জ্ঞানেন্দ্র। আর লাথি মারতে হয় না, তুই গাধা, তুই নচ্ছার।

রাজেন্দ্র। কি এত বড় আস্পর্ধা, দুষ্কর্ম করে আবার চোখ্‌রাঙ্গানি! দেখ্‌বি তবে, (বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া জ্ঞানেন্দ্রের চুলের মুটি ধরিয়া গালে সজোরে চপেটাঘাত)।

জ্ঞানেন্দ্র অতি ইতর লোকের সঙ্গে মিশিয়া থাকে, কুৎসিত স্থানে যে ভাষা সর্বদা ব্যবহার করে, তাহা তাহার অভ্যাসপ্রাপ্ত, সুতরাং সে ক্রোধের অধীন হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে যে অকথ্য ভাষাতে গালাগালি দিল, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই, পিতা, মাতা ও গৃহস্থ রমণীদিগের সাক্ষাতে এই ব্যাপারটা হইল। পিতা মাতা দৌড়িয়া আসিয়া ছাড়াইয়া দিলেন; তাহা না হইলে, দুই ভ্রাতাতে জ্ঞানেন্দ্রকে সে দিন এমন নিগ্রহ করিত, যে তাহাকে কয়েকদিন শয্যা হইতে উঠিতে হইত না।

সকলে বুঝিতে পারিতেছেন এই গালাগালি ও মারামারির পরে আর তাহাকে দোকানের ভার দেওয়া সম্ভব নহে। দুই ভ্রাতাতে বাড়ী হইতে যাইবার সময় জ্ঞানেন্দ্রকে দোকান হইতে বিদায় করিয়া আর একজনকে সে কাজ দিয়া গেল।

হায়! হায়! মানুষ মানুষকে চালাইতে জানে না! মানুষকে কি করিয়া ভাল

করিতে হয়, তাহা সহোদর ভ্রাতাও বুঝিতে পারে না। মানুষকে শাসন করাটা সহজ কিন্তু ভাল করাটা সেরূপ সহজ নহে। হায় প্রেম! তোমার অভাবে পৃথিবী কি পাপেই ডুবিতেছে! প্রেমের শক্তি যাহার নাই সে যেন মানুষকে ভাল করিতে চাহে না। সহোদর ভ্রাতৃদ্বয় যদি জ্ঞানেন্দ্রকে যথার্থ ভাল বাসিত তাহা হইলে বোধ হয় তাহাকে ভাল করিবার জন্য কোনও উপায় আবিষ্কার করিতে পারিত, হয়ত কলিকাতাতে লইয়া চক্ষে চক্ষে রাখিত। কিন্তু প্রেমের অভাবে তাহাদের বুদ্ধি সে পথেই গেল না। এতদিন জ্ঞানেন্দ্রের তবু একটা কাজ ছিল, দোকানে কয়েক ঘণ্টা বসিত, ক্রয়বিক্রয় দেখিত, নিত্য নূতন লোক দেখিত, নূতন কথা শুনিত, কিন্তু এখন সে নিষ্কর্মা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার কর্ম গেল; কিন্তু তাহার অভ্যাসগুলি ত গেল না। গ্রামে একদল নিষ্কর্মা যুবক ছিল, সিদ্ধি খাওয়া, খেঁউর টপ্পা গাইয়া বেড়ান, লোকের উপর উপদ্রব করা, লোকের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে যাওয়া, এতদ্ভিন্ন তাহাদের অন্য কর্ম ছিল না। জ্ঞানেন্দ্র তাহাদের দলে ভর্তি হইল।

এদিকে ভুবনেশ্বরীর ক্লেশের অবধি নাই। সেই যে ১৮৫৪ সালে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে, তৎপরে তিন বৎসর হইয়া গেল, আর পিত্রালয়ে যাইতে পারে নাই। শ্বশ্রূ সর্বদাই তাহার প্রতি খড়্গহস্ত, সর্বদাই তাহাকে রাঁধিতে হয়। বালিকা পিতৃগৃহে কবেই বা রাঁধিয়াছে? রন্ধন ত একটা বিদ্যা; ইহা ত শিক্ষা করা চাই; শিখিবার সময়ে ভুল চুক হওয়া ত অপরিহার্য; কিন্তু মুখুয্যে গৃহিণীর নিকটে ভুল চুকের মাপ নাই। ব্যঞ্জনে যদি লবণটুকু কম হয়, বা ডালে জলটা একটু অধিক হয়, অমনি এমন অভদ্র ভাষাতে গালাগালি দেন, যে শুনিলে কর্ণে হাত দিতে হয়। কেবল গালাগালি নহে, মধ্যে মধ্যে প্রহারও সহ্য করিতে হয়। একদিন বেচারির কি ভুল হইয়াছিল বলিয়া শ্বশ্রূ ধরিয়া উনান কাঁধায় মুখ ঘষিয়া দিলেন। আর একটু হইলে উনানের আগুনে চুলগুলি পুড়িয়া যাইত। বড়বৌ ও মেজবৌএর প্রতি যে শ্বশ্রূ প্রসন্ন তাহা নহে, কিন্তু তাহাদিগকে আর পূর্বের মত নির্যাতন করিতে পারেন না, কারণ তাহারা উভয়েই উপার্জক পুত্রের পত্নী, তাহাদের পতিগণ তাহাদিগকে ভালবাসে; শ্বশ্রূ তাহা জানেন; তাহারাও জানে, যে তাহারা উপার্জক পুত্রের স্ত্রী, সুতরাং শ্বশ্রূ এক গুণ বলিলে দশগুণ শুনাইয়া দেয়। সুতরাং শ্বশ্রূর যত কোপ, যত বিক্রম, যত শাসনশক্তি সমুদায় ভুবনেশ্বরীর অরক্ষিত ক্ষুদ্র মস্তকের উপরে পড়িতেছে। সে যে শ্বশ্রূর নিকট গঞ্জনা পাইয়া পতির নিকট কাঁদিবে তাহারও যো নাই। "স পাপিষ্ঠ স্ততোঽধিকঃ।" সে এই অসহ্য যাতনার প্রতি দৃক্‌পাতও করে না; বরং তাহার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অগ্রেই বলা হইয়াছে জ্ঞানেন্দ্র জুয়া খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে; সে অভ্যাসটী তাহার যায় নাই। পয়সা কোথায় পায়? হতভাগিনী ভুবনেশ্বরীর পিত্রালয় হইতে প্রাপ্ত যা কিছু টাকা হাতে ছিল, সমুদায় লইয়া জুয়াতে উড়াইয়াছে। অবশেষে তাহার বাক্স প্রভৃতি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্বশ্রূ এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিয়া ভুবনেশ্বরীর গহনাগুলি নিজের ঘরে নিজের নিকট রাখিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র নিজে প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদী, সুতরাং সে ভুবনেশ্বরীর সত্যবাদিতাতে বিশ্বাস করিতে পারে না; মনে করে গহনা কোনও স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া মিথ্যা বলিতেছে; মধ্যে মধ্যে সে জন্য তাহাকে গুরুতররূপে প্রহার করে। এক একদিন এত মারে যে সে শয্যা হইতে উঠিতে পারে না। এই যন্ত্রণার মধ্যে

ভুবনেশ্বরীর মুখে রব নাই; সে বুঝিয়াছে যে পিতা মাতা তাহাকে জন্মের মত অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিয়াছেন, ক্লেশ জানাইয়া আর কি হইবে? প্রাণ যত দিন না যায়, এ যাতনা ভুগিতে হইবে। অসহ্য যাতনাতে এক একবার তাহার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; অমনি বৃদ্ধ পিতা-মাতার কথা স্মরণ করিয়া সে উদ্যম হইতে নিরস্ত হইয়াছে।

এইরূপে যাতনাতে দিন যাইতেছে, একদিন জ্ঞানেন্দ্র রাত্রে শয়ন করিতে আসিবার সময় কতকগুলি ছবি আনিয়া তক্তপোষের নীচে এক পার্শ্বে কাপড় চাপা দিয়া রাখিল। ভুবনেশ্বরী জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, "ও সব কথা থাক, কারুকে বলো না, একজন লুকিয়ে রাখবার জন্যে দিয়েছে।" ভুবনেশ্বরী আর অধিক জিজ্ঞাসা করিল না। দুইদিন পরে একদিন বৈকালে জ্ঞানেন্দ্রকে বাঁধিয়া লইয়া পুলিসের জমাদার পাহারাওয়ালা প্রভৃতি খানাতালাসি করিবার জন্য বাড়ীতে উপস্থিত। দেখিয়া মুখুয্যে মহাশয়ের বুদ্ধি শুদ্ধি উড়িয়া গেল। কথাটা এই, সেই ছবিগুলি বাজারের একজন স্ত্রীলোকের। নিষ্কর্মা যুবকদল মধ্যে মধ্যে তাহার ঘরে তাসখেলার আড্ডা করিত; জয়গোপাল নামে একটী যুবক এক দিন রাত্রে ঐ ছবিগুলি চুরি করিয়া আনে। আনিয়া লুকাইয়া রাখিবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রের হাতে দেয়। জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গে কথা ছিল, সেগুলি কলিকাতায় বিক্রয় করা হইবে; বিক্রয় করিয়া যাহা উঠিবে, তাহা দুই জনে ভাগ করিয়া লইবে।

যে রমণীর ছবি চুরি যায়, সে পরদিন প্রাতেই পুলিসে খবর দেয় ও যাহারা তাহার ভবনে সে দিন আসিয়াছিল, তাহাদের নাম জানাইয়া দেয়; এবং ইহাও বলে যে জয়গোপালের উপরে তাহার বড় সন্দেহ। পুলিস প্রথমে জয়গোপালকে ধরে; সে উড়াইয়া দেয়; কিন্তু দুইদিন অনুসন্ধানে এমন কিছু কিছু কথা বাহির হইয়া পড়ে যাহাতে পুলিশ তাহাকে একেবারে ধরিয়া বসে। তখন সে নিজে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রের উপরে সেই দোষের আরোপ করে, এবং প্রমাণও দেয় যে জ্ঞানেন্দ্র গোপনে তাহার একখানা ছবি একজনকে বেচিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, বাস্তবিক জ্ঞানেন্দ্র একখানা ছবি একজনকে আট আনাতে বেচিয়াছে। তখন আর পুলিসের সন্দেহ রহিল না। জ্ঞানেন্দ্রকে একেবারে গ্রেপ্তার করিল। কিন্তু জয়গোপালকে ছাড়িল না। আজ জ্ঞানেন্দ্র পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হইয়া নিজ ভবনে উপস্থিত। আর প্রমাণের প্রয়োজন কি? সেই সমুদায় ছবি তাহার ঘরের তক্তপোষের নিম্নদেশ হইতে বাহির হইল। মাল সমেত জ্ঞানেন্দ্র চালান হইয়া থানাতে গেল। অথচ যে রাত্রে চুরি হয় সে দিন জ্ঞানেন্দ্র গ্রামেই ছিল না; স্থানান্তরে গিয়াছিল। জয়গোপাল তাহাকে ছবিগুলি পরদিন দিয়াছিল।

ভাল মানুষ বৃদ্ধ রামরতন মুখুয্যের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, আইন আদালতের ধার কি ধারেন, অশরণ হইয়া গ্রামের দুই একজন বিষয়ী লোকের শরণাপন্ন হইলেন; সকলেই বলিলেন, নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নহে। সে যে চুরি করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ উহার স্বভাব-চরিত্র পূর্বাবধিই মন্দ। সে যে সে রাত্রে গ্রামে ছিল না, সে কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। এই যুবককে সাহায্য করিবার জন্য কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। মুখুয্যে মহাশয় কলিকাতাতে পুত্রদ্বয়কে পত্র লিখিলেন; তাহারা লিখিয়া পাঠাইল, "যেমন কর্ম তেমনি ফল; জেলে যাক্; আমাদের কিছু দুঃখ নেই।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সাজা যাহা হইবার

তাহা ত পরে হইবে, এখন ত বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা দেখিতে হয়। কে অর্থ দেয়, কে পরামর্শ দেয়, কে সাহায্য করে? ব্রাহ্মণের তখনকার ব্যগ্রতা ও কাতর ভাব দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

শ্বশুর ভাল মানুষ বলিয়া তাঁহার প্রতি ভুবনেশ্বরীর একটু শ্রদ্ধা ছিল। সে শ্বশুরকে বলিল,—"ঠাকুর কেন ছুটিয়া বেড়ান, আমার ত গহনা আছে, বিক্রী করে মকদ্দমার খরচ করুন।" এ প্রস্তাবটা শ্বশুরেরও মনঃপূত হইল; কারণ তদ্ভিন্ন আর উপায় নাই। ভুবনেশ্বরীর গহনা বাঁধা দিয়া মকদ্দমার খরচ চলিল। বিচারে জ্ঞানেন্দ্র চুরির প্রধান অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইল বটে, কিন্তু চোরাই মাল গ্রহণ ও বিক্রয় করা অপরাধে একমাস কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হইল; এবং জয়গোপালের তিন মাস কয়েদ হইল। ইহা গেল ১৮৫৭ সালের চৈত্র মাসের কথা।

জ্ঞানেন্দ্র কারাগার হইতে আরও বিকৃত হইয়া আসিল। পূর্বে তাহার যে একটু লজ্জা সরম ছিল, এবারে তাহা একেবারেই গেল। এখন প্রকাশ্যভাবে বাজারে জুয়ার আড্ডাতে যাতায়াত আরম্ভ করিল; এবং পূর্বে যে দোষ ছিল না, অথবা থাকিলেও জানিতে পারা যায় নাই, এবারে তাহাও ধরিল; সে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিল। অগ্রে সে যাহাই করুক, প্রায় প্রতি রাত্রে গৃহে আসিয়া নিদ্রা যাইত, এখন তাহাও গেল; মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে আর বাড়ীতে থাকে না। যে দিন আসে তাহার দৌরাত্ম্যে পরিবারস্থ সকলের মনে হয়, না আসিলেই ভাল। অপর দিকে তাহার মেজাজ অতিশয় কর্কশ ও উদ্ধত হইয়া উঠিল; অতি সামান্য কারণে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়, এবং ক্রুদ্ধ হইলে জ্ঞান থাকে না। ভুবনেশ্বরীর কি যন্ত্রণাই আরম্ভ হইল! সর্বদা সশঙ্কিত, কখন কি ঘটে। যে রাত্রে জ্ঞানেন্দ্র বাড়ীতে আসে, মাতাল হইয়া আসে, ও ভুবনকে অশেষ নিগ্রহ করে, এবং এরূপ অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয় যে সে জন্মে তাহা কখনও শুনে নাই। কখন কখনও সে ভয় দেখায় বাড়ীর সকলকে কাটিয়া ফাঁসি যাইবে।

দিন দিন এই অত্যাচার এত অসহ্য হইয়া উঠিল যে, আশঙ্কা ও মনের ক্লেশে ভুবনেশ্বরীর শরীর ভাঙিগয়া যাইতে লাগিল। সহস্র কষ্টেও সে এতদিন পিতা-মাতাকে কষ্টের কথা জানায় নাই। সেই যে ১৮৫৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে, তদবধি আর একবারও পিত্রালয়ে যাইতে পারে নাই। কয়েকবার তাহাকে লইবার জন্য লোক আসিয়াছিল, শ্বশুর গালাগালি দিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে আর ভুবনেশ্বরীকে পিত্রালয়ের মুখ দেখিতে দিবেন না। ভুবন সমুদায় সহ্য করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র দিন দিন যে মূর্তি ধরিতেছে তাহা দেখিয়া তাহার চিত্তে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। সে পিতামাতার নিকটে পলাইতে পারিলে বাঁচে, এই প্রকার মনে হইতেছে। অনেক দিনের পর পিতামাতাকে নিজের দুঃখের সংবাদ দিবার জন্য মন ব্যস্ত হইতেছে। কিন্তু কি করিয়া সংবাদ দিবে? নিজে লেখাপড়া জানে না, যে চিঠি লিখিবে। গৃহস্থের কুলবধূ সংবাদ পায় না, উলোর কেহ নশিপুরের দিকে যায় কিনা। হাতে একটী পয়সা নাই, যে কোনও লোককে দিয়া সংবাদ পাঠায়, আর শ্বশুর অজ্ঞাতসারেই বা তাহা কিরূপে করে? জানিতে পারিলে শ্বশ্রূ সাজার কিছু বাকি রাখিবেন না। ভুবনেশ্বরী ভাবিয়া ভাবিয়া কূল কিনারা কিছুই দেখিল না। অবশেষে জ্যেষ্ঠা বধূ এক সন্ধান বলিয়া দিলেন। যদু নামে

একটী বালক সর্বদা তাঁহাদের বাড়ীতে আসিত। সে স্কুলে পড়ে। বড়বৌ পরামর্শ দিলেন যে সেই যদুর দ্বারা গোপনে পত্র লিখিয়া ডাকে ফেলিয়া দিলে নশিপুরের লোকে পাইতে পারেন। বড়বৌ এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী হইয়া একদিন রবিবার বৈকালে, গৃহিণীর অনুপস্থিতিকালে তাঁহার নিজের ঘরে যদুকে ডাকিয়া ভুবনেশ্বরীর জবানি পত্র লিখাইলেন। সে পত্র পরদিন যদুর হাত দিয়া ডাকে দেওয়া হইবে, স্থির রহিল। একথা যে শ্বশ্রূর কাণে কি প্রকারে গেল, তাহা বলা যায় না। তিনি সন্ধ্যার সময় ভুবনেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদুকে বৈকালে কেন ডাকান হয়েছিল?"

ভুবন। সে ত রোজই আসে।

গৃহিণী। সে ত জানি। আজ তাকে ডাকিয়ে আনা হয়েছিল কিনা?

ভুবন। (বিশ্বনাথ তর্কভূষণের কন্যা মিথ্যা কথা কখনও বলে নাই।) (ধীর-ভাবে) হাঁ হয়েছিল।

গৃহিণী। কেন?

ভুবন। একখানা চিঠি লেখবার জন্যে।

গৃহিণী। কাকে?

ভুবন। বাবাকে।

গৃহিণী। আ মরি, মরি, বাপের বাড়ী যাবার সাধটা বুঝি আবার বেড়ে উঠেছে? তা মনে করো না, সে গুড়ে বালি। কোথায় সে চিঠি?

ভুবন। আমার কাছে আছে. কাল ডাকে দিতে হবে।

গৃহিণী। আর ডাকে দিয়ে কাজ নি, চিঠিখানা আন দেখি।

ভুবনেশ্বরী বিরক্তিসহকারে চিঠিখানা আনিয়া দিলেন। গৃহিণী বলিলেন. "থাক্ জ্ঞানেন্দ্র এলে পড়িয়ে দেখ্তে হবে।" ভুবনেশ্বরী জানিল, সে দিন একটা ফাঁড়ার দিন।

যথাসময়ে জ্ঞানেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। আজ সে মাতাল হইয়া আসে নাই বটে, কিন্তু জুয়া খেলিতে গিয়া হারিয়াই আসুক, বা কাহারও নিকট অপমানিত হইয়াই আসুক, তাহার পদার্পণেই বুঝিতে পারা গেল, সে দিন তাহার মেজাজ অতিশয় গরম। মানুষের দয়া মায়া থাকিলে, এমন সময়ে, এমন ব্যক্তিকে আর সে চিঠি দেখায় না; কিন্তু মুখুয্যে গৃহিণীর বধূদিগের প্রতি সে দয়া মায়া নাই: সুতরাং বাড়ীতে প্রবেশ মাত্র সে চিঠিখানি তিনি জ্ঞানেন্দ্রকে পড়িতে দিলেন। অবশ্য ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে তাহাতে জ্ঞানেন্দ্রের স্বভাব চরিত্রের কথা কিছু কিছু ছিল। সেই দুর্দান্ত দানবসমান যুবক তাহা দেখিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারে? একখানি প্রকাণ্ড চেলা কাঠ লইয়া নিজ গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। গৃহিণী "ওরে মারিস্নে মারিস্নে" বলিয়া সঙ্গে চলিলেন বটে, কিন্তু তিনি গিয়া ধরিবার পূর্বেই প্রহার আরম্ভ হইয়াছে! ভুবনেশ্বরী প্রথমে হস্তের দ্বারা উদ্যত কাষ্ঠের আঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সজোরে সেই কাষ্ঠ যখন তাহার মস্তকের উপর পড়িল. তখন কেবল একবার—"মাঁ—আঁ—আঁ" করিয়া একটী শব্দ হইল, তৎপরেই নীরব। গৃহিণী গিয়া দেখেন ভুবনেশ্বরী অচেতন হইয়া যে তক্তপোষে বসিয়াছিল তাহাতেই পড়িয়া গিয়াছে. রক্তে তক্তপোষ ভাসিয়া যাইতেছে। গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওরে গেছেরে গেছে. ও হতভাগা কর্লি কি? খুন করে ফেল্লি।" এই কথা শুনিয়া

বড়বৌ, মেজবৌ উভয়ে ছুটিয়া আসিল। জ্ঞানেন্দ্র তখনও ক্রোধে ফুলিতেছে। ক্রমে জল ঢাল, জল ঢাল, বাতাস কর, বাতাস কর, বলিয়া গোল পড়িয়া গেল। পাশের বাড়ীর লোক দৌড়িয়া আসিল; মুখুয্যে মহাশয় কোথায় বেড়াইতে গিয়াছেন, তাঁহাকে একজন দৌড়িয়া ডাকিতে গেল; মুখুয্যে মহাশয় ছুটিয়া আসিলেন; নিকটে একজন লোক ছিলেন; তিনি একটু ডাক্তারি জানিতেন; তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইল। সে রাত্রে শুশ্রূষা যথেষ্ট হইল; কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যে ভুবনের চেতনা হইল না। পরদিন প্রাতে চেতনা হইল, কিন্তু দিন শেষ না হইতে হইতে জ্বর দেখা দিল। একে তাহার শরীর অনেক দিন হইতে দুর্বল হইতেছিল, তাহার উপরে এই আঘাত, তাহার দেহে আর সহিল না। জ্বর দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মুখুয্যে মহাশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, তাঁহার সাধ্যে যাহা হয়, এবং গ্রাম্য ডাক্তারের দ্বারা যত দূর হইতে পারে, করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ দিবসে শঙ্কর নশিপুর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কে তাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়াছে তাহা বলিলেন না। পরে জানা গেল, যে নশিপুরের একটী যুবক উলোতে নিজ শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল, পরদিন প্রাতে এই আঘাতের সংবাদ পাড়ায় ছড়াইয়া পড়িলে সে সেই দিনেই নশিপুরে শঙ্করকে ও কলিকাতায় গিরিশকে সংবাদ দিয়াছিল। শঙ্কর আসিয়াই ভুবনেশ্বরীর চিকিৎসা করাইবার জন্য রাণাঘাট হইতে একজন ভাল ডাক্তার আনাইলেন ও চিকিৎসাতে নিযুক্ত হইলেন। ষষ্ঠ দিবসে কলিকাতা হইতে হরচন্দ্র ও গিরিশ একজন ডাক্তার সঙ্গে করিয়া উপস্থিত। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন জ্বর একটু কমিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে যে মূর্চ্ছা হইতেছিল, তাহা গিয়াছে। দুই একদিন পরেই সকলে ভুবনেশ্বরীকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া স্থির করিলেন। মুখুয্যে মহাশয় তখনি প্রস্তুত, কিন্তু গৃহিণীর অভিপ্রায় নয়। তিনি অনেক প্রকার ওজর আপত্তি করিতে লাগিলেন, বলিলেন,- "এখন ত সেরে উঠ্‌ছে, আবার টানা হেঁচড়া করে নিয়ে যাওয়া কেন?" কিন্তু ভুবনেশ্বরীর আত্মীয়েরা কোনও আপত্তিই শুনিলেন না। স্থির হইল যে যখন ডাক্তার ও ঔষধ সঙ্গেই আছে, তখন নৌকায় করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেলে ভাল হয়। তাহাতে কয়েক দিন বিলম্ব হইবে বটে, কিন্তু পথে নৌকাতে কয়েক দিন থাকাতে-উপকার হইতে পারে। তদনুসারে নৌকা করা হইল; যাত্রার সময় স্থিব হইল। এত যে ব্যাপার হইতেছে, জ্ঞানেন্দ্রের দেখা সাক্ষাৎ নাই। সে কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! যাত্রা করিবার সময়ে বোধ হয় কেহ তাহাকে তামাসা করিয়া বলিয়া থাকিবে, "তুই এখানে বেড়াচ্ছিস, ওদিকে তোর স্ত্রীকে নিয়ে গেল।" সে এই কথা শ্রবণে দৌড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই ত হাঁক ডাক আরম্ভ করিল, ও যাঁহারা ভুবনেশ্বরীকে পাল্‌কীতে তুলিবার যোগাড় করিতেছেন, তাঁহাদের হাতে ধরিয়া বাধা দিতে লাগিল। ইহাতে কুপিত হইয়া হরচন্দ্র সজোরে তাহার নাকের উপরে এক ঘুসি মারিলেন। তাহাতে দুই নাক দিয়া দর দর ধারে রক্তধারা বহিতে লাগিল। সে মুখে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; গৃহিণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; নশিপুরের লোকেরা তাহার কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না; ভুবনেশ্বরীকে পাল্‌কীতে তুলিয়া নৌকাতে লইয়া গেলেন। এ ঘটনা আশ্বিনের প্রথমে সংঘটিত হইল। নৌকা কলিকাতায় পেঁৗছিতে পেঁৗছিতে ভুবনেশ্বরী অনেক সুস্থ হইল।

১৮৫৭ সালের পূজাও নশিপুরের বাড়ীতে মহা সমারোহে সম্পন্ন হইল। ভুবনেশ্বরী যে ভাবে পিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের অন্তরে যে কি ক্লেশ হইয়াছে, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন; তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ভুবন যখন কলিকাতা হইতে নশিপুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন তাহার আকৃতি দেখিয়া ও তাহার মুখে তাহার যাতনার সমুদায় বিবরণ শুনিয়া সেই ধীর গম্ভীর বৃদ্ধেরও চক্ষে জল পড়িয়াছিল। যাহা হউক ভুবন যে বাঁচিয়া আসিয়াছে এজন্য তিনি ঈশ্বরকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করিলেন। সুতরাং দুই মাস পরে যখন শুনিলেন যে জ্ঞানেন্দ্রের পিতামাতা তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ করিয়া পুত্রের আবার একটী বিবাহ দিয়াছে, তখন তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন, "যাক্ আপদ গেল। কুলীনের কন্যারা ত চিরজীবন পিত্রালয়েই থাকে, হিন্দুর ঘরের বিধবারা ত চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য করে, ভুবন না হয় তাই করিবে।" ভুবনের জন্য তাঁহার প্রাণে যেমন একটু ক্লেশ থাকিল, তেমনি একটী সুখের সংবাদ পাইয়া একটু সুখও হইল। পূজার পূর্বেই বারাণসী হইতে সংবাদ আসিল, যে গৌরীপতি বেদবেদান্তে পারদর্শী হইয়া সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন: তাঁহার যশঃসৌরভে কাশীধাম আমোদিত হইয়াছে; তিনি তথাকার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়াছেন, এবং কাশীরাজ তাঁহাকে নিজ সভাপণ্ডিতের পদে বরণ করিয়াছেন।

এই সংবাদ তর্কভূষণ মহাশয়কে অতিশয় সুখী করিল। অনেক দিন হইতে তাঁহার মনে শেষ দশাটা কাশীতে যাপন করিবার ইচ্ছা আছে। এবারে বুঝি সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। গৌরীপতি অনেক আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে ও গৃহিণীকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। গৌরীপতির অনুরোধে তাঁহার মনের সংকল্প দৃঢ় করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্বে তাঁহার কিঞ্চিৎ কার্য অবশিষ্ট আছে। তিনি অনেক দিন হইতে একটী ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। বর্ষে বর্ষে গ্রীষ্মের সময় জলাভাবে তাঁহার বাসগ্রামের চতুষ্পার্শ্বের চাষা গ্রামের লোকের কিরূপ ক্লেশ হয়, তাহা তিনি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। অনেক দিন হইতে তাঁহার মনে এই বাসনা জন্মিয়াছে, যে একটু অর্থের সচ্ছল হইলেই মাঠের মধ্যে একটী বড় পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা ঐ সকল গ্রামবাসী দরিদ্র লোক-দিগের জন্য উৎসর্গ করিবেন। এবার পূজা শেষ হইলেই সেই কার্যে হস্তার্পণ করিলেন। পাঁচখানি গ্রামের মধ্যস্থিত একটা মাঠের ধারে দশ বিঘা পতিত জমি ক্রয় করিলেন। শীতকালে জমি একটু শুকাইবা মাত্র খনন কার্য আরম্ভ হইল।

ওদিকে খনন কার্য আরম্ভ হইল, এদিকে কালীর মন্দিরে তদর্থ বিশেষ স্বস্ত্যয়ন চলিল। চৈত্র মাসের মধ্যে কার্য এক প্রকার শেষ হইল। বৈশাখের প্রারম্ভে তর্কভূষণ মহাশয় উক্ত ভূমিখণ্ডকে প্রাচীরের দ্বারা ঘিরিয়া একটী উদ্যান করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সে বিষয়ে একটু গোলযোগ ছিল। তিনি যে জমি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার উপর দিয়া বহু বৎসর পূর্ব হইতে লোকে গতায়াত করিত। জমির ভাব গতিক দেখিলে বোধ হয়, বহুকাল পূর্বে তদুপরি কাহারও বসত বাটী ছিল। কিন্তু অন্যূন ২৫।৩০ বৎসর কাল লোকে ঐ ভূমিখণ্ডকে পতিত অবস্থাতে দেখিয়া আসিতেছে, ও তাহার উপর দিয়া গতায়াত করিতেছে।

কাজেই ঐ ভূমিকে প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করিবার সময় তাঁহাকে একটু ভাবিতে হইল। অবশেষে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া লোকের গতায়াত করিবার জন্য কিছু জমি ফেলিয়া রাখিবেন। কিন্তু দেখিলেন যে দুই হাতের অধিক জমি রাখিতে গেলে প্রাচীরটীকে বাঁকাইয়া দিতে হয়, অথচ দুই হাত মাত্র মাত্র জমি থাকিলে লোকের গতায়াতের পক্ষে সুবিধা হইবে না। অবশেষে নিজ জমির পার্শ্বস্থ ভূমির অধিকারীকে ডাকাইয়া তাহার ভূমি হইতে দুই হাত ভূমি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলেন। সে ব্যক্তি বলিল, "সে কি কথা, আপনি এত বড় একটা বাগান ও পুষ্করিণী লোকের জন্য দিলেন, আর আমি দুই হাত জমি দিতে পারব না, তার আবার দাম নিতে হবে? আমি দুই হাত জমি ছেড়ে দেব। দাম চাই না।" তর্কভূষণ মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, সাদা সিদা লোক, তিনি তাহার মৌখিক কথা অবলম্বন করিয়াই কার্য করিতে লাগিলেন। বিষয়ী লোক হইলে ঐ ব্যক্তির কথার উপরে নির্ভর না করিয়া একটা পাকা লেখা পড়া করাইয়া লইত। কিন্তু তাঁহার সরল বুদ্ধিতে তাহা যোগাইল না। কেহ কেহ পাকা লেখাপড়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিলেন,—"সে পরে হবে, তাড়াতাড়ি কি, ভদ্রলোকের ছেলে দুই হাত জমি দিয়ে কি আবার না বলবে?" তৎপরে তিনি সেই পথ দিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের যে সকল লোক গতায়াত করিত তাহাদের অনেককে ডাকাইয়া ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সকলেই আনন্দের সহিত তাঁহার পরামর্শে সম্মতি জানাইল। সুতরাং দুই হাত জমি ফেলিয়া রাখিয়া প্রাচীর গাঁথা আরম্ভ হইল।

এদিকে রামহরি মিত্র ও চিমে ঘোষের নিকট এই সংবাদ পেঁছিল, যে তর্কভূষণ মাঠের মধ্যে এক বাগান করিতেছেন, তাহাতে সাধারণের রাস্তা ঘিরিয়া লইয়াছেন, ও তৎপরিবর্তে প্রাচীরের পাশ দিয়া রাস্তা দিয়াছেন। অমনি তাহারা এ বিষয়ে লাগিয়া গেল। যে ব্যক্তি রাস্তার জন্য দুই হাত জমি দিয়াছিল, তাহাকে ডাকাইয়া প্রথমে তিরস্কার, পরে প্ররোচনা দ্বারা তাহাকে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল। সে ব্যক্তি প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না, পরে জমিদার বাবুর ভয়ে ও আগ্রহে স্বীকৃত হইল। কি কি করিতে হইবে, কে মকদ্দমা উপস্থিত করিবে, সে জন্য কি কি জোগাড় করা আবশ্যক, প্রভৃতি সমুদায় বিষয় স্থির হইয়া রহিল।

তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রাচীরও শেষ হইয়া গেল, আর অপর দিকে সেই ব্যক্তি বেড়া দিয়া নিজের জমি ঘিরিতে আরম্ভ করিল! তর্কভূষণ মহাশয় সংবাদ পাইয়া ঐ জমির মালিককে পুনরায় ডাকাইলেন, এবং এরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল,—"আমি পরে ভেবে দেখলাম ও জমি ফেলে রাখলে আমার পোষাবে না।" তর্কভূষণ মহাশয় নিরুপায় হইয়া ঐ দুই হাত পরিমাণ ভূমি খণ্ডের দ্বিগুণ দাম দিতে চাহিলেন। সে কিছুতেই বিক্রয় করিতে সম্মত হইল না। বলিল, "আজ্ঞে, এ অনুরোধ করবেন না, আমি জমি বেচতে পারব না। দিতে পারতাম ত অমনি দিতাম। কিন্তু দিতে পারব না।" এই বলিয়া চলিয়া গেল।

ক্রোধে তর্কভূষণ মহাশয়ের শরীর ও মন আন্দোলিত হইতে লাগিল; কিন্তু কি করিবেন, নিরুপায়। মনে করিলেন, যাহাদের উপকারার্থে ঐ বাগান ও পুষ্করিণী উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এবং

ঐ দুই হস্ত পরিমাণ পথ দিয়াই কোনও প্রকারে গতায়াত করিবে। তাঁহার পুরাতন শত্রুগণ যে পশ্চাতে লাগিয়াছে, তখনও তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাহা হইলে এরূপ আশা করিতেন না। বৈশাখমাসের অর্ধেক অতীত হইতে না হইতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কয়েকজন প্রজা আদালতে তর্কভূষণ মহাশয়ের নামে এই বলিয়া নালিশ উপস্থিত করিল, যে তিনি সাধারণের বহুদিনের চলিবার পথ ঘিরিয়া নিজের বাগানে লইয়াছেন। তিনি উত্তর দিলেন যে, প্রাচীরের পার্শ্বে রাস্তার জন্য জমি রাখিয়া পাশ্ববর্তী গ্রামের প্রজাদের সম্মতিক্রমে ঘিরিয়া লওয়া হইয়াছে। বাদিগণ উত্তর করিল, যে রাস্তা দিয়াছেন সে রাস্তাতে যাইতে হইলে অনেক বাঁকিয়া যাইতে হয়, বিশেষতঃ যে জমি দিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট নহে, গরু, হাল, খড়ের বোঝা লইয়া সে রাস্তা দিয়া যাওয়া সম্ভব নহে।

বিচারক তর্কভূষণ মহাশয়ের সদভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তাঁহার হাত কি? সাধারণের এতকালের যাতায়াতের রাস্তা বাহাল রাখিতে তিনি আইনানুসারে বাধ্য। অবশেষে বাদিদের সম্মতিক্রমে এই রায় হইল, যে তর্কভূষণ মহাশয়কে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া লইয়া আরও দুই হাত জমি রাস্তার জন্য দিতে হইবে।

যে দিন এই মকদ্দমাতে বাদীদিগের জয় হইল, সে দিন ঢাক ও কাড়ার শব্দে নশিপুর গ্রাম কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর একদল লোক তর্কভূষণ মহাশয়ের ভবনের দ্বার দিয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে, তাঁহাকে নাম ধরিয়া ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিতে করিতে চলিল। শঙ্কর দেখিলেন সে দলের মধ্যে চিমে ঘোষ ও জহরলাল অগ্রগণ্য। দলের মধ্যে কেহ শিয়াল ডাকিতেছে; কেহ বিড়াল ডাকিতেছে; কেহ কুক্কুরবৎ চীৎকার করিতেছে; এবং কেহ কেহ বিকৃত অঙ্গভঙ্গী পূর্বক নাচিয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের ও তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের নামে ছড়া গাইতেছে। তর্কভূষণ মহাশয় না হইলে, সে দিন অন্য কেহ শঙ্করকে ও ছাত্রগণকে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন,—"নীচের সঙ্গে তোমরাও নীচ হবে? উহাদের যেরূপ প্রকৃতি সেইরূপ আচরণ করছে, করুক।" কাজেই সকলকে নিরস্ত হইতে হইল। কিন্তু যে রক্তারক্তি নিবারণের আশায় তিনি স্বীয় গৃহের যুবকগণকে নিষেধ করিয়া রাখিলেন, সে রক্তারক্তি নিবারণ হইল না। উক্তদল তাঁহার ভবন অতিক্রম করিতে না করিতে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামার কলরব শ্রুত হইল। যেন বোধ হইল মার মার শব্দ করিয়া কোথা হইতে একদল লোক ছুটিয়া আসিয়া পড়িল। এ বাড়ীর সকলে দেখিতে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয় নিষেধ করিয়া রাখিলেন। পরে শুনিলেন হাঁসের দলের যুবকগণ ইহাদের গর্হিতাচরণের কথা শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে চিমু ঘোষ ও জহরলাল প্রভৃতির ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। চিমু ও জহরলাল উভয়েই গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

পরদিন প্রাতেই সংবাদ আসিল যে, প্রতিপক্ষগণ রাত্রিকালের মধ্যে মাঠের বাগানের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, প্রাচীরের ইট্ পুকুরের মধ্যে ফেলিয়াছে, গাছ পালা যাহা বসান হইয়াছিল, সমুদায় নষ্ট করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া শঙ্কর ক্রোধে অগ্নি সমান হইয়া গেলেন; যে যে লোক সে কাজ করিয়াছে, তাহা অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন; এবং তাহাদের নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় তাহাকে নিবারণ করিয়া রাখিলেন; বলিলেন,—"সেই ত আমাদের পাঁচীর ভেঙ্গে গাঁথতেই হোত, ওদের

ছোট মন, এইটুকু ক্ষতি করে যদি সন্তুষ্ট হয় হোক।" আবার প্রাচীর সরাইয়া দুইহাত জমি রাখিয়া গাঁথা হইল। তাহাতে প্রাচীরটী বাঁকা হইয়া গেল, কিন্তু উপায় কি?

তর্কভূষণ মহাশয় স্বীয় পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকে মামলা মকদ্দমা হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিলেন বটে, কিন্তু মামলার হাত এড়াইতে পারিলেন না। তাঁহার ভবনের সম্মুখে যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছিল, যাহার ত্রিসীমার মধ্যে তিনি ছিলেন না, সেই দাঙ্গার জন্য তাঁহাকে ফৌজদারী আদালতে আসামীশ্রেণী-গণ্য হইতে হইল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শেষ দশাতে এ কি নিগ্রহ! ব্যাপারটা এই। দাঙ্গার পরেই জমিদার রামহরি মিত্র মনে করিলেন উত্তম হইয়াছে, তিনি এক গুলিতে দুইটী পাখী মারিবেন। হাঁসের দলের প্রতি তাঁহার আক্রোশ ছিল। পূর্বে জহরলালের পথপার্শ্বে অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকার যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ঐ হাঁসের দলের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল। তাহারাই রজনীর অন্ধকারে জহরলালের গলে বস্ত্র দিয়া প্রহার করিয়াছিল। জমিদার বাবু বহুদিন পরে অনুসন্ধান দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তদবধি এই দলের প্রতি তিনি জাতক্রোধ হইয়া রহিয়াছেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া থাকিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। বিষয়ী লোকের কাণে পাক দিয়া দুই সহস্র টাকা লওয়া, আর সর্পের লেজ ছিঁড়িয়া লওয়া, দুইই এক কথা। সেই দুই হাজার টাকার কথা রামহরি কখনও ভুলিবেন না; সুতরাং দাঙ্গার পরেই তিনি ভাবিলেন, একসঙ্গে দুই শত্রু দলন করিবেন। অতএব জহরলালকে বাদী এবং তর্কভূষণ মহাশয়, শঙ্কর ও হাঁসের দলের অগ্রণী স্বরূপ চারি ব্যক্তিকে প্রতিবাদী করিয়া, ফৌজদারীতে মকদ্দমা রুজু করিয়া দিলেন, এবং চিমু ঘোষকে ডাকাইয়া তাহার পক্ষের আর একটী মকদ্দমা হাতে রাখিলেন। এটা কিছু না হইলে সেটা ধরা হইবে। যে কোন প্রকারে হৌক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জব্দ করিতে হইবে।

মকদ্দমার সমন পাইয়া তর্কভূষণ মহাশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন, তাঁহার নামে নালিশ কি প্রকারে হইল? তিনি ত বাড়ী হইতে বাহির হন নাই। কোন্ সাক্ষী বলিতে পারিবে যে তিনি দাঙ্গার মধ্যে ছিলেন? কিন্তু এরূপ চিন্তা করাই বৃথা! পল্লীগ্রামের এই জমিদার বাবুদের অসাধ্য কর্ম নাই। তাঁহারা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, দিনকে রাত, রাতকে দিন করিতে পারেন। সাক্ষীরই বা অপ্রতুল কি? ইংরাজের আদালতের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এমন একদল লোকের সৃষ্টি হইয়াছে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যাহাদের ব্যবসায়। বিশেষ, বাবুদের অনুরোধে গ্রামের কোন্ লোক না মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে? যাহা হৌক, তর্কভূষণ মহাশয় সমন পাইয়া কিছুই চঞ্চলতা প্রকাশ করিলেন না; ধীর ভাবে একটু হাসিয়া বলিলেন,—"ধর্মভয় যাহাদের নাই, তাহারা করিতে পারে না এমন গর্হিত কর্মই নাই।"

ওদিকে গ্রামের লোকে যখন জানিতে পারিল যে, বিনা অপরাধে তর্কভূষণ মহাশয়কে ফৌজদারী আদালতে আসামী করিয়াছে, তখন আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ক্ষেপিয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিল। সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ দলে দলে জমিদার বাবুর নিকটে গিয়া এমন কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের বাড়ীতে সর্বদাই চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের চাষা লোকের ভিড়। তাহারা জানিতে আসিয়াছে এ সংবাদ সত্য কি না? অবশেষে দলে দলে প্রজা জমিদার বাবুর কাছারিতে গিয়া এমন কাজ

হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইল। রামহরি কাহারও কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না; উপহাস করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করিলেন, এবং গরিব প্রজাদিগকে কটূক্তি করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

যথাসময়ে আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হইল। তর্কভূষণ মহাশয় যখন এজলাসে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার প্রশান্ত, গম্ভীর ও পবিত্র মুখশ্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কাহারও অনুভব করিতে বাকি থাকিল না যে, তিনি সে অভিযোগের পাত্র নহেন। তাঁহার নাম সকলেই শুনিয়াছিল, সুতরাং আদালতের মকদ্দমা-ব্যবসায়ী লোকদিগেরও কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা পাকা জালিয়াত, মিথ্যাসাক্ষ্য-ব্যবসায়ী, অনেকবার অনেক পাকা উকীলের জেরাতে উত্তীর্ণ হইয়াছে; তথাপি, কি আশ্চর্য চরিত্রবান্ লোকের চরিত্রের প্রভাব! তাহারা একে আর বলিয়া, হাস্য-ভাজন হইয়া, আদালত হইতে বাহির হইয়া গেল। এদিকে নশিপুর গ্রামের অবস্থা এরূপ যে সাক্ষীরা কয়েকদিন আর গ্রামে ফিরিতে সাহসী হইল না। তর্কভূষণ মহাশয় সপুত্রে নিরপরাধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। লোকের আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু তাঁহাকে যে বৃদ্ধবয়সে ফৌজদারী আদালতে আসামী হইয়া দাঁড়াইতে হইল, ইহা ভাবিয়া অনেকে অশ্রুপাত করিল। হাঁসের দলের অগ্রণীদিগের কিঞ্চিৎ সাজা হইল।

গ্রামের লোকের মনের ভাব দেখিয়া চিমু ঘোষ আর সংকল্পিত মকদ্দমা তুলিতে সাহসী হইল না।

এই সকল গোলমাল চুকিয়া গেলেই তর্কভূষণ মহাশয় কাশীযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন রাত্রে শঙ্করকে বিষয়-বিভব সংক্রান্ত সমুদায় পরামর্শ দিলেন; গৃহ ও পরিবার রক্ষাদি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন; কৈলাস চক্রবর্তীর টাকা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন; দাসদাসীদিগকে প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক বিতরণ করিতে লাগিলেন; গ্রামের যাহাদের বাটীতে কখনও পদার্পণ করেন নাই, তাহাদেরও গৃহে গিয়া বিদায় লইলেন; সমাগত চাষা লোকদিগকে মিষ্ট ভাষায় তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। তৎপরে পূজার পূর্বে শুভদিনে গৃহিণী, ভুবনেশ্বরী, ও সেজবৌকে সঙ্গে লইয়া কাশীযাত্রা করিলেন। সেদিন গ্রামের অর্ধেক লোক কাঁদিতে কাঁদিতে ও চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রায় এক ক্রোশ পথ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। বিশ্বনাথ তর্কভূষণ এ জীবনের মত বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, নশিপুর গ্রাম মধ্যমণিহীন ছিন্ন মালার ন্যায় পড়িয়া রহিল।

তর্কভূষণ মহাশয়ের কাশীযাত্রার অল্পদিন পরেই শিবচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ভবনে যে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। তিনি যে বিজয়া ও হরচন্দ্রের প্রতি বড় প্রসন্ন নহেন, তাহা সকলেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারিয়াছেন। পণ্ডু ও গোবিন্দকে তাড়াইয়া দেওয়ার অন্যতর উদ্দেশ্য এই, উভয়কে দমন করা। কিন্তু তাহার বিপরীত ফল ফলিয়াছে। নবরত্ন সভার অগ্রগণ্য-ব্যক্তিদিগের সহিত বিজয়া ও হরচন্দ্র উভয়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। কলিকাতাতে আসার পর এই কয়েক বৎসরে বিজয়ার মনে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বাপেক্ষা তাঁহার প্রকৃতির গাম্ভীর্য ও চিন্তাশীলতা কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে। ঈশ্বরারাধনা তাঁহার নিত্যকর্ম হইয়াছে। তাঁহার মুখের উপর ভক্তির গাঢ়তা ও

হৃদয়ের পবিত্রতাজনিত এমন এক প্রকার আভা পড়িয়াছে, যাহা দেখিলেই স্বতঃই সম্ভ্রমের উদয় হয়। যে সময়ের কথা বলিতেছি, এই সময়ে তাঁহার অন্তরে তিনটী ভাব প্রবল দৃষ্ট হইতেছে। প্রথম, নশিপুরে থাকিতে তিনি ধর্মের যে উদার ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, পাঠ চিন্তা আলোচনা সর্বোপরি ঈশ্বরারাধনা দ্বারা তাহা উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি যতই আধ্যাত্মযোগের রসাস্বাদন করিতেছেন, ততই সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র ও পরিমিত ভাবের পূজাকে ছেলেখেলা বোধ হইতেছে। কেবল তাহা নহে, পূর্বে এরূপ পূজাতে তিনি আপত্তি করিতেন না, এক্ষণে অবিধেয় বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। হয়ত অনেকে বলিবেন ইহা তাঁহার নবরত্ন সভার সভ্যদিগের সহিত সংস্রবের ফল। জানি না, কিন্তু এই পরিবর্তনটী তাঁহার অন্তরে ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, নবরত্ন সভার সভ্যদিগের সংস্রবে আসিয়া তাঁহার মনে পরহিতকর কার্যে আপনাকে অর্পণ করিবার বাসনা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। যে ভাবে দিন যাইতেছে, ইহা তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। কোন ভাল কার্যে আপনাকে না দিলে যেন মনটা সন্তুষ্ট হইতেছে না। তৃতীয়তঃ, কন্যার বিবাহের পর অনুতাপের মুহূর্তে এই প্রতিজ্ঞা তাঁহার অন্তরে উদিত হইয়াছে, যে তিনি যাহা কর্তব্য ও ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া অনুভব করিবেন, তাহা হইতে আপনাকে বিচ্যুত হইতে দিবেন না। এই তিনটী ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি তদনুসারে কার্য করিয়া চলিয়াছেন।

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে হরচন্দ্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে বুক কীপিং নামক বিদ্যাতে পরীক্ষা দিয়া তিনি কোন গবর্ণমেণ্ট-আপিসে ৮০৲ টাকা বেতনের একটী কর্ম পাইয়াছেন। বেতন পাইলেই তিনি সমস্ত টাকা জ্যেষ্ঠের হস্তে অর্পণ করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহা হইতে ৪০৲ টাকা লইয়া অবশিষ্ট ৪০৲ টাকা হরচন্দ্রের নিজ ব্যয়ের নিমিত্ত প্রত্যর্পণ করেন। এইরূপ নিয়মে কার্য চলিতেছে। হরচন্দ্রের জ্ঞান-পিপাসা অতিশয় প্রবল। উক্ত ৪০৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা দিয়া তিনি একটী কালেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার সহিত প্রতি রাত্রে দুই ঘণ্টা করিয়া ইংরাজী পড়েন। ৮৲ টাকা দিয়া একজন সংস্কৃত পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট প্রাতে সংস্কৃত পড়েন। অবশিষ্ট ২০৲ টাকার মধ্যে প্রায় প্রতি মাসে ১০৲ টাকার নূতন পুস্তক ক্রয় করিয়া থাকেন। পুস্তক ক্রয় করা ও ভাল করিয়া বাঁধান তাঁহার একটা বাতিকের মধ্যে। এইরূপে জ্ঞানালোচনাতে তাঁহার সমুদায় সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। তিনিও নবরত্নের সভ্যদিগের সংস্রবে আসিয়া দিন দিন তাহাদের ভাব প্রাপ্ত হইতেছেন।

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে গিরিশচন্দ্র কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ১০০৲ এক শত টাকা বেতনে একটী ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারি কর্ম পাইয়াছেন। তাঁহার স্বভাব-চরিত্র নশিপুরের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণেরই অনুরূপ; এ সময়ের কোনও দোষই তাঁহাতে নাই। তাঁহার পিতৃ-মাতৃভক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি প্রাতে উঠিয়া সর্বাগ্রে পিতামাতার চরণে প্রণাম না করিয়া কোনও কার্যে হস্তার্পণ করেন না। গিরিশচন্দ্র, সুপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকাংশ গ্রন্থই তিনি পড়িয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন না করিয়া বরং আরও অধিক পরিমাণে প্রাচ্য-ভাবাপন্ন করিয়াছে। তিনি প্রখর বুদ্ধি ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সাহায্যে সনাতন হিন্দুধর্ম ও রীতি-নীতির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করিয়া

আপনার মনকে গড়িয়া লইয়াছেন, এবং যেখানে যান, তাহা প্রচার করিতে ভাল বাসেন। এমন কি তিনি বিজয়া ও হরচন্দ্রকে বলিয়াছেন যে, সামাজিক ও পারিবারিক ধর্ম এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ লিখিবার ইচ্ছা আছে। তিনি নবরত্ন সভার ঘোর বিরোধী, কিন্তু তাহা বলিয়া কাহারও প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ নহেন।

তর্কভূষণ মহাশয়ের কাশীযাত্রার দুই মাস পরেই এক দিন বিদ্যারত্ন মহাশয় সন্ধ্যার পর রাজবাড়ী হইতে ঘরে আসিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে বিজয়ার ঘরে বিজয়া, হরচন্দ্র ও গিরিশ তিনজনে খুব তর্ক চলিয়াছে। শুনিবামাত্র তিনি অন্ধকারে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন সে দিন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনেক রাত্রে বাড়ী আসিবার কথা, সুতরাং তিন জনে নিঃশঙ্কচিত্তে মন খুলিয়া তর্ক করিতেছেন। বিচারের বিষয় কালী-পূজা। হরচন্দ্র বলিয়াছেন, কালী অনার্য আদিম বর্বর অধিবাসীদিগের অর্থাৎ রাক্ষসদের দেবতা ছিল; নতুবা নরবলি নরমুণ্ড নর-কপাল প্রভৃতিতে এত আস্থা কেন?

গিরিশ। শুন কাকা, কালীর ভিতরে কত বড় একটা গভীর অর্থ আছে, তা দেখলে না?

হরচন্দ্র। গভীর অর্থটা কি?

গিরিশ। কালী হলো কাল, Time, Time; কাল অনন্ত; যাহা অনন্ত তাহা নীল; দেখ সমুদ্র নীল, আকাশ নীল, অতএব কালীও নীল। তার পরে দেখ, কালের তিন ভাগ আছে, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ; কালীরও দেখ তিন ভাগ; পদদ্বয়, মধ্যভাগ ও উত্তমাঙ্গ। অতীত কালের বিষয় চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে, যে সকল প্রকার ঘটনার মধ্য হইতেই একটা মঙ্গলকর কিছু বাহির হইয়াছে; এমন যে ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন, তাহারও চরম ফল মঙ্গল। অতএব দেখ, কালীর পদতলে শিব, অর্থাৎ মঙ্গল। আর কালের বর্তমানের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিবে, কেবল বিবাদ, কলহ, বিদ্বেষ, রক্তপাত; অতএব দেখ, কালীর মধ্য ভাগে নরমুণ্ড ও নরহস্তমালা; কালের ভবিষ্যতে আশা; কাল দুঃখশোকার্ত জীবকে আশীর্বাদ-হস্ত তুলিয়া সর্বদা বলিতেছে—"অপেক্ষা কর, ধৈর্যাবলম্বন কর, দুঃখের পর সুখের দিন আসিতেছে!" অতএব দেখ, কালীও আশীর্বাদের হস্ত তুলিয়া রহিয়াছেন। কালী ত একটা রূপক, একটা চমৎকার সুন্দর রূপক; যাঁহারা প্রচলিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য বোধ হয় এই ছিল যে, কালরূপী অনন্তের ধ্যান করিয়া মানুষ আপনার হৃদয়কে সেই অনন্তে লীন করিবে।

হরচন্দ্র। (অট্টহাস্য করিয়া) সাবাস্ গিরিশ! বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কালীমূর্তির প্রথম কল্পনা যারা করেছিল, তারা কি সত্যই এই ভেবে করেছিল?

গিরিশ। কে বলিল করে নাই? আর করেছিল কি না তা আমার ভাব্‌বার প্রয়োজন কি? আমি ত এই ভাবে নিতে পারি?

হরচন্দ্র। যেটাকে তুমি রূপক বল্‌লে, তাতে ভক্তির উদয় হবে কেন? তার পূজা কি সম্ভব? আমার ত বোধ হয়, তুমি ব্রহ্মজ্ঞানীদের অপেক্ষাও পৌত্তলিকতার শত্রু।

গিরিশ। কেমন করে?

হরচন্দ্র। তা নয়? তারা পৌত্তলিকতাকে একটা জিনিষ না ভাব্‌লে আর তার

সঙ্গে লড়াই করতে যায় না; তুমি বলছ, "বৃথা কার সঙ্গে লড়াই কর? ওসব রূপক।" ভেবে দেখ দেখি কথাটা কিরূপ দাঁড়াল।

গিরিশ। তা বললে কি হয়; যে জিনিষগুলো আছে, তাকে ত উন্নত জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে; নতুবা এখনকার লোকে নেবে কেন?

হরচন্দ্র। কি বলবো বাবা দেশে নাই! তিনি যদি তোমার এরূপ ব্যাখ্যা শুনতেন, তা হলে তোমাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতেন।

গিরিশ। কেন, কি করতেন?

হরচন্দ্র। তোমার গালে ঠাস্ করে একটী চড় মেরে বলতেন, আমার সম্মুখ হ'তে উঠে যা, কালী রূপক? এত বড় আস্পর্ধা! আমরা বাপু সোজাসুজি বুঝি, সোজাসুজি বলি; আমরা বলি, এরূপ পূজার দ্বারা দেশের মহানিষ্ট হয়েছে।

গিরিশ। তোমরা যে একটা কথা ভুলে যাও; এই পুতুলগুলোকে ত এই ভাবে দেখ্‌লেই হয় যে এগুলো Repositories of human reverence.

বিজয়া। গিরিশ, কি বললে? ও কথাটার অর্থ কি?

গিরিশ। ঐ সকল প্রণালীর দ্বারা বংশ-পরম্পরাক্রমে মানবের ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়েছে। তাদের সমক্ষে প্রণত হলে মানবের ভক্তিবৃত্তির নিকট প্রণত হওয়া হয়।

হরচন্দ্র। এটা বাপু বুঝ্‌তে পারলাম না; যাকে সত্য ভাবি না, তার নিকট প্রণত হব কিরূপে?

এমন সময়ে বিদ্যারত্ন মহাশয় গিরিশকে ডাকিলেন,—"গিরিশ, এদিকে শোন্।" গিরিশ উঠিয়া গেলেন। হরচন্দ্র চুপে চুপে বলিলেন,—"যাঃ এইবারেই সর্বনাশ! বড়দা বোধ হয় আমাদের কথাবার্তা সব শুনেছেন।"

বিজয়া। শুনলেই বা, তা আর ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ কি? অন্যায় কথাটা ত কিছু হয় নি।

বিদ্যারত্ন মহাশয় সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়াই হরচন্দ্রকে ডাকিলেন—"হর"।

হরচন্দ্র। আজ্ঞে।

বিদ্যারত্ন। এ দিকে এস দেখি। (হরচন্দ্র নিকটস্থ হইলেন।) তোমার এ রকম মত শত হলো কেন? তুমিও ওদের সঙ্গে পড়ে বয়ে গেলে?

হরচন্দ্র। কি রকম মত শত?

বিদ্যারত্ন। কেন আমি কি শুনিনি। এইমাত্র তোমাদের খুব বিচার হচ্ছিল। আমি সমুদায় শুনেছি।

হরচন্দ্র। ও একটা তর্ক হচ্ছিল, গিরিশের কালীর ব্যাখ্যা শুনে আমরা হাস্‌ছিলাম।

বিদ্যারত্ন। শেষকালটায় একেবারে বয়ে গেলে, পিতাপিতামহের নামটা ডোবাতে বসলে?

হরচন্দ্র। বড়দা, আপনি কি বলছেন? মানুষ যদি প্রাণপণে ভাল হবার চেষ্টা করে, তাকে কি বয়ে যাওয়া বলে? তা হলে কি পিতাপিতামহের নাম ডোবে?

বিদ্যারত্ন। (অতিশয় বিকৃতস্বরে) হাঁ ভাল হবার চেষ্টা করে! ছাই ভাল হবার চেষ্টা! এর চেয়ে তুমি আগে যা ছিলে তা ছিল ভাল।

হরচন্দ্র। (অতিশয় দুঃখিতভাবে) বড়দা, এ কথাটা আপনি মনে থেকে বলছেন না।

বিদ্যারত্ন। মনে থেকে বল্‌ছি বৈ কি?

হরচন্দ্র। তবে আর আমি কথা কব না। আপনি ক্রোধবশতঃ কি বল্‌ছেন ভেবে দেখ্‌ছেন না। (বলিয়া নীরব)

বিদ্যারত্ন। ঐ ছোট পিসীই তোমার মাথা খেলে। পিছনে কতকগুলো ছোঁড়া জুটেছে, আমি তাদের একেবারে দেখ্‌তে পারিনে। (না হরচন্দ্র না বিজয়া কেহ আর কোনও কথাই বলিলেন না।)

তৎপর দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় আর বিজয়া কি হরচন্দ্র কাহারও সহিত বাক্যালাপও করেন না। হরচন্দ্র পর মাসের প্রথমে টাকাগুলি আনিয়া গিরিশের হাতে দিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি টাকাগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"চাই না ওর টাকা, ওর যা ইচ্ছে করুক গিয়ে।" হরচন্দ্র বিপদে পড়িলেন। নিজে একবার গিয়া বলিলেন—"বড়দা, টাকাগুলি নিন, তা না হলে আমি মনে বড় ক্লেশ পাব।"

বিদ্যারত্ন। পেলেই বা ক্লেশ? আমি তোমার টাকা নিতে পার্‌বো না, তুমি শঙ্করের কাছে পাঠাও।

হরচন্দ্র। তবে কি আপনার ইচ্ছে, আমি এখানে না থাকি?

বিদ্যারত্ন। আমার ত ইচ্ছে সকলে একত্রে থাকি। তোমাদের সে রকম গা নয়, তা আর কি হবে? তাহলে আর এমন কর?

হরচন্দ্র। (গম্ভীরভাবে) তবে কি আপনার ইচ্ছে আমি চলে যাই?

বিদ্যারত্ন। তোমার ইচ্ছে, যেতে হয় যাও, সোজা পথ আছে।

হরচন্দ্র। আচ্ছা তবে আমাকে পদধূলি দিন। (বলিয়া পদধূলি লইলেন।)

ইহার পরেই হরচন্দ্র স্বতন্ত্র বাসা করিলেন। ওদিকে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়া দেড়শত টাকা হইল। বিজয়া সেই সঙ্গে গেলেন; এবং বাহির হইতে পঞ্চু ও গোবিন্দ আসিয়া এক সঙ্গে রহিল। কিছুদিন পরে হরচন্দ্র নশিপুর হইতে স্বীয় স্ত্রীপুত্রকে কলিকাতার বাসাতে আনিলেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র বাসা করিলে তাঁহাদের ভবনেই নবরত্ন সভার অধিবেশন হইতে লাগিল।

২১

১৮৫৬ সালের পূজার পর নবীনচন্দ্রকে ফরিদপুরে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তৎপরে তর্কভূষণ মহাশয়ের পরিবার মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার বর্ণন করিতে গিয়া নবীনকে ভুলিয়া গিয়াছি। এখন নবীনের বিষয় কিছু বলি। নবীন দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া ফরিদপুর স্কুলে উপস্থিত হইবামাত্র স্কুলে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইল। তাঁহার, বিনয়, সৌজন্য ও সাধুতা দ্বারা তিনি অল্পকাল মধ্যে সকলকে আকর্ষণ করিলেন। হেডমাষ্টার মহাশয় তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি ভ্রাতৃ-স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এমন সুন্দর পড়াইবার রীতি যে. বালকগণ তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। তিনি সুচারুরূপেই নিজ কর্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন।

দুই মাস যাইতে না যাইতে স্থানীয় অনেক ভদ্রলোকের সহিত নবীনের

পরিচয় ও আত্মীয়তা হইল। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় স্কুলের কয়েকটী শিক্ষক ও অপর কয়েকটী ভদ্রলোক তাঁহার বাসা বাড়িতে নানা বিষয়ের আলোচনার জন্য আসিতেন। নবীন তাঁহাদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া কয়েকটী কার্যের সূত্রপাত করিলেন। প্রথমতঃ, সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার বাসাতে ধর্মালোচনার্থ সম্মিলিত হইবার নিয়ম করিলেন। উক্ত দিবস বড় অধিকসংখ্যক লোক আসিতেন না, চারি পাঁচজন ধর্মানুরাগী লোক আসিতেন। তন্মধ্যে একজন প্রাচীন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাকে সকলে বাগ্‌চী মহাশয় বলিত। বাগ্‌চী মহাশয়ের বয়ঃক্রম তখন পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইবে। তিনি স্থানীয় জজের আদালতে সেরেস্তাদারি কাজ করিতেন। বাগ্‌চী মহাশয় বড় ভক্ত ও সাধক লোক, ভক্তির কথা শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার কণ্ঠ বড় সুমিষ্ট ছিল। তিনি ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে যে কোন গান করিতেন, তাহা তাঁহার মুখে অপূর্ব শুনাইত। এই ধর্মালোচনা-সভাতে তিনি সঙ্গীত করিতেন; সঙ্গীতানন্তর মহানির্বাণতন্ত্র হইতে একটী স্তোত্র পাঠ করা হইত; তৎপরে নবীন কোনও গ্রন্থ বা পত্রিকা হইতে কিয়দংশ পাঠ করিতেন, কখনও কখনও নিজে কিছু লিখিয়া পড়িতেন; তৎপরে অনেকক্ষণ বসিয়া ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেক আলোচনা হইত। নবীন গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণু-পুরাণ, নারদ পঞ্চরাত্র, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ পড়িয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। কখন কখনও অপরাপর ধর্মের সাধুদিগের চরিত্রও পাঠ হইত।

এই সভাটীর দ্বারা নবীনের বিশেষ উপকার হইতে লাগিল। তাঁহার স্বাভাবিক লজ্জাশীলতাবশতঃ ধর্মের কথা মানুষকে তিনি বলিতে পারেন না। অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের নিকট তাঁহার মন খোলে। কিন্তু, এখানে কর্তব্য-বোধে তাঁহাকে সমুদায় আলোচনার প্রধান ভার লইতে হইল; সুতরাং সে জন্য যেন একটা গুরুতর দায়িত্ব তাঁহার উপর পড়িল; তিনি সেই ভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। পাঠ ও ঈশ্বরচিন্তা দ্বারা তাঁহার নিজের ধর্মভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সকলেই বলিতেন ঈশ্বরের নাম তাঁহার মুখে যেরূপ মধুর শুনাইত এমন প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। এই ধর্মালোচনা সভার সভ্যদিগের সঙ্গে, বিশেষতঃ বৃদ্ধ বাগ্‌চী মহাশয়ের সঙ্গে, নবীনচন্দ্রের গভীর প্রীতির যোগ স্থাপিত হইল।

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল সমবয়স্ক শিক্ষিত যুবক প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার ভবনে আসিতেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিয়া তিনি একটী বঙ্গ-সাহিত্য-সমালোচনী সভা স্থাপন করিলেন। হেড্ মাষ্টারকে বলিয়া স্কুলের একটী ঘর চাহিয়া লইলেন। সেই ঘরে সন্ধ্যার সময়ে সকলে বসিয়া বাঙ্গলা সংবাদ পত্র, পত্রিকা, গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। এই সভা হইতে "তত্ত্ববোধিনী", "বিবিধার্থ সংগ্রহ", "হিতৈষী" প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা সকল লওয়া হইত। তদ্ভিন্ন যে কোনও উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইত, তাহা ক্রয় করিয়া পাঠ করা হইত।

তৃতীয়তঃ, স্থানীয় কতকগুলি ভদ্র লোককে উৎসাহ দিয়া একটী সুরাপান-নিবারণী সভা স্থাপন করিলেন। মধ্যে মধ্যে সেই সভার অধিবেশন হইত। এই সভার সভ্যগণ সুরাপাননিবারণসম্বন্ধীয় পুস্তিকা ও পত্রিকাদি শিক্ষিত ব্যক্তি-দিগের গৃহে গৃহে বিতরণ করিতেন ও হিতৈষীর গ্রাহক যুটাইতেন।

চতুর্থতঃ, স্কুলের বালকদিগকে লইয়া তিনি ব্যায়াম ক্রীড়া প্রভৃতির জন্য একটী

দল বাঁধিলেন। তাহাদিগকে নানাপ্রকার কুস্তী শিখাইবার উপায় অবলম্বন করিলেন। নিজে তাহাদের কাপ্তেন হইয়া অপরাহ্ণে স্কুলের মাঠে তাহাদের সঙ্গে খেলিতেন। এই দল হইতে ফাল্গুন মাসের শেষে আর একটী দল প্রস্তুত হইল। ফরিদপুরের ন্যায় মফঃস্বলস্থ নগর সকলে সে সময়ে প্রায় প্রতি বৎসর কাহারও না কাহারও ঘরে আগুন লাগিয়া অনেকের সর্বনাশ হইয়া যাইত। যতই বাতাসের দিন নিকটস্থ হইতে লাগিল, ততই লোকে বলিতে লাগিল, বাতাসের দিন আসিতেছে, সেই সঙ্গে আগুনের ভয় আসিতেছে। নবীনচন্দ্র স্কুলের উচ্চশ্রেণীর বালকদিগকে লইয়া "গৃহদাহনিবারক সৈন্যদল" বলিয়া এক সৈন্যদল সৃষ্টি করিলেন। কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের এক প্রকার পোষাক ও টুপি প্রস্তুত করিলেন, এবং একটা বিলাতি শিঙ্গা আনাইলেন। নিজে তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে ড্রিল করাইতে লাগিলেন। তাহারা অচিরকালের মধ্যে এরূপ শিক্ষিত হইল যে তিনি শিঙ্গার ধ্বনি করিবামাত্র তাহারা যে যেখানে যে অবস্থাতে থাকুক, ছুটিয়া আসিত ও নিমেষের মধ্যে সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া এক একটী জলের টব হাতে করিয়া সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইত, এবং জল সেচনের অভিনয় করিত।

এইরূপে নানা কার্য্যের চিন্তাতে নবীনচন্দ্রের দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে ধর্মালোচনা সভা ও বালকদিগের দল ইহার প্রতি তাঁহাকে বিশেষ মনোযোগ করিতে হইত, অপর দুইটী সভাতে তিনি উৎসাহ ও পরামর্শদাতা হইয়া অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতেন। কিন্তু এখানেই তাঁহার কার্যের অবসান নহে। বলিতে কি, কলিকাতাতেই তাঁহার মন পড়িয়া রহিয়াছে। নবরত্ন সভার সভ্যদিগের সহিত সর্বদাই চিঠিপত্র চলিতেছে। যে সকল কাজে বিলম্ব করিলে ক্ষতি নাই, এমন কোনও কাজ তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন হয় না। প্রত্যেক সপ্তাহের সভাতেই তাঁহার পত্র পাঠ করা হয়। নবীনচন্দ্র যেরূপ আশা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে। তাঁহার আগমনের পর নবরত্ন সভার দুর্বলতা না হইয়া বলবৃদ্ধি হইয়াছে। ব্রজরাজ ও সুরেন গুপ্ত দিন দিন কাজের লোক হইয়া উঠিতেছেন। সভ্যদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের গাঢ়তা যেন পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে।

কেবল নবরত্ন সভার সভ্যগণ নহে নবীনচন্দ্রকে চিঠিপত্র লিখিবার লোক আরও অনেক। তাঁহার ভ্রাতৃজায়া সৌদামিনী প্রায় প্রতি সপ্তাহে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া আপনার সকল দুঃখের কথা জানাইয়া থাকেন। তদুত্তরে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে হয়। মাসটী পড়িলেই তাঁহার জন্য ১৫৲ টাকা প্রেরিত হইয়া থাকে; তাহাতে সৌদামিনী অতিশয় প্রীত। ইহা নবীনচন্দ্রের একটী আনন্দের বিষয়। এতদ্ব্যতীত বৃদ্ধ হলধর বসুর সহিতও মধ্যে মধ্যে চিঠিপত্র চলে। নবীনচন্দ্র তাঁহার রাঙ্গা মার সংবাদ লইবার জন্য তাঁহাকে চিঠিপত্র লিখিয়া থাকেন। তদুত্তরে বৃদ্ধ অনেক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানাইয়া থাকেন। ফাল্গুনের শেষে নবীনচন্দ্র চিন্তা করিলেন যে, বাসন্তী পূজার সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের অনেক চাউল খরচ হয়। কলিকাতাতে চাউলের মূল্য অধিক; ফরিদপুর হইতে কিনিয়া পাঠাইতে পারিলে ভাল হয়। এই ভাবিয়া একেবারে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের বাড়ীর সম্বৎসর খরচের মত ও বাসন্তী পূজার ব্যয়ের মত চাউল খরিদ করিয়া একটী চলিত নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন; ও তৎসঙ্গে নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন :—

শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণতিপূর্বক নিবেদন—

আমরা বাল্যকালে পিতাকে হারাইয়া তাঁহার স্নেহ অধিক দিন লাভ করি নাই। আপনিই আমাদের পিতা। আপনারই ক্রোড়ে আমরা লালিত পালিত হইয়াছি। আমরা অতি অধম, আপনার পিতৃস্নেহের উপযুক্ত কাজ কিছু করি নাই, করিতে যে পারিব সে আশাও নাই। এবারে এদিকে চাউল অতিশয় শস্তা হইয়াছে। বাসন্তী পূজার সময়ে আপনার অনেক চাউল ব্যয় হয়, ভাবিয়া, কিঞ্চিৎ চাউল খরিদ করিয়া পাঠাইলাম। ইহাতে বাসন্তী পূজার ব্যয় হইয়া বাড়ীর সম্বৎসরের ব্যয় চলিবে। চাউলগুলি গ্রহণ করিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিবেন, যেন আমার ঈশ্বর-চরণে সর্বদা মতি থাকে।

সেবক,
শ্রীনবীনচন্দ্র বসু।

চাউলগুলি ও পত্রখানি যখন কলিকাতাতে পৌঁছিল, বৃদ্ধ হলধর বসু অতিশয় আনন্দিত হইলেন; তাঁহার বিষয়-চিন্তা-জর্জরিত চিত্তেও যেন কিঞ্চিৎ আর্দ্রভাব হইল; তিনি গৃহিণীকে বলিলেন,—"গুপীর পুণ্যফলেই এমন সুসন্তান জন্মেছে। বড়টা এমন হলো কেন?"

নবীনচন্দ্র যে এত প্রকার কার্যের আয়োজন করিয়াছেন ও সর্বদাই আপনাকে ব্যস্ত রাখিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তথাপি মনের কৃষ্ণকামিনীমুখীন গতি ফিরাইতে পারিতেছেন না। নির্জন হইলেই সেই চিন্তা হৃদয়কে অধিকার করে। মনটা সর্বদা কৃষ্ণকামিনীর সংবাদ পাইবার জন্য হা হা করে; ব্রজরাজ ও মথুরেশের পত্রে তাঁহার সংবাদ যে একটু আধটু পান, তাহা অমূল্য সম্পত্তির ন্যায় তুলিয়া রাখেন, বার বার পাঠ করেন। এক একবার ব্রজরাজের নিকট নিজ হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া কৃষ্ণকামিনীর সহিত চিঠিপত্রে আলাপ আরম্ভ করিবার জন্য মনে আবেগ উপস্থিত হয়, কিন্তু আবার তাঁহার শান্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে আবেগ দমন করিয়া রাখেন; এবং সর্বদা কোন না কোনও ভাল বিষয় পাঠ ও চিন্তাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করেন।

তিনি কলিকাতাতে থাকিতে একটী বিষয়ে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া সে বিষয়টী মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিতেছেন। তাহা উদ্ভিদ্-বিদ্যা। এখানে গাছ-পালার অভাব নাই, সুতরাং উদ্ভিদ্-বিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী পাঠের বিশেষ সহায়তা হইতেছে। এটী তাঁহার একটী প্রধান বিনোদনের উপায়। স্কুলের বালকগণ কোনও প্রকার নূতন বা বিচিত্র বৃক্ষলতা ফুল পাতা পাইলেই স্কুলে আসিবার সময় আনিয়া উপস্থিত করে, তিনি সেগুলি লইয়া পরীক্ষা ও পাঠ করেন। কিন্তু এই সকল পাঠ ও চিন্তার ভিতরেও কৃষ্ণকামিনীর চিন্তা আসিয়া হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকামিনী যেন আসিয়া বলেন,—'রাখ রাখ তোমার পড়া রাখ, এখন আমার সঙ্গে কিয়ৎকাল থাক।" নবীন যেন বলেন,—"আমি যে তোমাকে দূরে রাখিতে চাহিতেছি, কেন তুমি আমার হৃদয়ে আসিয়া প্রবেশ কর?" এইরূপে নবীনচন্দ্র কঠোর তপস্যার দ্বারা আত্ম-শাসন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

এ দিকে চৈত্র মাসে একদিন সন্ধ্যার পূর্বে ফরিদপুরের বাজারে আগুন লাগিয়া গেল। নবীচন্দ্র তখন স্কুলের মাঠে বালকদিগের সহিত খেলিতেছিলেন। আগুন দেখিবামাত্র দৌড়িয়া পোষাক পরিতে গেলেন ও তাঁর শিঙ্গাতে ফুঁ দিলেন।

শিঙ্গাধ্বনি হইবামাত্র সৈন্যগণ যে যে প্রকার অবস্থাতে ছিল, আসিয়া হাজির হইল; তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া, এক একটা জলের টব হস্তে ধাবিত হইলেন। সারিবন্দী করিয়া সৈন্যদলকে পুষ্করিণী পর্যন্ত দণ্ডায়মান করিলেন এবং নিজে জ্বলন্ত গৃহের সন্নিধানে দাঁড়াইলেন। জলসিঞ্চন আরম্ভ হইল। এই কার্যে বালকগণের মনে যেন এক অদ্ভুত তাড়িতের সঞ্চার হইল! ঝপাঝপ জলের টব হাতে হাতে ছুটিয়াছে, ও জ্বলন্ত চালের উপরে জল পড়িতেছে! এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া যাহারা তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদেরও মনে এক অপূর্ব উৎসাহের আবির্ভাব হইল। তাহারাও কেহ কলস, কেহ ভাঁড়, যে যাহা পাইল, লইয়া জল সিঞ্চন করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট H. J. Greive গ্রীভ সাহেব আসিয়া উপস্থিত। স্কুলের ছাত্রদিগের এই উৎসাহ দেখিয়া তাঁহার মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি নবীনচন্দ্রের নিকটে গিয়া বলিলেন— That's it Baboo, I admire your boys, I am your captain, give me one of those buckets; অর্থ,—"বাবু ঠিক, এই ঠিক, তোমার ছেলেদের দেখে আমার আনন্দ হচ্চে, আমি তোমাদের কাপ্তেন, আমাকে একটা জলের টব দেও।" ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কাপ্তেন হইয়া দাঁড়াইলেন ও জল সিঞ্চন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরম উৎসাহে অগ্নিনির্বাণ কার্য চলিল। যথা সময়ে অগ্নি নির্বাণ হইয়া গেল।

পরদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গৃহ-দাহ-নিবারক সৈন্যদলকে বিশেষ পারিতোষিক দিবার জন্য স্কুলে উপস্থিত হইলেন। সৈন্যদলকে তাঁহার নিকট ডাকা হইল, তাহাদিগকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া তাহাদের ভোজের জন্য ২৫টী টাকা দিলেন এবং নবীনচন্দ্রকে হাসিয়া বলিলেন—"আমি কিন্তু একদিনের জন্য কাপ্তেন হই নাই, আমি এ দলের কাপ্তেন, তুমি আমার সহকারী।" নবীনচন্দ্র বলিলেন,— "সে ত সৌভাগ্যের কথা।" তৎপর হইতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উক্ত দলের কাপ্তেন হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই নবীনচন্দ্র বালকদিগের বাচ্ খেলিবার জন্য দুইখানি নৌকা কিনিলেন; এবং ঢোল সমুদ্রের জলে ভাসাইলেন। গ্রীভ সাহেব উক্ত কার্যে বিশেষ অর্থ সাহায্য করিলেন। এইরূপে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও তাঁহার পত্নীর সহিত নবীনচন্দ্রের পরিচয় ও আত্মীয়তা হইয়া গেল।

বাসন্তী পূজার কিছুদিন পরেই নবীনচন্দ্র সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন. ও তাঁহাকে দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছেন। তখনও গ্রীষ্মাবকাশের ১১।১২ দিন বিলম্ব আছে, তিনি বিদায় লইয়া সত্বর কলিকাতাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার তাঁহার নবরত্ন সভার বন্ধুগণ তাঁহার সঙ্গে জুটিল। উত্তমরূপেই বসুজ মহাশয়ের চিকিৎসা চলিল; একে বয়স অধিক, তাহাতে রক্তামাশয় রোগ, বৃদ্ধ অনেক দিন ভুগিলেন ও দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই রোগের মধ্যে একদিন একটু নির্জন পাইয়া বৃদ্ধ নবীনের হস্তে একখানি কাগজ দিলেন, দিয়া বলিলেন,—"সময়ান্তরে পড়ে দেখো।" নবীন স্বতন্ত্র ঘরে, আর এক সময়ে পড়িয়া দেখেন যে সেখানি বসুজ মহাশয়ের উইল। সে উইলে বাড়ীখানি বাদে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকার সম্পত্তির উল্লেখ আছে। ঐ সমগ্র সম্পত্তি তিনি নবীনচন্দ্রের নামে লিখিয়া দিয়াছেন। ঐ উইলখানি নবীনচন্দ্রের ভাল লাগিল না। তিনি নির্জনে বসুজ মহাশয়কে বলিলেন,—"আমি এত সম্পত্তি লইয়া কি করিব?

জগদীশ্বরের কৃপায় আমার দুটাকা উপার্জন আছে, আরও বাড়িবার সম্ভাবনা, পৈতৃক কিছু টাকাও আছে, আমার আর সম্পত্তির প্রয়োজন কি? আপনি আমাকে পদধূলি দিন, তাহাই আমার যথেষ্ট সম্পত্তি।" বৃদ্ধের তখন অধিক কথা কহিবার শক্তি নাই, তিনি কেবলমাত্র বলিলেন,—"তবে কি পথের লোককে দেব?" ইহার পরে নবীন নির্জনে অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, এই ত সুযোগ উপস্থিত; কলিকাতায় আসিবার জন্য উৎসুক আছি; এই আয় অবলম্বন করিয়া ত স্বচ্ছন্দে কর্ম কাজ ছাড়িয়া আসিতে পারি, স্বচ্ছন্দে কৃষ্ণ-কামিনীকে বিবাহ করিয়া সুখী করিতে পারি, এবং নবরত্ন সভাকেও যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারি। আবার মনে হইল,—না না আমি যে একটা কাজ যুটাইয়া কলিকাতায় আসিব ভাবিয়াছি, সেই ভাল। এত টাকা লইয়া আমি কি করিব? এ টাকা দ্বারা লোকের একটা উপকার হওয়া ভাল; আর আমিই বা একাকী কিরূপে এত টাকা লই? অমি পৈতৃক ধনে রাজভোগে থাকিব, আর দাদা দারিদ্র্যে মগ্ন থাকিবেন, তাহা কখনই হয় না। কিন্তু দাদার যে অবস্থা তাহাতে তাঁহার হাতে যে টাকাই পড়ুক তিন দিনে উড়াইয়া দিবেন। বৌদিদি ও ছেলেরা কিছু টাকা পান, ইহা বড় ইচ্ছা করে; কিন্তু জেঠা বোধ হয় দাদাকে কিছু দিতে সম্মত হইবেন না। এইরূপ নানা চিন্তার পর একদিন বৃদ্ধকে বলিলেন,—"জেঠা মহাশয়! টাকাগুলো আপনি পাঁচজন ট্রাষ্টির হাতে দিয়ে যান, এবং এই কথা লিখিয়া দিন যে, তাঁরা রাঙ্গা মার জীবদ্দশা পর্যন্ত তাঁহাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবেন ও তাঁর ধর্মকর্মার্থে ঐ টাকা ব্যয় করিবেন। তৎপরে তাঁর দেহান্ত হলে, ঐ টাকার সুদ দেশের কোনও হিতকর কার্যে লাগাবেন।" এ প্রস্তাব কোনও প্রকারেই বৃদ্ধের মনোমত হইল না।

নবীনচন্দ্র আবার ভাবিতে লাগিলেন। আবার দুই এক দিন পরে দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। "উক্ত দুই লক্ষ দশ হাজার টাকার মধ্যে দশ হাজার টাকা বাড়ী মেরামত ও আপনাদের শ্রাদ্ধাদির জন্য থাকুক; দাদার ছেলেদের নামে ২৫ হাজার টাকা দিয়ে যান, তাহা আমার হাতেই থাকুক; আমাকে যদি কিছু দিতে চান, পঁচিশ হাজার দিলেই হইবে। ঐ পঁচিশ হাজার টাকা আপাততঃ রাঙ্গা মার নামেই থাকুক; আমার পনর হাজার ও এই ২৫ হাজারে তাঁহার চলিয়া যাইবে; অবশিষ্ট দেড় লক্ষ টাকা পাঁচজন ট্রাষ্টির হাতে দেশহিতকর কার্যের জন্য থাকুক।" অবশেষে এ প্রস্তাব যখন আসিল, তখন বৃদ্ধ অতিশয় অবসন্ন। ক্লান্তিবশতঃই হউক, আর নবীনের জেদ ছাড়াইতে না পারিয়াই হউক, তিনি নবীনকে বলিলেন,—"আমি তোমাকে দিলাম, তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি আর ভাবিতে পারি না।" নবীনচন্দ্র তাড়াতাড়ি দুই এক দিনের মধ্যে একজন আইনজ্ঞ লোকের দ্বারা একটী উইল লিখাইয়া আনিলেন, ও উপযুক্ত সাক্ষীর সমক্ষে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। বাড়ী মেরামত প্রভৃতির জন্য দশ হাজার রহিল; তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের সন্তানগণের জন্য ২৫ হাজার তাঁহার হস্তে রহিল; তাঁহার ২৫ হাজার রাঙ্গা মার নামে রহিল; অবশিষ্ট দেড় লক্ষ পাঁচজন ট্রাষ্টির হাতে রহিল। তিনি এবং সুরেশচন্দ্র উভয়ে ট্রাষ্টিদের মধ্যে রহিলেন। বসত বাড়ীটি গৃহিণীর থাকিল। তিনি দান বিক্রয় করিতে পারিবেন। উইল হইয়া গেলে যথাসময়ে বৃদ্ধ বসুজ মহাশয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হইল। তিনি জ্যৈষ্ঠের শেষভাগে পরলোক যাত্রা করিলেন। নবীনচন্দ্র গোবিন্দকে বাহির বাড়ীতে তাঁহার রাঙ্গা মায়ের রক্ষক স্বরূপ রাখিয়া গেলেন।

এবারে কলিকাতাতে আসিয়া নবীনচন্দ্র জ্যেষ্ঠতাতের পীড়া লইয়া ব্যস্ত ছিলেন; সুতরাং নবরত্ন সভার কার্যে অধিক সহায়তা করিতে পারেন নাই। তথাপি দুই তিন দিন সভার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, এবং বন্ধুদিগকে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করেন নাই। কলিকাতায় আসিয়াই ব্রজরাজের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার ফরিদপুর যাত্রার পর মাতঙ্গিনীর শয্যাতে উমাশঙ্করের কি চিঠি ধরা পড়াতে, মিত্রজ মহাশয় তাহাকে অনেক তিরস্কার করিয়া দেবরের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং তাহাকে আর কোথাও যাইতে দেন না। সে বহুকাল তাঁহাদের বাটীতে আসে নাই। এই সংবাদে নবীনচন্দ্রের মনটা অনেক আশ্বস্ত হইল; ভাবিলেন কৃষ্ণকামিনীর প্রতি আর অত্যাচার হইবে না। তৎপরে তিনি দুইদিন ব্রজরাজদিগের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকামিনীর সহিত অধিক কথাবার্তার সুবিধা হয় নাই। তিনি উদ্বিগ্ন থাকাতে শীঘ্র আসিতে হইয়াছিল।

যথাসময়ে সেই দশ হাজার টাকা হইতে ৩ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বসুজ মহাশয়ের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। সেদিন নবীন ফরিদপুরে দরিদ্রদিগকে দান করিলেন, এবং স্কুল হইতে ছুটী লইয়া সমস্ত দিন পরকাল চিন্তা ও ঈশ্বরারাধনাতে যাপন করিলেন।

পূজার সময় স্কুল বন্ধ হইলে নবীন সত্বর কলিকাতাতে আসিলেন। আসিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের নিযুক্ত ট্রষ্টিদিগের মীটিং ডাকিলেন। ট্রষ্টিরা আপাততঃ স্থির করিলেন, উক্ত দেড় লক্ষ টাকার সুদ হইতে কতকগুলি অনাথা হিন্দু বিধবার ভরণ পোষণের সাহায্য করিবেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের ২৫ হাজার টাকার সুদ ব্যাঙ্ক হইতে লইয়া তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার হস্তে অর্পণ করিলেন। তাঁহার অংশের ৪০ চল্লিশ হাজার টাকার সুদ তাঁহার রাঙ্গা মাকে তাঁহার ভরণপোষণ ও দান ধ্যানাদির জন্য দিলেন; এবং পূর্বোল্লিখিত দশ হাজার টাকার মধ্যে অবশিষ্ট ৭ হাজার টাকা হইতে দুই হাজার টাকা দিয়া বাড়ীটি ভাল করিয়া মেরামত করিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

এবারে সহরে আসিবার সময়ে তিনি পরামর্শ করিয়া আসিয়াছিলেন যে, ব্রজরাজের নিকট, কৃষ্ণকামিনীর প্রতি তাঁহার কিরূপ ভাব, তাহা ব্যক্ত করিবেন। তদনুসারে একদিন প্রাতে ব্রজরাজকে সঙ্গে করিয়া নৌকাযোগে শিবপুরে কোম্পানির বাগানে বেড়াইতে গেলেন। সেখানে একটী নির্জন তরুকুঞ্জে তরুচ্ছায়াতে বসিয়া ব্রজরাজের হস্ত নিজ হস্ত মধ্যে লইয়া, আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

নবীন। ব্রজরাজ, আমি একটা অতিশয় গুরুতর প্রস্তাব উপস্থিত কর্‌বো বলে তোকে ডেকে এনেছি।

ব্রজরাজ তাঁহার ভাব দেখিয়া প্রথমে একটু চমকিয়া উঠিলেন। হস্তে হস্ত দিয়া আছেন, অনুভব করা যাইতেছে, যেন তাঁহার শরীরের অন্তস্তলে কি এক প্রকার কম্পন হইতেছে; তাঁহার মুখ ভাবাবেশে আরক্তিম; কণ্ঠতালু যেন শুষ্ক হইতেছে· বলি বলি করিয়া বলিতে পারিতেছেন না।

ব্রজরাজ। ও কি, বল্‌বে বল্‌লে, তা বল্‌ছো না কেন?

নবীন। বল্‌ছি, আমি তোমাদের বাড়ীতে প্রায় দুই মাস ছিলাম, কৃষ্ণকামিনীর প্রতি আমার কোনও বিশেষ ভাব লক্ষ্য করেছিলে?

ব্রজরাজ। কৈ? না, তা ত কিছু করিনি।

নবীন। বাড়ীর মেয়েরা কেউ কি লক্ষ্য করেছেন?

ব্রজরাজ। কৈ কারুর মুখে ত কিছু শুনিনি।

নবীন। আমার প্রতি কৃষ্ণকামিনীর কোনও ভাব কি লক্ষ্য করেছ?

ব্রজরাজ। কৈ না? সে ত তোমার সঙ্গে বড় একটা মিশ্‌তে না।

নবীন। আমি সহর ছেড়ে গেছি কেন, তা কি বুঝ্‌তে পেরেছ?

ব্রজরাজ। না, কি ক'রে বুঝ্‌বো? তুমি ত কিছু বলনি।

নবীন। তবে বলি শুন; আমি কৃষ্ণকামিনীকে কিছু বিশেষ চক্ষে দেখি। আমি কোন প্রকারে আমার মনকে সে ভাব হতে ফেরাতে পার্‌ছি না। তোমার মাসী বোধ হয় এ ভাবও কিছু বুঝ্‌তে পেরে থাক্‌বে। তার প্ররোচনাতেই তোমার মামা কৃষ্ণকামিনীকে নিগ্রহ করেছিলেন। তা কি তোমরা বুঝ্‌তে পারনি? আমি দেখ্‌লাম আমি নিকটে থাক্‌লে, তোমাদের বাড়ীতে যাওয়া একেবারে বন্ধ কর্‌তে পার্‌ব না, অথচ ছুতোয় নাতায় বেচারিকে নিগ্রহ সহ্য কর্‌তে হবে, তাই কিছুদিনের জন্য দূরে গিয়েছি। এখন ত সে বিপদ কেটে গিয়েছে। তাই বলছি, আমাদের বিবাহের বিষয়ে তোমার মত কি?

ব্রজরাজ। (বিস্ময়ে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ। পরে আনন্দে নবীনের কর মর্দন করিয়া) তাকে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়? কেষ্টোর সৌভাগ্য যে তোমার মত পতি পাবে; আর আমাদেরও কম আনন্দের বিষয় নয়।

নবীন। রসো, একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌লে হবে না; ভাব্‌বার অনেক কথা আছে। এমন একটা কাজের ধাক্কা তোমরা সামলাতে পার্‌বে ত?

ব্রজরাজ। তা আর পার্‌বো না? তবে এতদিন জল্পনা করে আমরা কি কর্‌লাম?

নবীন। তোমার মামা যে বিরক্ত হবেন, তার কি হবে?

ব্রজরাজ। না হয় মামা আমাদের মুখ দর্শন করবেন না; আমার ভগিনী ত সুখী হবে।

নবীন। তোমার মায়ের মত হবে কি না, কি মনে কর?

ব্রজরাজ। মায়ের মতটা করা কঠিন, কারণ তিনি মামার ভয়টা অতিরিক্ত রকম করেন। তবে মথুর ও আমি ঝুঁকে-পড়লে তিনি আমাদের মতে মত না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌বেন না।

নবীন। কৃষ্ণকামিনীর ভাব কি প্রকার, কিরূপে জানা যায়?

ব্রজরাজ। সেটা ভাই আমার দ্বারা হবে না। বড় লজ্জা কর্‌বে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌বো না।

নবীন। তবে কার দ্বারা হবে? তোমার মায়ের দ্বারা?

ব্রজরাজ। মাকে যে সে কিছু খুলে বল্‌বে এমন বোধ হয় না।

নবীন। তবে উপায় কি? বোধ হয় তাঁকে বল্‌লে বল্‌তে পারে। তাঁর কাছে একবার মতটা পেলে পরে আমি লিখ্‌তে পারি।

ব্রজরাজ। আচ্ছা, মাকে আগে গড়ি, তারপর মার দ্বারা জান্‌বার চেষ্টা কর্‌বো।

নবীন। সেই বেশ কথা। তোমার মায়ের মত না হলে কৃষ্ণকামিনী কখনই এমন কাজে অগ্রসর হবে না। তোমার মাকে গড়ে ঠিক করে আমাকে খবর দিলে, তবে আমি কৃষ্ণকামিনীকে লিখ্‌বো।

ব্রজরাজ। আচ্ছা, দুই চারিদিন অপেক্ষা কর, মাকে গড়বার চেষ্টা করি।

এইরূপ কথোপকথনের পর নবীনচন্দ্র উৎসুকচিত্তে দিনের পর দিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইচ্ছা ছিল ফরিদপুর যাত্রার পূর্বে কৃষ্ণকামিনীকে লিখিয়া পাকা কথা করিয়া যাইবেন। কিন্তু ঘোষগৃহিণী শুনিয়াই মহা অনর্থ উপস্থিত করিলেন। বলিলেন,—"ওমা, ওমা, পুরুষ মানুষ, চেনা ভার, ভালমানুষটীর মত বাড়ীতে থাক্‌তো, ভিতরে ভিতরে এই বুদ্ধি। তবে ত আমার দাদা ঠিক বলেছিলেন।" ব্রজরাজ ও মথুরেশ অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি কোন প্রকারেই বুঝিলেন না। তৎপরে প্রতিদিন মাতা পুত্রে এই কথা চলিল। ওদিকে নবীনচন্দ্রের ফরিদপুরে ফিরিবার সময় হইয়া আসিল।

ফরিদপুরে যাত্রার পূর্বে নবরত্ন সভার সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইল। এবারে পূর্বারের ন্যায় সভ্যগণের উৎসাহ ও অনুরাগের উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হইল।

২২

ফরিদপুরে ফিরিয়া নবীনচন্দ্র উৎসাহের সহিত পূর্বোল্লিখিত সমুদায় কার্য চালাইতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সংবাদ আসিল যে কৃষ্ণকামিনীর বিবাহ বিষয়ে তাঁহার মাতার মত হইয়াছে; এবং কৃষ্ণকামিনীও সে বিষয়ে নিজ সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ করিলেন; এবং নিজ হৃদয়ের সমুদায় ভাব ব্যক্ত করিয়া কৃষ্ণকামিনীকে এক পত্র লিখিলেন। এই সময় হইতে তিনি নিয়মিতরূপে কৃষ্ণকামিনীর পত্র পাইতে লাগিলেন ও তাঁহাকে পত্র লিখিতে লাগিলেন।

কথায় বলে "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি", শ্রেয়ের পথে কতই বিঘ্ন! এদিকে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইতে না হইতে কিরূপে সে কথা শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয়ের কর্ণে উঠিল। অনুমান করি, ঘোষগৃহিণী পুত্রদ্বয়ের বার বার নিষেধ সত্ত্বেও বধূদ্বয়কে সে সংবাদ দিয়া থাকিবেন। অবশ্য, তিনিও বলিবার সময় গোপন রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতে বিস্মৃত হন নাই; এবং বধূদিগের মধ্যে কেহ একজন বোধ হয় বাগবাজারের বাড়ী হইতে সমাগত কোনও দাসীকে ঐরূপ গোপন রাখিবার অনুরোধ সহকারে সংবাদটী দিয়া থাকিবেন। আমরা জনসমাজে অনেক গুপ্ত কথা এইরূপে গোপন রাখিয়া থাকি। যাহা দুই কর্ণে যায় তাহা অনেক সময়ে শত কর্ণে গিয়া পড়ে। যেরূপেই হোক, পৌষ মাসের শেষভাগে সংবাদটী মিত্রজ মহাশয়ের কর্ণে উঠিল। তিনি অপার চিন্তাতে নিমগ্ন হইলেন। তিনি ভগিনীর সন্তানদিগকে নিজ সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন, এবং এ পরিবারটীকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করেন। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে একটা বিপদ আসিতেছে। এতদিনের পরে বুঝি ভাগিনেয়দিগের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে। তিনি যে কেবল লোক ভয়ে এরূপ ভয় পাইতেছেন, তাহা নহে, হিন্দু-বিধবার পক্ষে বিবাহার্থিনী হওয়া তাঁহার চক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। মাতৃভগিনী তাঁহাকে এক যাতনা দিয়াছে, যাহা তিনি ক্রমে ভুলিতেছেন; আবার কৃষ্ণকামিনী আর এক যাতনা দিতে চলিয়াছে। এখন কর্তব্য কি? তিনি কয়েকদিন গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিলেন। একবার কৃষ্ণকামিনীর প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে

যে রুক্ষ ব্যবহারে কিছু হইবে না। সত্বর স্থানান্তরে প্রেরণ করা কর্তব্য; কিছুকাল এই সকল সংসর্গ হইতে দূরে থাকিলে এ প্রকার ভাব চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু কোথায় পাঠান যায়? কাহার সঙ্গেই বা পাঠান যায়? এই চিন্তা করিতে করিতে স্মরণ হইল যে, তাঁহার পরিচিত কয়েকজন লোক মাঘের প্রথমে বৃন্দাবনে দোল দেখিবার জন্য যাত্রা করিবে। তাহারা পথে গয়া, কাশী ও প্রয়াগ হইয়া যাইবে। মিত্রজ মহাশয় মনে করিলেন, এই সুযোগে কিছুকালের জন্য পশ্চিমে পাঠান ভাল। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিলে, নানা স্থান দেখিলে এবং সকলে বুঝাইলে মনটা বদলাইতেও পারে। কিন্তু তদগ্রে ভগিনীকে হাত করা আবশ্যক।

পরামর্শটা স্থির হইলেই তদনুসারে কার্য আরম্ভ হইল। মিত্রজ মহাশয় একদিন আপীস হইতে ফিরিবার সময় ভগিনীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন। লইয়া গিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। এরূপ কাজ করিলে তাহার ফল কি হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। লোকে একঘরে করিবে, বাধ্য হইয়া তাঁহাকেও ভাগিনেয়দিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তিনি আর পিত্রালয়ে আসিতে পারিবেন না, ইত্যাদি। ঘোষগৃহিণী শুনিয়া বলিলেন,—"ওমা, আমি কি এত কথা জানি? ওরা বলে বিধবার বিয়ে শাস্ত্রে আছে, বিদ্যেসাগর প্রমাণ করেছে, এতে দোষ কি, ওর ত বিয়ে হয় নাই বল্‌তে হবে; তাই আমি বলেছি তবে হোক্‌।" ভগিনীকে গড়িতে মিত্রজ মহাশয়ের আর বিলম্ব হইল না। কিরূপে তীর্থযাত্রা হইবে, কোথায় কাহাদের সঙ্গে থাকা হইবে, খরচপত্রের কি হইবে, সমুদায় পরামর্শ স্থির হইয়া রহিল। গৃহিণীকে প্রশংসা করিতে হইবে যে, তিনি এতটা গুপ্ত কথা গোপন রাখিতে পারিলেন। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া পুত্রদিগকে কিছুই বলিলেন না।

মাঘ মাস পড়িলেই মিত্রজ মহাশয় ভগিনীকে ও কৃষ্ণকামিনীকে নিজ ভবনে কয়েকদিন রাখিবার জন্য লইয়া গেলেন। কাহারও মনে কোনও প্রকার সন্দেহ হইল না। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই পুত্রদ্বয়ের নিকট সংবাদ আসিল যে মাতুল কন্যাসহ জননীকে কোথায় প্রেরণ করিয়াছেন। শুনিবামাত্র ব্রজরাজ মাতুলালয়ে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতুল বলিলেন, "ভাবনা কি? জলে ত পড়ে নি! পাড়ার কতকগুলি লোক তীর্থে যাচ্ছিল, সেই সঙ্গে তারাও তীর্থে গিয়েছে। কয়েক মাস পরেই আবার আস্‌বে।" ব্রজরাজ তাঁহাদের ঠিকানা জানিতে চাহিলেন। মাতুল হাসিয়া বলিলেন,—"তারা রেলপথে, ঠিকানা দেব কি করে? ক্রমে জান্‌তে পারবে।" তৎপরে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, সর্বদাই এবাড়ী হইতে ঠিকানা জানিবার জন্য লোক যায়, মাতুল ঠিকানা না দিয়া ফিরাইয়া দেন। ব্রজরাজ ও মথুরেশ উভয়েই ঘোর দুশ্চিন্তাতে বাস করিতে লাগিলেন, ও মাতুলের প্রতি বৃথা আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ওদিকে ফরিদপুরে নবীনচন্দ্রের নিকট এই সংবাদ পোঁছিল। তিনি একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—"কৃষ্ণকামিনীকে যে প্রাণে রাখিবে, তার নিশ্চয় কি? একি সর্বনাশ উপস্থিত হলো!" তাঁহার দিনে আহার ও রাত্রে নিদ্রা একেবারে রহিত হইয়া গেল। আর পূর্বের ন্যায় নিজ কার্যে ভাল করিয়া মনোযোগ করিতে পারেন না; ছাত্রদিগকে ভাল করিয়া পড়াইতে পারেন না। সকলেই লক্ষ্য করিতে লাগিল,—"হেড মাষ্টারের কি একটা হয়েছে।" বাগ্‌চী মহাশয় তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কয়েকদিন হতে তোমাকে বড় বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি। ব্যাপারটা কি?" নবীন তাঁহাকে পিতৃতুল্য ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার নিকট সমুদায় কথা খুলিয়া বলিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতি উদার লোক ছিলেন, তিনি নবীনের সমদুঃখী হইলেন। তিনি বয়সে প্রবীণ এবং বিজ্ঞ লোক; তিনি বলিলেন, "প্রাণে মারিবার ভয় করো না; তাদের সেরূপ অভিসন্ধি থাক্‌লে তার মাকে সঙ্গে দিয়ে বিদেশে পাঠাত না। এই খানেই কর্ম পরিষ্কার কর্‌বার যোগাড় কর্‌ত। আর হঠাৎ মার্‌বেই বা কেন? আমার বোধ হয় তার ভ্রাতাদের সংসর্গ হতে কিছুদিন দূরে রাখ্‌লে মন বদ্‌লাতে পারে, এই আশাতেই তীর্থে পাঠিয়েছে।" তাঁহার কথাতে নবীনচন্দ্র কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু মনের মধ্যে কৃষ্ণকামিনীর কুশল সংবাদ পাইবার জন্য কিরূপ ব্যগ্রতা রহিল, তাহা অবর্ণনীয়। কাকটা উড়িয়া গেলে যেন মনে হয় "আহা অমনি একখানা চিঠি ফেলে দিয়ে যায় ত বেশ হয়।" প্রতিদিনের ডাক পেঁাছিতে বিলম্ব সয় না, ডাকঘরে গিয়া চাকর দাঁড়াইয়া থাকে, যদি কোনও সংবাদ আসে! এইরূপে দুই মাস অসহ্য যন্ত্রণাতে কাটিয়া গেল।

চৈত্রের প্রারম্ভে নবীনচন্দ্র কৃষ্ণকামিনীর নিকট হইতে হঠাৎ নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইলেন;—

"না জানি আমার জন্য তোমরা কতই চিন্তা করিতেছ। আমি ঈশ্বরের কৃপায় এখনও প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছি। আমাকে প্রতারণা করিয়া ইহারা এইদিকে আনিয়াছে। মামা বলিলেন—"বর্ধমানে বন্ধুর-বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে সপরিবারে যাইব।" তিনি বর্ধমানে নামিয়া গেলেন; আমরা বরাবর চলিয়া আসিলাম। তারপর কতক পথ হাঁটিয়া কতক গাড়িতে এইরূপে করিয়া গয়া হইয়া প্রয়াগে পেঁাছিলাম। পরে বুঝিলাম তোমার পথ হইতে আমাকে সরাইয়া দেওয়া মামার উদ্দেশ্য। প্রয়াগে আসিয়া বলপূর্বক আমার মাথা মুড়াইবার চেষ্টা করে; আমি কিছুতেই দি নাই। তিন চারিজনে আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া নাপিত দিয়া মুড়াইতে গিয়াছিল; পারে নাই। চুলের প্রতি যে আমার বড় একটা মায়া আছে তাহা নয়, কিন্তু যেই মাথার কাছে ক্ষুর লইয়া যায়, অমনি মনের ভিতর হইতে কেমন একটা বাধা আসে। যাহা হউক সঙ্গের লোক তাহার পর রাগ করিয়া আর আমাদিগকে বৃন্দাবনে লইয়া গেল না। লোক সঙ্গে দিয়া মাকে ও আমাকে কাশীতে পাঠাইয়াছে। এখানে আমি একপ্রকার কয়েদে আছি; চিঠি লিখিবার একখানি কাগজ পাই না; পড়িবার একখানি বই পাই না; তাহার উপরে দিবানিশি কতকগুলি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের তিরস্কার সহ্য করিতেছি। শুনিতেছি আমাদিগকে শীঘ্র আবার কোথায় লইয়া যাইবে। আমি মাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছি,—'তোমার যদি মত বদলাইয়াছিল, কেন কলিকাতায় বলিলে না? এত কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি ছিল? আমার ত প্রতিজ্ঞা আছে তোমাদের সকলের সম্মতি না হইলে এ কাজ করিব না।' আর তোমার বিষয়ে বলিয়াছি,—'তোমার মত বদলাইয়াছে জানিলে তিনিও এমন কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না, এতদিন অপেক্ষা করিয়াছেন আরও না হয় কিছুদিন করিতেন।' ঠিক বলি নাই? তা তাঁহাকে বলাই বৃথা। তাঁহার নিজের একটা মত নাই; মামা এক প্রকার বুঝাইয়া দিয়াছেন, আবার বোধ হয় দাদা ও তুমি বুঝাইলে আর একপ্রকার বুঝিবেন। আজ এই পর্যন্ত। তুমি আমার জন্য চিন্তিত হইও না। আমি ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। এ কয়েদের অবস্থাও ভাল লাগিতেছে: অনেক আত্ম-চিন্তার সময় পাইতেছি। যদি বাঁচিয়া থাকি এবং যদি কোনও রূপে

আবার পত্র লিখিবার সুবিধা করিতে পারি, তাহা হইলে সংবাদ পাইবে। কলিকাতায় দাদাকেও পত্র লিখিলাম।

কৃষ্ণকামিনী।"

এই পত্র পাইয়াই নবীনচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন,—"শীঘ্র অন্য কোথায় লইয়া যাইবে"—তবে ত আর কালাবিলম্ব করা উচিত নয়। ত্বরায় তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই ভাবিয়া, অবিলম্বে স্কুল হইতে দুই মাসের ছুটী লইয়া, কলিকাতায় আসিলেন, এবং ব্রজরাজ, পঞ্চু ও গোবিন্দকে ছুটি লওয়াইলেন। রাঙ্গা মাকে সমুদায় ভাঙ্গিয়া বলিলেন। তিনি বলিলেন,—"আর বাবা! আমি ত আর দেশে থাক্‌চি না; তুমি যাতে সুখী হও, তাই কর।" তৎপরে রাঙ্গা মাকে সঙ্গে লইয়া চারি বন্ধুতে কাশীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কাশীতে উপস্থিত হইয়াই তাঁহারা কৃষ্ণকামিনীর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। দুই তিন দিনের মধ্যেই কৃষ্ণকামিনীর উদ্দেশ পাওয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় ব্রজরাজ তাঁহার মাতাকে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট দেখিতে পাইয়া, নবীনের রাঙ্গা মার বাসাতে ডাকিয়া আনিলেন; সেখানে সকলে পড়িয়া বুঝাইয়া পুনরায় তাঁহার মত ফিরাইলেন। স্থির হইল যে, তৎপরদিন সন্ধ্যার পর কৃষ্ণকামিনীকে সঙ্গে লইয়া তিনি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আসিবেন; ব্রজরাজ ও গোবিন্দ তাঁহাদের জন্য পথে অপেক্ষা করিবেন; তৎপরে তাঁহারা তাঁহাদের বাসাতে আসিবেন এবং তৎপরদিনই বিবাহ হইবে।

পরদিন পরামর্শানুসারে ব্রজরাজ ও গোবিন্দ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পথে অপেক্ষা করিতেছেন। যথাসময়ে ঘোষগৃহিণী ও কৃষ্ণকামিনী উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ ব্রজরাজ অগ্রে ও গোবিন্দ পশ্চাতে, তাঁহাদিগকে লইয়া রাঙ্গা মার বাসার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে যে বাড়ীতে কৃষ্ণকামিনী ছিলেন, সে বাড়ীতে মিত্রজ মহাশয়ের আদেশানুসারে তাঁহাকে রক্ষা করিবার ভার যে সকল লোকের প্রতি ছিল তাহারা যখন শুনিল যে কৃষ্ণকামিনী মায়ের সঙ্গে গিয়াছে, তখনই তাহাদের মনে সন্দেহ হইল। কারণ কৃষ্ণকামিনীকে কখনও বাড়ীর বাহির করিবার পরামর্শ ছিল না। তাহারা তৎক্ষণাৎ দুই জন গুণ্ডা ভাড়া করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইল। পথে রাস্তার লোকের মুখে শুনিল, দুইটী স্ত্রীলোককে মধ্যে করিয়া দুইটী বাবু ত্রিপুরা সুন্দরীর গলির দিকে গিয়াছেন। তাহারা কিয়দ্দূর আসিয়াই দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল; দেখিয়া ধাবিত হইল। তখন তাঁহারা বাড়ীর দ্বারে পৌঁছিয়াছেন। গোবিন্দ পশ্চাতে ছিলেন। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়াই দেখিলেন, কয়েকজন লোক তাঁহাদিগের অভিমুখে দৌড়িয়া আসিতেছে। তিনি বলিলেন,—"ব্রজরাজ, লোক আস্‌ছে শীগ্‌গির উঁহাদিগকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে দ্বার দেও।" এই বলিতে বলিতে তাহারা আসিয়া উপস্থিত। গোবিন্দ প্রবেশ করিতে না করিতে ব্রজরাজ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দ্বার দিয়া ফেলিলেন। পঞ্চু ও নবীনচন্দ্র উপরে ছিলেন, গোলমাল শুনিয়া নীচে দৌড়িয়া আসিলেন, দেখিলেন, রমণীদ্বয় নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন। নবীন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গোবিন্দ কৈ?"

ব্রজরাজ। সে ঢুক্‌তে পারে নাই।

নবীন। কি সর্বনাশ! তবে ত তারে মেরে ফেল্‌বে; খোলো খোলো, দোর খোল, মরি ত সকলেই মরি, কাশী বড় ভয়ঙ্কর স্থান!

তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দেখেন গোবিন্দের দেহ রুধিরে প্লাবিত হইয়া দ্বারের

নিকট পড়িয়া রহিয়াছে; আর কেহ কোথাও নাই। একি সর্বনাশ! যাহা ভয় করিয়া গিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। নবীনচন্দ্র অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন প্রাণবায়ু তখনও দেহকে পরিত্যাগ করে নাই; গোবিন্দ অচৈতন্যাবস্থাতে আছে। তখন সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে ক্রন্দনের রোল উঠিল। নবীনচন্দ্র ও পণ্ডু ডাক্তার আনিতে গেলেন। ডাক্তার আসিবার পূর্বেই গোবিন্দের চেতনা হইল। ডাক্তার আসিয়া মাথা বাঁধিয়া দিলেন ও অভয় দিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গোবিন্দকে অনেকটা সুস্থ বোধ হইল।

তাঁহারা সেই রাত্রেই বিবাহক্রিয়া সমাধা করা স্থির করিলেন। কিন্তু সে দিন বিশেষরূপে পুলিশ পাহারা চাই। কলিকাতার একজন মিশনারী সাহেব তখন কাশীতে বাস করিতেন। কলিকাতায় অবস্থিতি কালে, তাঁহার সহিত ব্রজরাজ ও পণ্ডুর আলাপ পরিচয় ছিল। তিনি উভয়কে প্রীতি করিতেন। ব্রজরাজ ও পণ্ডু প্রথমে তাঁহার নিকট গিয়া সমুদায় বিবরণ তাঁহার গোচর করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট গেলেন। পুলিশ সাহেব খৃষ্টধর্মে একটু আস্থাবান লোক ছিলেন; তিনি মিশনারী মহাশয়ের কথাতে তখনই সেই বাড়ীর দ্বারে দুইজন পাহারাওয়ালা বসাইয়া দিলেন। এইরূপ স্থির রহিল যে সন্ধ্যাকালে উক্ত মিশনারী সাহেব ও স্বয়ং পুলিশ সাহেব বিবাহ-স্থলে উপস্থিত থাকিবেন। সমস্ত দিন বাড়ীর দ্বারে পাহারা রহিল। সন্ধ্যার সময় গোবিন্দকে পার্শ্বের ঘরে বিছানা করিয়া একটা তাকিয়া দিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল, যেন সে সেখান হইতে বিবাহ দেখিতে পারে।

যথা সময়ে পুলিশ সাহেব ও মিশনারী সাহেব আসিলেন। কিন্তু কি প্রণালীতে বিবাহ হইবে? পণ্ডু ব্রাহ্মসমাজে যান বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কোনও পদ্ধতি তখনও হয় নাই। হিন্দু পদ্ধতি যে কি তাহা এই ইংরাজীনবিশদিগের কাহারও জানা ছিল না। আর কাশীর মত স্থানে বিধবা বিবাহের পুরোহিত বা কোথা পাওয়া যায়? অবশেষে স্থির হইল, পণ্ডু একটু ঈশ্বরের স্তুতি করিবেন, বরকন্যা একটী প্রার্থনা পাঠ করিবেন, ও একটা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া সাক্ষীদের সমক্ষে স্বাক্ষর করিবেন; তৎপরে নবীনচন্দ্র একটা উইল লিখিয়া কৃষ্ণকামিনীকে তাঁহার সমুদায় সম্পত্তির স্বত্বভাগিনী করিবেন। তদনুরূপ প্রণালীতেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। যে প্রতিজ্ঞাপত্রে নবীনচন্দ্র ও কৃষ্ণকামিনী স্বাক্ষর করিলেন, তাহাতে ব্রজরাজ, পণ্ডু, মিশনারী সাহেব ও পুলিশ সাহেবেরও স্বাক্ষর রহিল।

বিবাহের আমোদ প্রমোদ কিছুই হইল না। নবীনচন্দ্র পুলিশ সাহেবকে বলিয়া আরও দুইদিন পাহারা রাখিলেন। দুই দিনের মধ্যে তিনি রাঙ্গা মার সমুদায় বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহার পূর্বপরিচিত একজন বন্ধুকে সপরিবারে সেই বাড়ীতে রাখিবার পরামর্শ স্থির করিলেন।

দুই দিন পরে তাঁহারা রাত্রিকালে নৌকাযোগে কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে আসিয়া রেলগাড়ি ধরিয়াছিলেন। নবরত্ন সভার সভ্যগণ পূর্ব হইতেই সংবাদ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হইয়া মালাচন্দন দিয়া বর ও কন্যাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। দুই এক দিনের মধ্যে বর কন্যার সম্মানার্থ নবরত্ন সভার সভ্যদিগের একটা মহাভোজ হইয়া গেল। আনন্দ ও উৎসাহের সীমা পরিসীমা নাই।

নবীনচন্দ্র গ্রীষ্মের অবকাশকাল কলিকাতাতেই বন্ধুদিগের সহিত যাপন

করিলেন। এই সময়ের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিয়া গেল, যাহার অনুরূপ ঘটনা কেহ কখনও শুনে নাই। তাহা বর্ণন করিবার পূর্বে পূর্ববৃত্তান্ত কিছু বলা আবশ্যক। ইহা অনেকে অনেকবার দেখিয়া থাকিবেন যে, সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালিলে সময়ে সময়ে এক একটা পতঙ্গ আসিয়া সেই অগ্নিতে পড়িতে চায়। বসিয়া আছি, দুজনে কথাবার্তা কহিতেছি; হঠাৎ দেখা গেল, একটা পতঙ্গ প্রদীপের চারদিকে ঘুরিতেছে; একজন বলিলেন,—"পোকাটা তাড়িয়ে দেও ত, আগুনে পড়ে মর্‌বে।" উঠিয়া পতঙ্গটীকে তাড়াইয়া দেওয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, আবার আসিয়াছে। আবার পূর্বোক্ত ব্যক্তি বলিলেন,—"মর্‌ আবার এল, ধরে পোকাটাকে জানালা দিয়ে ফেলে দেও ত।" সেবার উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া গেল। আপদ শান্তি, একটা জীবের জীবন রক্ষা হইল। সকলে নিশ্চিন্ত আছি, হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিলেন,—"যা, আবার এসে আগুনে পড়্‌লো. মরে তার পর ছাড়লে!" হায়! হায়! এ জগতে কোনও কোনও মানুষের যেন এই দশা হয় দেখি! তাহারা পাপানলে না পুড়িয়া না মরিয়া ছাড়ে না। আত্মীয় স্বজন বার বার সতর্ক করে, নিষেধ করে, শাসন করে, কিছুতেই কিছু হয় না; কিছুতেই তাহারা দুষ্প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারে না; পাপানলেই আত্ম-সমর্পণ করে এবং ধনে প্রাণে সারা হয়। হতভাগিনী মাতঙ্গিনীর সেই দশা ঘটিল। সকলে অবগত আছেন যে, কৃষ্ণকামিনীর রোগশয্যা হইতে উঠিয়া গৃহে যাইবার সময়ে শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয় এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিলেন যে, তৎপর দিবসই উমাশঙ্করকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবেন। বাড়ীতে গিয়াই সে পরামর্শ পরবর্তিত হইয়া যায়। উমাশঙ্করকে হঠাৎ কিছু বলা অপেক্ষা মাতঙ্গিনীকে সাবধান করিয়া দেওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন। তদনুসারে মাতঙ্গিনীকে নির্জনে ডাকিয়া, বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেন। ইহার দুই দিন পরেই উমাশঙ্কর আপনা হইতে চলিয়া গেল; এবং এক মাস পরেই কলিকাতার হোগলকুঁড়েতে একটী বাড়ী ক্রয় করিল। সেখানে মধ্যে মধ্যে সপরিবারে বাস করিত, কখনও কখনও একাকী আসিয়া থাকিত। উমাশঙ্কর চলিয়া যাওয়ার পর গোপনে মাতঙ্গিনীর সহিত চিঠিপত্র চলিতে লাগিল। কিছুদিন কেহ কিছু লক্ষ্য করিতে পারিল না। একদিন মাতঙ্গিনীর অনুপস্থিতকালে মিত্রজ মহাশয় কোনও কার্যে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ উমাশঙ্করের হস্তলিখিত একখানি চিঠির খাম কুড়াইয়া পাইলেন। উপরে বাড়ীর অপর একজন লোকের নাম। মাতঙ্গিনীর ঘরে ঐ খাম পাইয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল; অন্বেষণ করিতে করিতে তাহার বালিশের নিম্নে উমাশঙ্করের লিখিত এক পত্র পাইলেন। তাহা পাঠ করিয়া তিনি কোপে জ্বলিতে লাগিলেন। সেইদিন রাত্রে মাতঙ্গিনীকে নির্জন ঘরে ডাকিয়া যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন; এবং তৎপর দিবস মাতঙ্গিনীর দেবরকে ডাকাইয়া তাহার শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার দেবরের বাসা বাহির সিমলা। মাতঙ্গিনী সেখানে এক প্রকারে কয়েদ বাস করিতে লাগিল। ডাকে পত্রাদি যে লিখিত, তাহারও সুবিধা আর থাকিল না। এইরূপে কয়েক মাস চলিয়া গেল। দুষ্ট লোকের কত বুদ্ধিই যোগায়! উমাশঙ্কর পরামর্শ করিয়া মাতঙ্গিনীর সহিত চিঠিপত্র চালাচালি করিবার এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিল। তখন কলিকাতাতে বেদের মেয়েরা অনেক সময় পাড়ায় পাড়ায় মিশি বিক্রয় করিত। এই সকল স্ত্রীলোক সচরাচর পুরুষেরা আপীসে গেলে বাহির হইত, এবং "বাত ভাল করিগো—ও—ও;"

"দাঁতের পোকা বার করিগো—ও—ও", প্রভৃতি হাঁকিয়া যাইত। উমাশঙ্কর এইরূপ একটা স্ত্রীলোককে টাকা দিয়া হাত করিল, এবং তাহার দ্বারা চিঠিপত্র চালাচালি আরম্ভ করিল।

স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুরে এই বেদের মেয়েদের অবারিত গতি; সুতরাং সে অবাধে গিয়া মাতঙ্গিনীর সহিত কথা কহিত, এবং একটু নির্জন হইলে চিঠিপত্র দিত ও আনিত। এইরূপে চিঠিপত্র চলিতে লাগিল; জন-মানব কেহই জানিতে পারিল না। কয়েক মাস পরে মিত্রজ মহাশয় এবং মাতঙ্গিনীর দেবর উভয়েরই বিশ্বাস জন্মিল যে আর তাঁহাদের আশঙ্কার কারণ নাই। তখন তাঁহারা মাতঙ্গিনীকে পূর্বের ন্যায় একজন চাকরাণীর সঙ্গে গাড়ি করিয়া এক বাড়ী হইতে আর এক বাড়ীতে যাইতে দিতেন। মাতঙ্গিনী মধ্যে মধ্যে দেবরের বাড়ী হইতে পিত্রালয়ে যাইত। একদিন জানিতে পারা গেল যে সে বেলা ১১টা কি ১২টার সময়ে বাগবাজারের বাড়ী হইতে গাড়ি করিয়া বাহির হইয়াছিল, কিন্তু ৫টার পূর্বে বাহির সিমলাতে দেবরের বাড়ীতে পেঁছে নাই। সঙ্গে বামী চাকরাণী ছিল। মাতঙ্গিনীর দেবর এই বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মাতঙ্গিনী বলিল যে, পথে আসিবার সময় তাহার ভগিনীর অর্থাৎ ব্রজরাজের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে। তাহার দেবর গুরুচরণ দত্ত অতি ভদ্রলোক, তিনি তাহাই বিশ্বাস করিলেন। অথচ মাতঙ্গিনী সেদিন ব্রজরাজদিগের বাড়ীতে যায় নাই। তৎপরে মাতঙ্গিনী যেদিন এক বাড়ী হইতে আর এক বাড়ীতে পেঁছিতে বিলম্ব করিত, সে দিন একবার নামমাত্র ব্রজরাজদিগের ভবনে পদার্পণ করিয়া যাইত। যেন বলিতে পারে সে সেখানে গিয়াছিল। যে পৌষমাসে কৃষ্ণকামিনীর বিবাহ সম্বন্ধের সংবাদ মিত্রজ মহাশয়ের কর্ণগোচর হয়, সেই পৌষমাসে একদিন মথুরেশ আসিয়া স্বীয় জননীকে বলিলেন,—"দেখ মা, আমি পথ দিয়া আস্‌ছিলাম, দূর হতে যেন দেখলাম ছোট মাসী উমাশঙ্করবাবুর বাড়ীর খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে উঠ্‌লো; সঙ্গে যেন বামী চাক্‌রাণীও আছে।"

ঘোষগৃহিণী। দূর্, তা কি হয়? তোর দেখবার ভুল হয়েছে; তাদের বাড়ীর মেয়েরা ত এখানে নেই; মাতী সেখানে কোথায় যাবে?

মথুরেশ। তবে তাই হবে, আমারই দেখবার ভুল হয়েছে।

ইহার পরে এ সকল চিন্তা আর কাহারও মনে রহিল না।

যে বৈশাখে নবীনচন্দ্র নবপরিণীতা পত্নীসহ নবরত্নের বন্ধুদের মধ্যে বাস করিতেছেন এবং শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয় নবদম্পতীকে মনে মনে অভিসম্পাত করিতেছেন, সেই বৈশাখের শেষ ভাগে একদিন রাত্রি প্রায় ৯টার সময়ে উমাশঙ্কর নিজ ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিত্রজ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইল। তাহার আকৃতিতে মানসিক উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তার লক্ষণ ছিল, কিন্তু মিত্রজ মহাশয় সেদিকে তত লক্ষ্য করিলেন না। উমাশঙ্কর বলিল যে সে পরদিন প্রাতে স্বীয় বাসগ্রামে গমন করিবে, ভগিনীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে। বাহিরের ঘরে মিত্রজ মহাশয়ের সহিত তাহার এই সকল কথা হইতেছে এমন সময়ে মাতঙ্গিনীর দেবর গুরুচরণ দত্ত, অতিশয় উদ্বিগ্নভাবে সে স্থানে উপস্থিত হইলেন।

মিত্রজ। কিহে গুরুচরণ, এত রাত্রে যে?

গুরুচরণ। নির্জনে একটু কথা আছে।

উমাশঙ্কর। আমি দিদির সঙ্গে দেখা করতে বাড়ীর ভিতর যাচ্ছি, আপনারা এইখানেই কথা বলুন। (বলিয়া চলিয়া গেল)।

মিত্রজ। এই ত নির্জন হলো, কি বলবে বলো।

গুরুচরণ। কি আর বলবো, সর্বনাশ হয়েছে! সন্ধ্যার পর হতে বৌকে আর বাড়ীতে পাওয়া যাচ্ছে না।

মিত্রজ। সে কি! যাবে কোথায়? দীনতারিণীর (ব্রজরাজের মাতার নাম) বাড়ীতে তাকে যেতে বারণ করেছি, সেখানে ত যাবে না; তবে কোথায় গেল? বাড়ীর কেউ কিছু বলতে পারে না?

গুরুচরণ। না, কারুকে কিছু বলে যায় নি।

মিত্রজ। সে কি, আজ কাল তোমাদের মনে কারুর প্রতি কোনও সন্দেহ হয়েছে?

গুরুচরণ। না, বেশ ত মন দিয়ে ঘরের কাজ কর্ম করছিলেন সেরূপ কিছুই ত দেখিনি!

মিত্রজ। উমাশঙ্করের বিষয়ে ত আর কিছু ভাববার যো নেই, সে ত এই বাড়ীতেই উপস্থিত।

গুরুচরণ। তাই ত দেখছি। ব্যাপারটা কি বুঝতে ত পারছি না।

মিত্রজ। যা হোক, যে যে জায়গায় যাবার সম্ভাবনা একবার খুঁজতে চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

এই বলিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া গৃহিণীকে কেবল এই মাত্র বলিলেন—"মাতী না বলে দেবরের বাড়ী থেকে কোথায় গেছে, তাকে খুঁজতে চললাম।" এই বলিয়া চাদরখানি স্কন্ধে লইয়া গুরুচরণের সহিত বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহারা গেলেই মিত্রগৃহিণী বলিলেন, "নিজের ঘর সামলাতে পারেন না, কেবল পরের উপরে শাসন করে বেড়ান। এখন ত আমার ভাইকে কিছু বলবার যো নেই।" উমাশঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া—"ভাগ্যে তুমি দিন বুঝে আজ এসেছিলে, তা না হলে নিশ্চয় তোমাকে দোষী করতেন।"

উমাশঙ্কর। তাই ত দেখছি। যা হোক এটা একটা বিপদ বলতে হবে। শ্যামচাঁদ বাবু ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্চে।

মিত্রগৃহিণী। এত রাত্রে আর যাবে কেন, আজ এখানে থেকেই যাও।

উমাশঙ্কর। আচ্ছা, তবে বাহিরের ঘরে বিছানা করে দিতে বল।

উমাশঙ্কর বাহিরের ঘরে গিয়া মিত্রজ মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার ফিরিতে রাত্রি প্রায় ১১টা কি ১১৷৷০টা বাজিয়া গেল। আসিয়া বলিলেন, মাতঙ্গিনীর উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

পরদিন প্রাতে জনরব উঠিল যে নারিকেল ডাঙ্গার খালের ধারে এক ঝোপের পাশে একটি সধবা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। মেয়েটী রূপবতী, দেখিলে বোধ হয় ভদ্র ঘরের মেয়ে; বয়স ২৩।২৪, পরিধানে লাল কস্তাপেড়ে ধুতি, পায়ে মল, হাতে লোহা, বালা ও শাঁকা; সিঁথিতে সিঁদুর। মিত্রজ মহাশয়ের বাড়ীর বা তৎসংক্রান্ত কোনও বাড়ীর কাহারও কোনও সন্দেহ হইল না, যে ঐ মৃতদেহ মাতঙ্গিনীর হইতে পারে। কিন্তু গুরুচরণ দত্ত মহাশয় আপীসে গিয়া এই সংবাদ যখন শুনিলেন, তখন কি জানি কেন, তাঁহার মনে হইল যে সকাল সকাল আপীস হইতে ছুটী লইয়া মেডিকেল কালেজে গিয়া দেখিতে হইবে এ মৃতদেহ মাতঙ্গিনীর কি না। তিনি যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে। মৃতদেহের

ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখেন, সেই গৌরাঙ্গী, তারুণ্য-পূর্ণা, নারীমূর্তি সম্মুখে প্রসারিত! দেহের কুত্রাপি কোনও প্রকার বলপ্রয়োগের বা অত্যাচারের চিহ্ন মাত্র নাই। দেখিয়াই তিনি একেবারে মিত্রজ মহাশয়ের আপীসে গিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া এই সংবাদ দিলেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে চাপিয়া যাইতে হইবে, কাহারও নিকট এ সংবাদ প্রকাশ করা হইবে না; কারণ ইহা বড় কলঙ্কের কথা। চাপিয়া রাখুন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু এই আঘাতে মিত্রজ মহাশয়কে একেবারে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল। তিনি আপীসে আর কাজ করিতে পারিলেন না; অসুখ করিয়াছে বলিয়া ছুটী লইয়া গৃহে আসিলেন। গৃহিণীকে কিছুই ভাঙ্গিয়া বলিলেন না; সে রাত্রে কিছু আহার করিলেন না; শয্যাতে পড়িয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর এই ভগিনীটী তাঁহার আদুরে বোন ছিল। সে যখন যাহা চাহিয়াছে, তাহাই দিয়াছেন, টাকাকে টাকা জ্ঞান করেন নাই। বিধবা হইলে সে কিরূপে সুখে থাকিবে. এই চিন্তা সর্বদা তাঁহার মনে প্রবল থাকিত। এত আদর পাইয়াই বোধ হয় মাতঙ্গিনী আত্মশাসন করিতে শিখে নাই; তাহার সাজা এই হইল।

পরদিন প্রাতে খবরের কাগজে এই রমণীর আকৃতির বিবরণ প্রভৃতি প্রকাশিত হইল, এবং ইহা লিখিত হইল যে, "লোকলজ্জার ভয়ে এই হত্যা হইয়াছে; এরূপ অনুমান হয় স্ত্রীলোকটী সধবা ছিল না; সধবার বেশ একটা কৌশল মাত্র। কুক্ষিমধ্যে এক প্রকার বিষ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু কে হত্যা করিয়াছে তাহার কোনও উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না।" মিত্রজ মহাশয় কয়েকদিন আপীসে যাইতে পারিলেন না, পড়িয়া পড়িয়া কেবল ভাবিতে লাগিলেন,—"এর চেয়ে হতভাগী বিয়ে করলো না কেন?"

ক্রমে আত্মীয় স্বজন সকলেই জানিতে পারিল, যে ঐ হতা রমণী মাতঙ্গিনী। কিন্তু কে হত্যাকারী, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিল না। উমাশঙ্কর সেদিন মিত্রজ মহাশয়ের ভবনে না থাকিলে তাহার উপরেই সকলের সন্দেহ পড়িত। এ যাত্রা তাহাকে কেহই সন্দেহ করিতে পারিল না। কিন্তু বোধ হয় আপনাদের কাহার কাহারও সন্দেহ হইতেছে, যে ঐ ভীষণ হত্যাকাণ্ড উমাশঙ্করেরই কার্য। তাহাই বটে। মানুষ যে পাপে এমন পরিপক্ক হইতে পারে তাহা আমরা অগ্রে জানিতাম না। উমাশংকর যেরূপে এই সুখের প্রজাপতিটীর জীবনদীপ নির্বাণ করিয়াছে, তাহা আর বলিতে ইচ্ছা করিতেছে না। যদি সকল কথা বলিতে পারিতাম, সকলে দেখিতে পাইতেন. স্ত্রীলোক হাজার অসৎ হইলেও, তাহার ভালবাসিবার শক্তি, বিশ্বাস করিবার শক্তি ও সরলতা একেবারে বিলুপ্ত হয় না; কিন্তু পুরুষ অসৎ হইলে তাহার অসাধ্য দুষ্কর্ম অতি অল্পই থাকে। হায়! হায়! মৃত্যুর দুই মিনিট পূর্বেও মাতঙ্গিনী ভাবিতেছিল. যে সধবা সাজিয়া, লোকচক্ষু এড়াইয়া সে নিজ প্রেমাস্পদের সহিত স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে বিহার করিতে যাইতেছে। যখন বিষ তাহার গলে ঢালিয়া দেওয়া হয় তখনও সে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "আমাকে কি খাওয়াচ্চ?" এবং এই নরাকৃতি পিশাচ তখনও হাসিয়া বলিয়াছে,—"খেয়েই দেখ না।" এ পাপের চিত্র আর অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করে না। প্রাচীন সংস্কৃত কবির সহিত একবাক্যে বলিতে ইচ্ছা করিতেছে,—

"উপকারিণি বিশ্রব্ধে শুদ্ধমতৌ যঃ সমাচরতি পাপং
তং জনমসত্যসন্ধং ভগবতি বসুধে কথং বহসি!"

অর্থ—"উপকারী, বিশ্বাস-পরায়ণ ও সরল-চিত্ত ব্যক্তির প্রতি যে পাপাচরণ করিতে পারে, সে প্রবঞ্চকের ভার হে ধরণি! তুমি আর কেন বহন কর?"

২৩

গ্রীষ্মাবকাশের অন্তে নবীনচন্দ্র সস্ত্রীক ফরিদপুরে উপস্থিত হইলেন। সহরের মধ্যে জনরব পড়িয়া গেল, হেড মাষ্টার বিধবা বিবাহ করিয়া সপরিবারে আসিয়াছেন। পাড়ার নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা দলে দলে কৃষ্ণকামিনীকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। সহরের ভদ্র গৃহস্থ গৃহের গৃহিণীরাও দাসী প্রেরণ করিয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন। যেই দেখিয়া যায়, সেই কৃষ্ণকামিনীর রূপ গুণের প্রশংসা করে। ওদিকে সহরের ভদ্রলোকদিগের মধ্যে ঘোর দলাদলি বাঁধিয়া গেল। কতকগুলি লোক অতিশয় বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, —"বিবাহের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, কাশী হইতে স্ত্রীলোকটীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।" যাঁহারা বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাঁহারাও বিধবা-বিবাহ বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন।

এই গোলমালে নবীনচন্দ্র অগ্রে যে সকল কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইল। সর্বাগ্রে ছেলেদের দলটী ভাঙ্গিয়া গেল। কর্তৃপক্ষগণ স্বীয় স্বীয় গৃহের বালকদিগকে হেড মাষ্টারের দলে থাকিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। সুরাপাননিবারিণী সভাটীও এক প্রকার উঠিয়া গেল। যাঁহারা নবীনচন্দ্রের সহিত মিশিতেন, এরূপ দুই একজন সভ্য ব্যতীত আর সকলেই সভাতে আসা পরিত্যাগ করিলেন। বঙ্গভাষাসমালোচনী সভাটীর বিশেষ ক্ষতি হইল না; কারণ তাহাতে যে কয়জন উৎসাহী লোক ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নবীনচন্দ্রের সহিত প্রায় প্রতিদিন রাত্রে মিশিতেন, সুতরাং সকলেই প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় স্কুল ঘরে আসিয়া পাঠাদি করিতে লাগিলেন। ধর্মালোচনা সভার দুই একজন সভ্য ভিন্ন সকলেই পূর্ব্ববৎ রহিলেন। তাঁহাদের সহিত নবীনচন্দ্রের গূঢ় আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না।

বৃদ্ধ বাগচী মহাশয়ের ভাব দেখিয়া নবীনচন্দ্রের মন মুগ্ধ হইয়া গেল। তিনি বিরোধী দলের নির্যাতন চেষ্টা দেখিয়া নিতান্ত বিরক্ত হইয়া গেলেন; এবং নবীনচন্দ্রের প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসা দেখাইতে লাগিলেন। ফরিদপুরে পৌঁছিবার কয়েকদিন পরেই একদিন প্রাতে নবীনচন্দ্র বাগচী মহাশয়কে ডাকিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন এবং কৃষ্ণকামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন—"কৃষ্ণকামিনী! এই বাগচী মহাশয়, এঁর কথা ত তোমাকে বলেছি, উনি আমাদের পিতৃস্থানীয়, তোমাকে দেখতে এসেছেন।" কৃষ্ণকামিনী আসিয়া গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চরণে প্রণতা হইলেন ও পদধূলি লইলেন। বাগচী মহাশয় দুই চারিটী মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যে কয়েকজন নবীনচন্দ্রের শ্রদ্ধাভাজন ও আত্মীয় ছিলেন, তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণকামিনীর পরিচয় হইয়া গেল। যে কেহ একবার তাঁহার সহিত আলাপ করেন, তিনিই তাঁহার বিনয়,

সৌজন্য ও সাধুতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান, এবং বাহিরে গিয়া লোকের নিকটে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। এইরূপে হেড মাষ্টারের নবপরিণীতা পত্নীর প্রশংসা সেই ক্ষুদ্র সহরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

আর এক শ্রেণীর লোকে এই প্রশংসাতে যোগ দিল। নবীনচন্দ্রের বাসার সন্নিকটস্থ পল্লীর দরিদ্র লোক সকল কৃষ্ণকামিনীর সদয় ব্যবহারে অতিশয় প্রীত হইয়া চারিদিকে তাঁহার গুণের কথা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেবল ইহাও নহে, নবীনচন্দ্র ফরিদপুরে পেঁাছিয়াই তৎপরদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও তাঁহার মেমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কথোপকথনের মধ্যে কৃষ্ণকামিনীর নির্বাসন, অন্বেষণ, উদ্ধার ও বিবাহ সংক্রান্ত সমুদায় ঘটনা বর্ণন করিয়াছিলেন। দুই এক দিনের পরেই একদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সস্ত্রীক তাঁহাদের ভবনে বেড়াইতে আসিলেন। মেম কৃষ্ণকামিনীকে অনেক ভালবাসার কথা বলিলেন।

এই সকল কারণে বিরোধী দলের বিদ্বেষ যেন আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা নবীনচন্দ্রের নামে নানা প্রকার অখ্যাতি রটনা করিতে লাগিলেন। হেড মাষ্টারের বাড়ীতে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বাবুদের আড্ডা হয়, সেখানে মদ্য মাংস চলে, হেড মাষ্টারের স্ত্রী তাহার ভিতর থাকেন; বৃদ্ধ বাগ্‌চীকে মুরগীর ঝোল খাওয়াইয়াছে, বাগ্‌চী প্রথমে খাইতে চান নাই, ছোঁড়ারা ধরিয়া নাকে ঢালিয়া দিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এদিকে বেচারা নবীন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 'বাহ্যবস্তু' পড়িয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই নিরামিষাশী। কৃষ্ণকামিনীও একে ভক্ত বৈষ্ণবের কন্যা, তাহাতে হিন্দুর ঘরের বিধবা, বাল্যকাল হইতে আমিষ ভক্ষণের অভ্যাস নাই। তাঁহাদের ভবনে বিড়ালটী আসিলে তাহাকেও তপস্বীর ন্যায় নিরামিষাশী থাকিতে হয়। নিন্দুক লোকে কি এ সকল বিষয় দেখে, না গণনা করে? এরূপ নানা কথা লোকের মুখে ঘুরিতে লাগিল।

এ দিকে কৃষ্ণকামিনী গৃহধর্মে নূতন ব্রতী হইয়া সংসার মধ্যে অতি সুন্দর শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। মানুষ যতদিন না নিজের ক্ষেত্র পায়, কাজ করিবার স্বাধীনতা ও সুবিধা না পায়, ততদিন তাহার ভিতরে কি আছে তাহা জানিতে পারা যায় না। কৃষ্ণকামিনীর মধ্যে যে এতটা গৃহস্থালি ছিল, তাহা তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণও এতদিন বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার সেই সকল সদ্‌গুণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোনও স্থানেও একটু অপরিষ্কার কিছু নাই; সমুদায় দ্রব্য সুশৃঙ্খলরূপে সজ্জিত; যেটী যেখানে থাকা আবশ্যক, সেটী সেইখানেই আছে; তাঁহার রুচি এমনি সুন্দর যে এক মাস না যাইতে যাইতে বাড়ীখানি যেন ছবিখানির মত হইয়া উঠিল। এক দিন ম্যাজিষ্ট্রেটের মেম বেড়াইতে আসিয়া বাড়ীর পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন; এবং ঘরে গিয়াই কতকগুলি ফুলের টব পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণকামিনী ফুলগাছগুলি পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন, এবং যেখানে যেটী দিলে সুন্দর দেখায় সেখানে সেটীকে বসাইলেন।

গৃহটী এইরূপে সুসজ্জিত হইল। তাঁহাদের সময়ও সেইরূপ সুশৃঙ্খল ভাবে অতিবাহিত হইতে লাগিল। যে ভৃত্যটী অগ্রে রন্ধন করিত, লোকে তাহাকে একঘরে করিবার ভয় প্রদর্শন করাতে সে ছাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই: কৃষ্ণকামিনী রন্ধন কার্যে সুপরিপক্ক। তাঁহারা উভয়ে অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করেন, মুখপ্রক্ষালনাদির পরে 'ধ্যান-মন্দিরে' প্রবেশ করেন। কৃষ্ণকামিনী এতদর্থে

ঠাকুর ঘরের ন্যায় একটী ঘর রাখিয়াছেন, তাহা কেবল পাঠ চিন্তা ও ঈশ্বরারাধনার জন্যই ব্যবহৃত হয়, অন্য কার্যে ব্যবহৃত হয় না; নবীনচন্দ্র তাহাকে 'ধ্যান-মন্দির' বলিয়া থাকেন। সেখানে প্রবেশ করিয়া প্রথমে কোনও ধর্ম-গ্রন্থ হইতে নবীনচন্দ্র কিয়দংশ পাঠ করেন, তৎপরে উভয়ে একটী স্তোত্র পাঠ করেন, তৎপরে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে ধ্যান ও দিবসের কার্যের বিষয়ে চিন্তা করেন; তৎপরে নবীনচন্দ্র বায়ু সেবন করিতে বহির্গত হন এবং কৃষ্ণকামিনী গৃহকার্যে রত হন। এই সমুদায় কার্য যথাসময়ে নির্বাহ হইয়া থাকে। আত্মোন্নতির জন্য উভয়ের অত্যন্ত মনোযোগ। এক মাস না যাইতে যাইতে নবীনচন্দ্র কৃষ্ণকামিনীকে ইংরাজী পড়াইবার জন্য মাসিক ১০ টাকা বেতনে তাঁহার অনুগত, স্কুলের একটী শিক্ষককে নিযুক্ত করিলেন, এবং নিজে তাঁহাকে উদ্ভিদবিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। এইরূপে জ্ঞানালোচনা চলিল।

কিন্তু ধর্মালোচনা সভাতেই কৃষ্ণকামিনীর প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ প্রকাশ পাইত। তিনি যখন ভক্তিভাবে ঈশ্বরের গুণকীর্তন শুনিতে বসিতেন, তখন তাঁহার বিনীত, পবিত্র ও প্রেমোজ্জ্বল মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অতি পাষণ্ডেরও মনে ভক্তিরসের সঞ্চার হইত। বাগ্‌চী মহাশয় যখন ভক্তিতত্ত্বের গান সকল করিতেন, তখন কৃষ্ণকামিনীর বিমল মুখমণ্ডলের উপরে দর দর ধারে ভক্তি-অশ্রু প্রবাহিত হইত। তাহা দেখিয়া বাগ্‌চী মহাশয় এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে কৃষ্ণকামিনীকে মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "মা তুমি সাক্ষাৎ মীরাবাই, তুমি আর জন্মে মীরা ছিলে।" একদিন নবীন বাগ্‌চী মহাশয়কে বলিলেন,—"আপনার পুত্রবধূ বেশ গাইতে পারেন, আপনি বুঝি তা জানেন না? আপনাকে একটু গেয়ে শোনাবার জন্যে কত বলি, তা উনি কিছুতেই গাবেন না, বড় লজ্জা।"

বাগ্‌চী মহাশয়। ভগবানের নাম করবে তাতে লজ্জা কি মা? এদেশের মেয়েরা বিবাহের সময় কত গান করে, তাতে লজ্জা হয় না, তুমি পরমেশ্বরের মহিমা কীর্তন করবে তাতে লজ্জা?

কৃষ্ণকামিনী। ওঁর কথা আপনি শোনেন কেন? আমি গাইতে জানি না, পণ্ডু বাবুর গান শুনে শুনে এক আধটু শিখেছি।

বাগ্‌চী মহাশয়। আচ্ছা, তাই একটু গাও দেখি?

নবীনচন্দ্র এবং বাগ্‌চী মহাশয় দুইজনে অনেক অনুরোধ করিতে করিতে কৃষ্ণকামিনী অতিশয় সঙ্কুচিত ভাবে, ভক্তির সহিত একটী সঙ্গীত গাইলেন। শুনিয়া বাগ্‌চী মহাশয় শত শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

তৎপরে এই স্থির হইল যে, বাগ্‌চী মহাশয় সপ্তাহে দুই দিন আসিয়া তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্বের সঙ্গীত সকল শিখাইবেন। সেইরূপ বন্দোবস্তে কার্য চলিল। এইরূপ এক প্রকার সুখেই তাঁহাদের দিন কাটিয়া যাইতেছে; এমন সময়ে হঠাৎ একদিন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্‌টারের আপীস হইতে হেড মাষ্টারের নামে একখানি কাগজ আসিল। নবীনচন্দ্র পড়িয়া দেখিলেন, যে ফরিদপুরের কতকগুলি লোক নাম স্বাক্ষর করিয়া ডিরেক্‌টারের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে হেড মাষ্টারের পদ হইতে অপসৃত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। অভিযোগকারীরা বলিয়াছেন—হেড মাষ্টার গ্রীষ্মের ছুটীর পর আসিবার সময় একটী স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন, ঐ স্ত্রীলোক তাঁহার বিবাহিতা পত্নী নহে; তাহার স্বভাব চরিত্র অতিশয় মন্দ, সে অতি বেহায়া, সকলের সঙ্গে বসিয়া

গান বাজনা করে; এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর হেড মাস্টারের ভবনে বাবুদের বৈঠক হয়, তাহাতে সুরাপান ও অখাদ্য ভোজন প্রভৃতি চলে, এতদ্বারা বালকদের নীতি অতিশয় দূষিত হইবার সম্ভাবনা। এই দরখাস্তের একটা নকল স্কুল কমিটীর সভাপতি গ্রীভ সাহেবেরও নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ দরখাস্ত দেখিয়া স্বাক্ষরকারীদিগের প্রতি একেবারে চটিয়া গেলেন এবং তাহাদের নামে নালিস করিবার জন্য নবীনচন্দ্রকে প্ররোচনা দিতে লাগিলেন। নবীন স্বাক্ষরকারীদিগের প্রায় সকলকেই চিনিতেন। তাঁহারা অল্পশিক্ষিত সেকেলে লোক। অনেকে লোকমুখে শুনিয়া সরল ভাবে বিশ্বাস করিয়াই তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র কোন ক্রমেই ইঁহাদের নামে নালিস করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তাঁহার উত্তর ডিরেক্টার আপীসে প্রেরিত হইল। সেই সঙ্গে গ্রীভ সাহেব ডিরেক্টারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

Dear Mr. Young,

The charges brought against the Head-master of the local school are unfounded and malicious. I have personally examined his marriage-certificate. It bears the signatures of a European missionary, Mr. Mervin, and of a European police officer of Benares, in whose presence the ceremony was performed. Babu Nobin Chander Bose, whom I have known both as a teacher and as a citizen, for the last two years, is a man of high principles, actuated by everything good. He is manly and honourable to his backbone. That marriage itself is a proof of the sincerity of his convictions. He has brought home an estimable and lovable young woman who in every fiber of her nature is a lady. To tell you the truth, we look upon them more as our friends and equals than as our inferiors and subordinates.

Then as to the charge of having drinking bouts in his house, nothing is farther from the truth. On the contrary, if my information be correct, and it is derived from the most trustworthy sources. the quiet evening parties, in his drawing-room, have been largely instrumental in saving several educated Bengalees of the station, from a drunken and disorderly life. Besides, Baboo Nobin Chunder himself is a staunch temperance man.

I have advised him to sue the malicious persons who have signed that petition, for libel, and I hope you will agree with me in this. But the man is so gentle, and so forgiving, that, he would not stir even to vindicate his own character from unmerited slur. He seems to illustrate in his life, the

well-known principle of the Founder of our religion—"Bless them that curse you; do good to them that hate you."

Your very sincerely
H. J. GREIVE

পূর্বোক্ত পত্রের তাৎপর্য এই :—

হেড মাষ্টারের নামে যে সকল অভিযোগ হইয়াছে, তাহার সমস্তই অমূলক ও বিদ্বেষপূর্ণ। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে ইঁহাদের বিবাহের সার্টিফিকেট দেখিয়াছেন। তাহাতে একজন ইউরোপীয় মিশনারী ও কাশীর একজন ইউরোপীয় পুলিশ অফিসারের স্বাক্ষর আছে। নবীন চন্দ্র বসু একজন সৎলোক এবং তিনি যে যুবতীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলেই শ্রদ্ধা হয়, এবং ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে; তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ভদ্রমহিলা নাম পাইবার উপযুক্ত।

আর তাঁহার বাড়ীতে মাতালদের জটলা হইবার কথা যে লিখিয়াছে, এমন মিথ্যা আর কিছুই হইতে পারে না। তিনি যতদূর অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছেন, তাহাতে এই প্রমাণ পাইয়াছেন যে সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাড়ীতে যাওয়াতে অনেকে সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছে।

এই সকল জানিয়া তিনি বাবু নবীনচন্দ্রকে এই স্বাক্ষরকারীদিগের নামে নালিস করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু তিনি এমনি শান্ত-স্বভাব ও ক্ষমাশীল যে আপনাকে এই অযথা নিন্দা হইতে রক্ষা করিবার জন্যও কিছু করিতে প্রস্তুত নহেন।

এই সকল গোলমাল কাটিয়া যাইতে প্রায় পূজার সময় উপস্থিত হইল। পূজার সময়ে নবীন ও কৃষ্ণকামিনীর কলিকাতাতে যাইবার কথা ছিল; কিন্তু এবারে তাঁহারা বিশেষ কার্যে ফরিদপুরেই আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এবারে পদ্মার জল ভয়ানক বাড়িয়াছে; চারিদিকের গ্রামসকল জল-প্লাবিত হইয়া গিয়াছে; শত শত দরিদ্র লোক গৃহ-হীন হইয়া ফরিদপুর সহরে আসিয়াছে; তাহাদের উদরে অন্ন নাই; মস্তক রাখিবার স্থান নাই। এই দুর্ঘটনা ঘটিবামাত্র নবীনচন্দ্র তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত সম্মিলিত হইয়া একটী রিলীফ কমিটি (সাহায্যসভা) গঠন করিলেন, এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ও জেলার অন্যান্য পদস্থ লোকদের নিকট হইতে টাকা তুলিলেন, এবং কলিকাতার নবরত্ন সভার বন্ধুদিগের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিলেন; তদ্দ্বারা তাঁহার ভবনের অনতিদূরে একটা উচ্চ ভূমির উপর ঐ সকল লোকের থাকিবার জন্য শীঘ্র শীঘ্র কতকগুলি চালা নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন। সেই চালাতে তাহারা মস্তক রাখিবার স্থান পাইল। তৎপরে, তাহাদিগকে কার্যে ব্যস্ত রাখিবার জন্য, ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম লইয়া, কয়েকটী পুরাতন রাস্তাতে মাটি ফেলিয়া মেরামত আরম্ভ করিলেন, এবং কয়েকজন লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে প্রতিদিন চাউল বিতরণ করিতে লাগিলেন। এমন শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থার সহিত এই কার্য চলিতে লাগিল, যে এক দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নবীনচন্দ্রকে বলিলেন,—"তোমার হেড মাষ্টার না থাকিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়াই উচিত ছিল; তোমার কাজ করিবার শক্তি অদ্ভুত দেখিতেছি।"

নবীনচন্দ্র এই সকল কার্যে ব্যস্ত। ও-দিকে কৃষ্ণকামিনী বাগ্‌চী মহাশয়কে

সঙ্গে করিয়া দরিদ্রদের চালায় চালায় ঘুরিতেছেন, ও কে কেমন আছে তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কিন্তু হায়! তাহাদের অন্নকষ্টের এক প্রকার উপায় হইতে না হইতে তাহাদিগকে আর এক বিপদে ধরিল! তাহাদের মধ্যে ওলাউঠা দেখা দিল। এইবার নবীনচন্দ্রের এক নূতন বিদ্যা কাজে লাগিল। পূর্বেই বলিয়াছি তাঁহার স্বভাব এ প্রকার ছিল, কোনও একটা নূতন বিষয় তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার তদন্ত না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি যত নূতন বিষয় শিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটী হোমিওপ্যাথি। যে সময়ের কথা হইতেছে, সে সময়ে এই নূতন চিকিৎসা-প্রণালীর সংবাদ সবে এ দেশে পৌঁছিয়াছে; কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্তপরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় সবে এই শিক্ষা করিয়া বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র এক বৎসর হইতে এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, এবং এবার আসিবার সময় রাজেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে একটী ঔষধের বাক্স লইয়া আসিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে পল্লীস্থ দরিদ্রদের পীড়াদি হইলে ঔষধ দিয়া থাকেন। তাঁহার সে বিদ্যাটা কাজে লাগিবার সময় উপস্থিত! তিনি মনোযোগ সহকারে নূতন চিকিৎসা-প্রণালী অনুসারে রোগীদের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। স্ত্রী পুরুষে এক একদিন সমস্ত রাত্রি ঐ গরিবদের চালাতে বসিয়া রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। সে সময়ে কৃষ্ণকামিনীর ব্যস্ততা যিনি দেখিতেন, তাঁহারই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইত; তিনি রোগীদিগকে ঔষধ খাওয়াইতেছেন, স্বহস্তে তাহাদিগকে পরিষ্কার করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে পথ্যাদির জন্য বাড়ীতে ছুটিয়া আসিতেছেন।

সদাশয় পরোপকারী বৃদ্ধ বাগচী মহাশয়ও তাঁহার ছাত্রীর কার্যে উৎসাহদাতা হইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাতে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এই নবদম্পতীর ব্যস্ততা ও পরিশ্রম দেখিয়া সহরের লোক স্তব্ধ হইয়া গেল। এদিকে দরিদ্রদিগের মধ্যে ওলা-উঠার প্রকোপ একটু নিরস্ত হইতে না হইতে সহরের ভদ্রলোকদিগের মধ্যে উহা দেখা দিল। যাঁহারা নবীনচন্দ্রের নামে ডিরেক্‌টারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের একটী পুত্র ঐ ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইল। সংবাদ পাইবামাত্র নবীনচন্দ্র তাঁহার ধর্মালোচনা সভার দুই একজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া গিয়া সেখানে পড়িলেন; এবং রাত্রি দিন পড়িয়া থাকিয়া বালকটীকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। সে বাড়ীর কাজ শেষ হইতে না হইতে আর এক বাড়ী, তৎপরে আর এক বাড়ী, এইরূপে তাঁহার আর প্রাতে ও রাত্রে বিশ্রাম থাকিল না। কি গুরুতর শ্রম হইতে লাগিল!

এই সংগ্রাম হইতে উঠিতে না উঠিতে কাশী হইতে দারুণ সংবাদ আসিল, যে কার্তিকের প্রথমে তাঁহার রাঙ্গা মা ভবধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে সদাশয়া, স্নেহপ্রবণা নারী মাতৃস্থানীয়া হইয়া মাতৃহীন শিশুকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন, যিনি নিজ পক্ষপুটের মধ্যে মাতৃহীন সন্তানকে আবরণ করিয়া চিরদিন রক্ষা করিয়াছেন, সকলে প্রতিকূল হইলেও যিনি নবীনের প্রতি একটী দিনের জন্য প্রতিকূল হন নাই, যিনি মূর্তিমতী দয়া, অথচ নবীনকে রক্ষা করিবার সময় সিংহীর সমান ছিলেন, সেই দয়াবতী, সেই স্নেহময়ী রমণী, সেই রাঙ্গা মা আর নাই। নবীন এ সংবাদে গুরুতর আঘাত পাইলেন। তিনি শোকের বিকার কিছুমাত্র প্রকাশ করিলেন না বটে, কিন্তু কয়েক দিনে যেন তাঁহার চেহারা পরিবর্তিত হইয়া গেল। সর্বদা মৌনী রহিলেন। কৃষ্ণকামিনী ছায়ার ন্যায় সঙ্গিনী, অধিক কথা কহেন না,

বৃথা সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস পান না, কিন্তু সঙ্গ ছাড়েন না, মধ্যে মধ্যে কোনও কোনও পুস্তকের ভাল ভাল স্থান পাড়িয়া শুনান, এবং নবীনের প্রিয় সংগীত দুই একটী গাইয়া থাকেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই নবীন তাঁহার স্বাভাবিক প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইলেন এবং সমুদায় কার্যের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কলিকাতাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে রাঙ্গা মার শ্রাদ্ধের সময় পাঁচ হাজার টাকা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দীন দরিদ্র-দিগকে দান করিবার জন্য লিখিলেন। শ্রাদ্ধদিনে নিজে ফরিদপুরে অনেক দান ধ্যান করিলেন এবং সমস্ত দিন ঈশ্বরারাধনাতে যাপন করিলেন। ইহার দুই এক দিন পরেই বারাণসী হইতে সংবাদ আসিল যে তাঁহার রাঙ্গা মা দানপত্র লিখিয়া, বাড়ীখানি ও তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি নবীনকেই দিয়া গিয়াছেন।

এদিকে ম্যাজিস্ট্রেট গ্রীভ সাহেবের নিকট সংবাদ পাইলেন যে, তিনি নবীনের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটি কর্ম দিবার জন্য কমিশনরকে লিখিয়াছিলেন, এবং তদনুসারে নবীন তিন শত টাকা বেতনে ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু রাঙ্গা মার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির দিন হইতে নবীন ও কৃষ্ণ-কামিনীর অন্তরে আর এক সংকল্প উদিত হইয়াছে। তাঁহার আর চাকুরী করিবার ইচ্ছা নাই। প্রিয় নবরত্ন সভার দিকে হৃদয় সর্বদা টানিতেছে। এতদিন কলিকাতাতে কর্ম জুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, জুটে নাই। এক্ষণে আর সে চেষ্টার প্রয়োজন নাই। তাঁহার নিজের চল্লিশ হাজার টাকা এত দিনের পর তাঁহার হাতে আসিল। আর কেন, ইহার আয় হইতে তাঁহাদের বেশ সুখেই চলিয়া যাইবে; এখন কর্ম ছাড়িয়া কলিকাতায় যাওয়াই ভাল। কৃষ্ণকামিনী এই প্রস্তাবে অন্তরের সহিত আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

পরামর্শ স্থির হইবামাত্র কার্যারম্ভ। নবীন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ পূর্বক নিজ অভিপ্রায় তাঁহার গোচর করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁহার মেম অনেক নিষেধ করিলেন; বলিলেন, "তুমি এখন বিবাহ করিয়াছ. তোমাকে এখন গৃহধর্ম করিতে হবে, পুত্রকন্যার শিক্ষাদির উপায় বিধান করিতে হবে, তোমার চাকুরী ছাড়িলে চলিবে কেন?" কিন্তু কালিদাস বলিয়াছেন—"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ," --"স্থির-প্রতিজ্ঞ চিত্তকে ও নিম্নগামী জলকে কে ফিরাইতে পারে?" নবীনচন্দ্র কাহারও বাধা শুনিলেন না।

কলিকাতায় আসিবার সময় ফরিদপুরের সকল লোকে, এমন কি তাঁহার ঘোর বিরোধী যাহারা ছিল, তাহারাও হায় হায় করিতে লাগিল। যাত্রার দিন কৃষ্ণকামিনী যখন গলবস্ত্রে বৃদ্ধ বাগ্‌চী মহাশয়ের চরণে প্রণাম করিলেন, তখন সেই বৃদ্ধের গণ্ডস্থল দিয়া শোকাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণকামিনীর সেই ভক্তি, বিনয় ও সাধুতাপূর্ণ মুখে ভক্তিঅশ্রু আর তিনি দেখিতে পাইবেন না এবং সেই অপূর্ব ভক্তিরসপূর্ণ সংগীত আর শুনিতে পাইবেন না। নবীনচন্দ্র কলিকাতা আসিলেন, ফরিদপুর যেন নিবিয়া রহিল।

এদিকে কলিকাতাতে নবরত্ন সভার সভ্যগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। নবীন যে যাইবার সময় বলিয়াছিলেন—"ঈশ্বর যদি দিন দেন আমাকে আবার কার্য-ক্ষেত্রে দেখিতে পাইবে."—ঈশ্বর সেই দিন দিয়াছেন। নবীনচন্দ্র আসিয়াই বিজয়ার পরামর্শে আর এক মহৎ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিলেন। তাঁহার রাঙ্গা মার পরিত্যক্ত

বাড়ীটীর অন্দর মহলটীতে একটী দ্বার খুলিয়া ও কিছু বদলাইয়া সে মহলটী নিজের বাসের জন্য রাখিলেন, এবং বাহির বাড়ীটী উত্তমরূপে মেরামত করিয়া ও ঘরগুলি বদলাইয়া 'কৃপাময়ী বিধবাশ্রম' নাম দিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের ট্রষ্টীদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই আশ্রমের ভার বিজয়ার হস্তে অর্পিত হইল। বিজয়া সেখানে হিন্দু বিধবাদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার ও নানা প্রকার শিল্পকার্য শিখাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। প্রথমে অধিক বিধবা পাওয়া গেল না; নবরত্ন সভার সভ্যদিগের চেষ্টাতে ৫।৭ জন নিরাশ্রয় বিধবা পাওয়া গেল, তাহাদের প্রত্যেককে 'হলধর বৃত্তি' নামে মাসে ৮৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইতে লাগিল; এবং তাহাদিগকে স্কুলে আনিবার ও স্কুল হইতে দিয়া আসিবার জন্য একখানি গাড়ি নিযুক্ত হইল। এতৎসঙ্গে নবীনচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের পরিত্যক্ত টাকার সঞ্চিত সুদ হইতে ৮ হাজার টাকা দিয়া বিধবাশ্রমের অব্যবহিত পার্শ্বস্থ একটী বাড়ী ক্রয় করিলেন; এবং আরও দুই হাজার টাকা দিয়া সেটী সংস্কার করিয়া ও দুই বাড়ীর মধ্যে গতায়াতের জন্য দরজা খুলিয়া তাহা বিজয়ার থাকিবার জন্য ট্রষ্টীদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। বিজয়ার পরামর্শে এই সঙ্গে একটী বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইল। তাহাতে বিধবাদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কার্য শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। বিজয়া, কৃষ্ণকামিনী ও বিন্ধ্যবাসিনী তিন জনে এই বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াইতে লাগিলেন। মহোৎসাহে কার্য আরম্ভ হইল।

হরচন্দ্র বিজয়ার পবিত্র সহবাসে থাকিবার জন্য বিধবাশ্রমের পার্শ্বস্থ বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। সেখানে নবরত্ন সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। পণ্ডু ও গোবিন্দ সেই বাড়ীতে রহিলেন। এদিকে নবীনচন্দ্রের নিজ বাড়ীতে তাঁহার বিধবা ভগিনী নন্দরাণী আসিয়া যুটিলেন। ইহাতে কৃষ্ণকামিনীর মহা আনন্দ। অল্পদিনের মধ্যে উভয়ের মধ্যে এমন প্রীতি জন্মিয়া গেল, যে ননদ ও ভাজে এমন প্রেম কেহ কখনও দেখে নাই। দুই জনে হৃষ্টচিত্তে সংসারের সকল কাজ করিতে লাগিলেন ও বালিকা স্কুলে পড়াইতে লাগিলেন।

নবরত্ন সভাতে যে নবজীবনের সঞ্চার হইল, তাহা বলা অত্যুক্তিমাত্র। পণ্ডু পঞ্চাশ টাকার কর্ম ছাড়িয়া সামান্য বিশ টাকা অবলম্বনে নবরত্ন সভার সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি অবিবাহিত পুরুষ, তাঁহার অধিক অর্থের প্রয়োজন কি? গোবিন্দ কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুন্সেফ হইয়া গেল। বিবাহাদি করিল না; মনে প্রতিজ্ঞা, বিন্ধ্যবাসিনীকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না; কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর সে ভাব নাই, সে মাতার অগ্নিতে অগ্নিময়ী, সে বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্যের ব্রত লইয়াছে। হরচন্দ্রের বেতন আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি একটু স্থির হইয়া বসিলেই তাঁহার পুরাতন সঙ্গীতবিদ্যার চর্চা আবার আরম্ভ করিলেন। তিনি ও কৃষ্ণকামিনী একজন পাকা সেতারীর নিকট সেতার শিক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং তিনি নিজে বিন্ধ্যবাসিনী, ইন্দুভূষণ ও ভবেশকে হারমোনিয়ম ও বেহালা বাজাইতে শিখাইতে লাগিলেন। হরচন্দ্রের পুস্তকালয়টী দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এবং তিনি উৎসাহের সহিত নবীনচন্দ্রের সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন। এইরূপে এই বিধবাশ্রমের সন্নিকটস্থ পরিবারদ্বয় এক পরিবার হইয়া পরম সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

ওদিকে বঙ্গদেশে মহা পরিবর্তনের দিন আসিতেছে। বঙ্গের সাহিত্যাকাশে

মধুপের ন্যায় মধুসূদন উঠিয়াছেন। পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পাইকপাড়ার প্রতাপনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি সমবেত হইয়া রঙ্গকাব্যের এক অদ্ভুত অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার বিখ্যাত নাটকাবলী প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ত্বরায় তিলোত্তমা ও মেঘনাদবধ দেখা দিল।

বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তে এই ১৮৫৯ সাল চিরস্মরণীয় বৎসর। ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দুই বৎসর কাল পর্বতশৃঙ্গে তপস্যায় যাপন করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়া এই বৎসরে বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই সকল অগ্নিময় উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন যাহা তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রতিভার চিরস্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন দিন আসিবে, যখন সেগুলি বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার বলিয়া সর্বত্র আদৃত হইবে। এই বৎসরেই খ্যাতনামা কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রাচীন দেবেন্দ্রনাথের সহিত তরুণ কেশবের সম্মিলনে নূতন বল আনিয়া দিল। উভয়ে একত্র হইয়া কলিকাতার যুবকগণকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। যুবকদলে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল; অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান উপবীত ত্যাগ করিলেন, এবং নানা স্থানে যুবকগণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য নিগ্রহ সহ্য করিতে লাগিল। এই সকল বিবরণ শুনিয়া এক দিন নবীনচন্দ্র পণ্ডুকে বলিলেন—"পণ্ডু, এইবার বুঝি সত্য সত্যই যুগান্তর ঘটিল। তোমার ব্রাহ্মসমাজে ও বঙ্গদেশে বুঝি এইবার নবযুগ আসিল।"

পরিশিষ্ট

যুগান্তর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—

শিবনাথ বাবুর যুগান্তর উপন্যাসখানি পাঠ করিতে করিতে কর্তব্যক্লান্ত সমালোচকের চিত্ত বহুকাল পরে আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। এমন পর্যবেক্ষণ, এমন চরিত্র সৃজন, এমন সুরস হাস্য, এমন সরলসহৃদয়তা বঙ্গ-সাহিত্যে দুর্লভ। লেখক বিশ্বনাথ তর্কভূষণকে আমাদের নিকট পরমাত্মীয়ের ন্যায় পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। এমন সত্য চরিত্র বাংলা উপন্যাসে ইতিপূর্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। লেখক তাঁহাকে সমস্ত তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষবৎ জাজ্বল্যমান দেখিয়াছেন—তাঁহার চরিত্রটিকে প্রতিদিনের হাস্যে এবং অশ্রুজলে, দোষে এবং গুণে অতি সহজেই সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। বিরল-বসতি বঙ্গসাহিত্যরাজ্যে তর্কভূষণ মহাশয় যে একটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন এবং আমরা যে, একটি স্থায়ী বন্ধু লাভ করিলাম সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ মাত্র নাই।

কেবল তর্কভূষণকে কেন, লেখক বঙ্গসাহিত্যে নশিপুর-নামক আস্ত একটি গ্রাম বসাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রামের ক্রিয়াকর্ম, আমোদ-প্রমোদ, কৌতুক-উপদ্রব, সুজন-দুর্জন সমস্তই পাঠকদের চিরসম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। তর্কভূষণের টোল, 'হাঁসের দল', চিমু ঘোষ, জহরলালের ইতিহাস, নূতন-গঠিত সদাঃ-পঠিত হইলেও তাহা আমাদের নিকট যেন অনেক কালের পুরাতন পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে উলোর রামরতন মুখুয্যের ঘরে তর্কভূষণের কনিষ্ঠা কন্যা ভুবনেশ্বরীর ঘরকন্নাও আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সত্য এবং অত্যন্ত বেদনাজনক হইয়াছে। সংক্ষেপে, তর্কভূষণ, তাঁহার গ্রাম, তাঁহার পরিবার, তাঁহার ছাত্রবর্গ, তাঁহার শত্রু-মিত্র সকলকে লইয়া একটি গ্রাম্যগ্রহমণ্ডলীর কেন্দ্রবর্তী সূর্যের ন্যায় আমাদের নিকট প্রবল উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। এমন সময়ে আমাদের পরম দুর্ভাগ্য-বশত উপন্যাসটি অকস্মাৎ যুগান্তরে লোকান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথায় গেল তর্কভূষণ, নশিপুর. হাঁসের দল—কোথা হইতে উপস্থিত নবীনচন্দ্র, হাতি-বাগান, নবরত্ন সভা। গ্রন্থকারও নূতন বেশ ধারণ করিলেন। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, হইলেন ঐতিহাসিক, ছিলেন ভাবুক, হইলেন নীতিপ্রচারক। আমরা রসসম্ভোগের সত্যযুগ হইতে তর্ক-বিতর্কের যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম। গ্রন্থকার পূর্বে যেখানে মানুষ গড়িতেছিলেন এখন সেখানে মত গড়িতে লাগিলেন,—পূর্বে যেখানে আনন্দনিকেতন ছিল এখন সেখানে পাঠশালা বসিয়া গেল। এরূপ অঘটন সংঘটন হইল কেন তাহা বলিতে পারি না। তর্কভূষণের বিধবা ভগিনী বিজয়া এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্রের কলিকাতায় আগমন-কালটি তাঁহাদের নিজের পক্ষে সুক্ষণ, কিন্তু উপন্যাসের পক্ষে কুক্ষণ; কারণ সেই উপলক্ষ্যটুকু অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের শেষার্ধটি প্রথমার্ধের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে কোনো অবশ্য যোগ নাই।

দুইটা মানুষকে এক দড়ি দিয়া বাঁধিলে ঐক্য হিসাবেও তাহাদের বলবৃদ্ধি

হয় না এবং দ্বৈত হিসাবেও তাহাদের সুবিধা হয় না। তেমনি দুই স্বতন্ত্র গল্পকে জবর্দস্তি করিয়া একত্র বাঁধিয়া দিলে একটা গল্পের হিসাবে তাহাদের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন পরিণতিতে বাধা দেওয়া হয়, দুইটা গল্পের হিসাবেও তাহাদিগকে আড়ষ্ট করিয়া বধ করা হয়। বর্তমান গ্রন্থেও তাহাই হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি দুটি গল্পকে বিচ্ছিন্ন আকারে রচনা করিতেন তাহা হইলে সম্ভবত দুটিকেই উৎকৃষ্ট গল্পে পরিণত করিতে পারিতেন।

দ্বিতীয় গল্পটির কথা বলিতে পারি না। কিন্তু প্রথম গল্পটি যে সাহিত্যের অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিত সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই।

আসল কথা, লেখক নিজেই নূতন যুগের মধ্যে বাস করিতেছেন। এমন-কি, নবযুগরথের চালকবর্গ-মধ্যে তিনিও একজন গণ্য ব্যক্তি। তিনি ইহার ঘর্ঘর শব্দ এবং জনতাকোলাহল হইতে কল্পনাযোগে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এত দূরে লইয়া যাইতে পারেন নাই যেখানে শান্তিতে বসিয়া নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় ইহাকে চিত্রিত করিতে পারেন। বিচিত্র মতামত এবং তর্কবিতর্কগুলা একেবারে গোটা আসিয়া পড়ে, তাহা রক্তমাংসের মানবাকারে পরিণত হইয়া উঠে না। তাঁহার পণ্ডু ব্রজরাজ সুরেন্দ্রগুপ্ত মথুরেশ এমন-কি নবীনও খুব ভালো ছেলে বটে, কিন্তু সজীব নহে। তাহারা বীজগণিতের ক খ গ অক্ষরের ন্যায় কেবল কতকগুলি চিহ্নমাত্র।

সাহিত্যের চিত্রপটে স্থিতি অপেক্ষা গতি আঁকা শক্ত। যাহা পুরাতন, যাহা স্থির, যাহা নানা দিকে নানা ভাবে সমাজের হৃদয় হইতে রসাকর্ষণ করিয়া শ্যামল সতেজ এবং পরিপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে সত্য এবং সরলভাবে পাঠকের মনে জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যাহা নূতন উঠিতেছে, যাহা চেষ্টা করিতেছে, যুদ্ধ করিতেছে, পরিবর্তনের মুখে আবর্তিত হইতেছে, যাহা এখনও সর্বাঙ্গীণ পরিণতি লাভ করে নাই, তাহাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করিতে হইলে বিস্তর সূক্ষ্মবিশ্লেষণ অথবা ঘাতপ্রতিঘাত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া বিচিত্র নাট্যকলা প্রয়োগ আবশ্যক হয়। কিন্তু সেরূপ করিতে হইলে রচনার বিষয় হইতে রচয়িতার নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে হয়। অত্যন্ত কাছে থাকিলে, মণ্ডলীর কেন্দ্রের মধ্যে বাস করিলে, সমগ্রের তুলনায় তাহার অংশগুলি ব্যক্তির তুলনায় তাহার মতগুলি, কার্যপ্রবাহের তুলনায় তাহার উদ্দেশ্যগুলি যেরূপ বেশি করিয়া চোখে পড়ে—তাহাতে রচনা সত্যবৎ হয় না, তাহার পরিণাম-সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায় এবং বাহিরে নির্লিপ্ত পাঠকদের নিকটে কিরূপে বিষয়টিকে সমগ্র এবং সপ্রমাণ করিতে হইবে তাহার ঠাহর থাকে না।

কিন্তু এই দ্বিতীয় নম্বর গল্পটিতেও লেখক যেখানেই নবযুগের আবর্ত ছাড়িয়া খাঁটি মানুষগুলির কথা বলিয়াছেন সেইখানেই দুই-চারিটি সবল বর্ণনায় স্বল্প রেখাপাতে অতি সহজেই চিত্র আঁকিয়াছেন এবং পাঠকের হৃদয়কে রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন। একস্থলে গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে শ্রীধর ঘোষের সহিত কেবল চকিতের মত আমাদের পরিচয় করাইয়া তাহাকে অপসৃত করিয়া দিয়াছেন—কিন্তু সেই স্বল্প কালের পরিচয়েই আমাদের মনে একটা আক্ষেপ রাখিয়া দিয়াছেন; আমাদের বিশ্বাস, লেখক মনোযোগ করিলে এই শ্রীধর ঘোষটিকে একটি গ্রন্থের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া আর-একটি উপন্যাসকে প্রাণদান করিতে পারিতেন। আমরা শ্রীধরের সংক্ষেপ পরিচয়টি এস্থলে উদ্ধৃত করি।—

"এই ঘোষ পরিবার বৈষ্ণব পরিবার, গোঁসায়ের শিষ্য। শ্রীধর ঘোষ মহাশয় অতি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। উদরান্নের জন্য ম্লেচ্ছের অধীনে কাজ করিতেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। আপিসে যখন কর্ম করিতেন, তখন তাঁহার নাসাতে তিলক ও সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দৃষ্ট হইত। * * * মানুষটি শ্যামবর্ণ সুস্থ ও সবলদেহ ছিলেন, মুখটি সদ্ভাবে ও ভক্তিতে যেন গদগদ, সে মুখ দেখিলেই কেমন হৃদয় স্বভাবত তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত। ঘোষজা মহাশয় আপিসের প্রবেশের দ্বারের পার্শ্বের ঘরেই বসিতেন; এবং যত গাড়ি মাল আমদানী ও রপ্তানি হইত তাহার হিসাব রাখিতেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আপিসে প্রবেশের সময়ে অনেকবার এই প্রশ্ন শুনিতে হইত—'কি ঘোষজা, খবর কী? সব কুশল ত?' অমনি ঘোষজার উত্তর,—'আজ্ঞে, গোবিন্দের প্রসাদে সবই কুশল।' ঘোষজা দোলের সময় কিছু ব্যয় করিতেন; লোকজনকে শ্রদ্ধাসহকারে আহ্বান করিয়া উত্তমরূপে খাওয়াইতেন। এই জন্য আপিসের লোকে মাঘ মাস পড়িলেই জিজ্ঞাসা করিত—'কি ঘোষজা মশাই, এবার দোল কর্‌বেন ত?' অমনি উত্তর—'আজ্ঞে কি জানি, যা গোবিন্দের ইচ্ছা।' গোবিন্দের প্রতি নির্ভরের ভাব তাঁহার এমন স্বাভাবিক ছিল, যে আট বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রটির কাল হইলে, তাহারই তিন-চারি দিন পরে আপিসের একজন লোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি ঘোষজা মশাই, ছেলে দুটো মানুষ হচ্ছে ত?' ঘোষজা উত্তর করিলেন,—'আজ্ঞে দুটো আর কৈ?—এখন ত একটি, কেবল বড়টিই আছে।' প্রশ্নকর্তা বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—'সে ছেলেটির কি হইল?' ঘোষজা উত্তর করিলেন,—'আজ্ঞে গোবিন্দ সেটিকে নিয়েছেন।' * * * তিনি সাধ করিয়া নাতি নাতিনীদের নাম রাখিয়াছিলেন। পুত্রের সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা হইলে তাহার নাম রাধারাণী রাখিলেন। * * * সর্বজ্যেষ্ঠা রাধারাণী তাঁহার প্রথম আদরের ধন ছিল। রাধে! রাজনন্দিনি! গরবিনি! শ্যাম-সোহাগিনি! বলিয়া যখন ডাকিতেন, তখন এক বৎসরের বালিকা রাধারাণী অচিরোদ্গত-দন্তাবলী-শোভিত মুখচন্দ্রে একটু হাসিয়া, ঝাঁপাইয়া, তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া পড়িত। তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন,—'রাখালের সনে প্রেম করিস্‌নে রাই!' অমনি চক্ষে জলধারা-বহিত।"

এদিকে শিশু কন্যা টিমির্মাণি, নবীনের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃবধূর সম্বন্ধ, নবীনের রাঙা মা—এগুলিও লেখক বড় সরল এবং সরস সুমিষ্ট ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

লেখক ধারাবাহিক গল্পের প্রতি বড়-একটা দৃষ্টিপাত করেন নাই—আমরাও গল্পের জন্য বিশেষ লালায়িত নহি। আমরা একজন রীতিমত মনুষ্যের আনন্দজনক বিশ্বাসজনক জীবনবৃত্তান্ত চাহি—নশিপুর গ্রামে তর্কভূষণ-পরিবারের আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিয়া যাইতে আমাদের কিছু মাত্র শ্রান্তি বোধ হইত না, কারণ, তর্কভূষণ আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন এবং লেখকও তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিনী হাস্যবর্ষিণী কল্পনাশক্তি দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু লেখক দুই খানি বহির পাতা পরস্পর উল্টা-পাল্টা করিয়া দিয়া এক সঙ্গে বাঁধাইয়া দপ্তরীর অন্ন মারিয়াছেন এবং পাঠকদিগের রসভঙ্গ করিয়াছেন। এ আক্ষেপ আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না।

সাধনা—১৩০১ চৈত্র